REGISTERED NO. C. 262.

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

(১৭ বর্ষ)

১৩২৫ ভাদ্র হইতে ১৩২৬ শ্রাবণ পর্য্যন্ত।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিনী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

সম্পাদক

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ আঃ—আন্দুল-মৌড়ী, জেলা—হাওড়া।

(55)

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র সডাক ১॥• দেড় টাকা।

ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন" হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
হাওড়া, সালিখা, বৃটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীসুবোধ চন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

ভক্তির সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

—:০:—

১। "ভক্তি" ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা, প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশ হয়।

২। বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র সডাক ১৸০ দেড় টাকা ভিঃ পিতে ১৸৶০ এক টাকা নয় আনা, নমুনা এক খণ্ড ৶০ তিন আনা মাত্র।

৩। ভক্তিতে রাজনৈতিক কোনও প্রবন্ধ প্রকাশ হয় না। ধর্ম্মভাবোদ্দীপক প্রবন্ধই সম্পাদক মহাশয়ের আদেশ মত (প্রয়োজন হইলে পরিবর্ত্তন করিয়া) প্রকাশ হয়। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৪। ভক্তিতে বিজ্ঞাপন দিবার সুবিধা অন্যান্য সকল পত্রিকা অপেক্ষাই সুলভ। পত্র লিখিয়া নিয়ম অবগত হউন।

৫। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, প্রবন্ধ ও বিনিময় এবং সমালোচনার্থ পুস্তক পত্রিকাদি সমস্তই নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

ঠিকানা—

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন,

ঝোড়হাট "ভক্তিনিকেতন।"

পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তি" মাসিক পত্রিকা।

১৭শ বর্ষের সূচীপত্র।

—:•:—

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই সম্পূর্ণ দায়ী।)

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
প্রার্থনা গীতি (পদ্য)	শ্রী—	১
পথের কাঙ্গাল	শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২, ৩৩, ৭৮, ৮৭, ১০৪, ২১৩
ভাগবত-তত্ত্ব-সুধা	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১২, ৭৫
কাঙ্গালের মনের কথা	শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য	১৭, ২৯, ১৫৩, ১৭৭
শ্রীশ্রীচরণ	শ্রীযুক্ত কেশব লাল সেন	২০
আনন্দ নগর	,, কেদার নাথ দত্ত উকীল	২৩, ৩৮
অকুল-কাণ্ডারী হরি (পদ্য)	,, চণ্ডী চরণ মুখোপাধ্যায়	২৫
সত্য-লাভ	,, বিজয় কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	২৬
বিরহে (পদ্য)	শ্রী—	৩৬
ক্ষমা কর, ক্ষমা পাবে (পদ্য)	শ্রীমতী কৃষ্ণদাসী	৪৩
শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র (পদ্য)	শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য	৪৫
সাধুসঙ্গে একদিন	শ্রী—	৪৬, ৮২
গুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	শ্রী—	৫৩, ৭২
তব প্রীতি লাগি মোর জীবন ধারণ (পদ্য)	শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র উকীল	৫৭
কাতর প্রার্থনা	শ্রী—	৬৬
গোস্বামী শ্রীরাম চন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর	শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র উকীল	৬৭
পূর্ব্ব-স্মৃতি (পদ্য)	শ্রী—	৮১
সুদামা রাখিল নাম দারিদ্র-ভঞ্জন	শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র উকীল	৯২
আমার স্বপ্ন	,, বামাচরণ বসু ভাবসাগর	৯৮, ১০২
পাব কি না চরণ তোমার (পদ্য)	শ্রী—	১০১
পুরীধামে পাণ্ডা ও মহাপ্রসাদের সঙ্কট অবস্থা (উদ্ধৃত)		১১৮
ন'দের চাঁদ গোরারায় (পদ্য)	শ্রী—	১২১

বিষয়।	লেখক।	পত্রাঙ্ক।
হরিদাসের নির্য্যাণ	শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর	১২২, ১৪৩
মূর্ত্তি উপাসনা	শ্রীযুক্ত জহর লাল সিংহ	১২৮
ভক্ত কবির ভাবোচ্ছ্বাস	" উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩২
শ্রীধাম মাহাত্ম্য (পদ্য)	" সত্যচরণ চন্দ্র উকীল	১৩৭, ১৪৫
শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট মনের কথা (পদ্য)	শ্রী—	১৪২
বৈরাগ্য	শ্রী—	১৪৭
প্রেমের ফাঁসি (পদ্য)	শ্রী—	১৫১
মায়ের কোলে চাঁদ (পদ্য)	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ	১৫৫
কামিনী সাধনার প্রতিপক্ষ কি না?	শ্রী—	১৫৬, ১৬৬
বৈষ্ণব ব্রত-তালিকা	(ভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডল)	১৬২
রাধিকারঞ্জন স্তুতি (পদ্য)	শ্রী—	১৬৫
গৌর-গোবিন্দ	শ্রী—	১৬৮
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম (পদ্য)	শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য	১৭৬
জীবের পরিণাম	শ্রী—	১৮১
প্রেরিত পত্র	শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র উকীল	১৮৫
তুমি হরি কর পার	শ্রী—	১৮৮
কলিযুগে প্রভুর কৃপা	শ্রী—	১৯১
ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবন দাস	শ্রী—	১৯৭, ২১৯
কলিযুগের প্রাধান্য	শ্রী—	২০৫
করুণাময় (পদ্য)	শ্রী—	২১৪
মন্ত্র-শক্তি	শ্রী—	২১৫
ভুলাতে নারিবে কভু (পদ্য)	শ্রী—	২১৮
ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর	শ্রী—	২১৯
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ	শ্রী—	২২৮
আমার সাধু দর্শন	শ্রী—	২৩১
নিবেদন	শ্রী—	২৩৮
সন্ধ্যা-প্রসূত শ্রীগৌরাঙ্গ	শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য	২৩৯

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তি।"

(১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র মাস, ১৩২৫ সাল।)

প্রার্থনা-গীতি।

(সুরট—একতালা)

কতদিনে আমি যাব ব্রজধাম।
(কবে) শ্রীরাধারমণে, হেরব রাধা-সনে,
প্রাণ ভ'রে গাব রাধাকৃষ্ণ নাম॥

কতদিনে আমি বংশীবটেতে যাব,
কতদিনে ব্রজের গুল্মলতা হব,
ব্রজের ধূলি কবে সর্ব্বাঙ্গে মাখিব,
(কবে) শ্রবণ জুড়াব (শুনি) বাঁশরীর গান॥

কতদিনে যমুনার কূলে কূলে,
বেড়াব কাঁদিয়া (কৃষ্ণ) দেখা দাও ব'লে,
(কবে) কিশোর কিশোরী হেরব কদমতলে,
কতদিনে পূর্ণ হ'বে মনস্কাম॥

ঐহিকের সুখ সকল ভুলিয়ে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বেড়াব কাঁদিয়ে,
নয়নেরনীরে শুদ্ধ-স্নাত হ'য়ে,
(কবে) যুগল চরণে সঁপিব এ প্রাণ॥

দীন শ্রী—

পথের কাঙ্গাল।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।)

—:০:—

১—আনন্দময়ীর আবাহন।

সারাটি বৎসর, নানাবিধ অবস্থান্তরের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শরতের শান্ত-প্রভাতে, ভক্ত আনন্দোৎফুল্ল-বদনে, প্রেমধারাভিষিক্ত-নয়নে, ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে, মধুর-স্বরে বলিতেছেন :—

আয় মা আনন্দময়ি! নিরানন্দ ভবনে।
আয় মা জননি, জগন্মোহিনি, আলো করি ত্রিভুবনে॥
অশেষ দুঃখ অশেষ দৈন্য, যাদের নিত্য করিছে ক্ষিন্ন,
তাঁদের তিনটি দিনের জন্য ধন্য করিতে জীবনে॥
আয় মা তারিণী, ত্রিতাপ বারিণী, মঙ্গলময়ি! চির শান্তিদায়িনী,
প্রাণ ভ'রে বলি "জয় মা জননি!" পূজি দুটি রাঙ্গা চরণে॥

এই আবাহন, ভক্তের এই ভক্তি-বিমিশ্রিত প্রাণের আহ্বান, জগতে না জানি কি শুভ-সংবাদ আনিয়া দেয়, শান্তোজ্জ্বল মধুর-চিত্র নয়ন পথে অঙ্কিত করে, কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দের স্মৃতি প্রাণে জাগাইয়া দেয়।

যাঁহারা যে কোন ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করুন না কেন, সকল সম্প্রদায়েই অবশ্য এটুকু বিশ্বাস করেন যে, শ্রীভগবান আছেন, তিনি মঙ্গলময়, প্রার্থনায় তাঁহার করুণা লাভ হয়, ভক্তের আহ্বানে তাঁহার আসন টলে। সুতরাং এই শারদীয় আবাহনে, কত না স্মৃতি, কত না আনন্দ, কত না আশার কথা মনে হয়। মনে হয়, যখন এই পুণ্যভূমি ভারতভূমে, প্রথম প্রণবধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, যখন সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নির্ম্মল পবিত্রচেতা মননশীল আর্য্য ঋষিগণ আনন্দের আস্বাদ পাইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। ওঁ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীর্মধু নক্ত-মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। ওঁ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতি-র্মধুমাং অস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ

বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে অণুতে পরমাণুতে তখন তাঁহারা আনন্দ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে এই মধুবাতাচ্ছন্দ আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহার ঝঙ্কার যেন শারদীয় আবাহনের কালে কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়। আর সেই পুণ্য তপোবনে, জগতের হিতৈষী, জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ব্রহ্মবিদ্ ঊর্দ্ধরেতা আনন্দ-মীমাংসা-তৎপর ঋষিবৃন্দ যখন এই ভাবে ভাবিত হইয়া "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" বলিয়া, আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—তখন জগতে কি সুসংবাদ প্রচার হইয়াছিল—সে দিন পৃথিবীর কি সুপ্রভাত!

জগতে আনন্দের স্রোত বহিতেছে,—যে আনন্দময়ী সর্ব্বভূতে সেই হ্লাদিনী-শক্তির লীলা প্রকাশ করিতেছেন, আজ তাঁহার আবাহন। ঋষি মার্কণ্ডেয় সেই আনন্দময়ীর মূর্ত্তি জনসমাজে, লোকচক্ষে কি মধুর ভাবে আঁকিয়া দিয়াছেন:—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চিৎরূপেণ সংস্থিতা॥
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা॥
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা॥
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা॥
"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে অহরহ এই আনন্দময়ীর আনন্দ-লীলা-প্রবাহ চলিতেছে। সেই তরঙ্গে, তোমার চিত্ত ছুটাইয়া দাও, ভাবে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বের প্রতি চাহিয়া দেখ। দেখিবে জগৎ মধুময়, বাস্তবিক সেই বৈদিক মধুবাতাচ্ছন্দ তখন তোমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইবে—আর তুমি ভক্তের ন্যায় মাতোয়ারা হইয়া বলিতে থাকিবে—

"দীন-তারিণী ত্রিনয়নি দীনের প্রতি ফিরে চাও
(আমায়) তোমার ভাবে বিভোর ক'রে
আপনি নাচো (আর) আমায় নাচাও।

কিন্তু আসে না, সকল সময় এ ভাব সকলের প্রাণে আসে না। মায়া বল, অবিদ্যা বল, ভ্রম বল, ভ্রান্তি বল, পশুভাব বল, আসুরিকভাব বল,—এ সকলের প্রভাব সময়ে সময়ে মানব হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—তাহাকে অধোগতির পথে চালিত করে। অসদ্ভাবের আধিক্য হেতু, তন্মাত্রার বিপর্য্যয়ে—এ ভাবের পরিবর্ত্তন জগতে বহুবার হইয়াছে। শুধু এ যুগে নয়, শুধু মানুষের মধ্যে নয়,

দেবতাদিগকেও এ অবস্থার মধ্যে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু যখনই সদ্ভাবের অভাব, অসদ্ভাবের বৃদ্ধি, দেবভাবের লঘুত্ব ও আসুরিক ভাবের গুরুত্ব বোধ হইয়াছে, তখনই আনন্দের ভিখারীরা, আনন্দময়ীর আবাহন গাহিয়াছেন, যুক্ত করে, মুক্ত প্রাণে, বিশ্বজগতের মঙ্গল কামনায়, সর্ব্বজগৎ প্রতিধ্বনিত করিয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে গাহিয়াছেন :—

দেবি ! প্রপন্নার্ত্তিহরে। প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য,
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি। পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি। চরাচরস্য ॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি,
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্য বীর্য্যে ॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া
সম্মোহিতং দেবি। সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি। ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥

সকল জগতের মঙ্গল কামনায় এই যে আবাহন, জগতের পশুভাব, আসুরিক ভাব বিতাড়িত করিয়া, আনন্দ-প্রবাহে জগৎ উদ্ভাসিত করিবার জন্য, এই যে আন্তরিক প্রার্থনা, এই যে হৃদয়ের সাধনা—ইহার তুলনা আছে কি ?

মনে পড়ে, শৈশবের কথা মনে পড়ে। এই শরৎকালে শারদীয়া পূজাবকাশে যখন গ্রামে যাইতাম তখন কি অভিনব দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইত। মাঠের শ্যামল শস্য, নদীর কাণে কাণে জল, উপরে অনন্ত আকাশে শারদ শশী—সর্ব্বত্র যেন এক অভিনব আনন্দের সংবাদ আনিয়া দিত। অবকাশে সকলে বাড়ী আসিয়াছেন—ছেলে মেয়েরা কত নব নব পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বেড়াইতেছে—সকলেরই মুখে আনন্দের ভাব। চণ্ডীমণ্ডপে বোধন বসিয়াছে,—পাড়ায় পাড়ায় ধূপধুনার গন্ধ—সেটাও যেন আনন্দের অনুকূল। শিল্পীর আনন্দ, গাঁয়ে দশখানা পূজা—কিছু উপার্জ্জন হইবে। কৃষকের আনন্দ, তিনদিন পেট ভরিয়া প্রসাদ পাইবে। প্রবীনের আনন্দ, গ্রামে আনন্দময়ীর আরাধনা হইবে।

সে কি আনন্দ,—আর এখন কি ? এখন পূজাবকাশে, লোকে গ্রাম তো দূরের কথা, দেশ ছাড়িয়া চলিয়াছেন। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের প্রায় অনেক

শুনিয়াই মট্‌কা খসিয়া পড়িয়াছে—ঢাক, ঢোল কোন গ্রামে বাজে, কোন গ্রামে বাজে না। তাই আজ আনন্দময়ীর আনন্দ-চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া, বঙ্গের কবি-সম্রাটের সেই করুণ ছন্দ মনে পড়ে :—

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে,
হের, ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।"

আহা আনন্দময়ী মা যে সকলের। আনন্দময়ীর আগমনে, অন্ততঃ তিনটি দিনের জন্যও যেন নিরানন্দে না রই। এ ভাবটি জাগাইয়া তোল, আনন্দময়ীর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া, জনে জনে আনন্দ বিতরণের জন্য সরল ভাবে অনুরাগ প্রকাশ কর, আনন্দময়ীর আশীর্ব্বাদে, তোমাদের শুভ হইবে, দেশের শুভ হইবে, জগতে শুভ-ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইবে। তখন আনন্দের প্রকৃত সাধকের ন্যায় তোমরা কৃতার্থ হইয়া গাহিবে—

অয়ি পরমেশ্বরী সর্ব্ব-শুভঙ্করী সচ্চিদ-পরমানন্দময়ী
কত কোটি ভাস্কর-ভাতি-বিনিন্দিত জ্যোতি-বিমণ্ডিত তেজোময়ী।
কিবা জড়-চেতন-অন্তর বাসিনী সর্ব্ব বিকাশিনী শক্তিময়ী
জয় জয় হে! ভূ সুরাসুর-বন্দিনী আত্মা-নন্দিনী ব্রহ্মময়ী॥

১০—আমি কি দিয়া পূজিব?

—:•:—

প্রতি বৎসর যখন শারদীয় উৎসবের বোধন বসে, যখন জগজ্জননীর আরাধনায় ভক্ত সাধন-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, যখন চারিদিকে পূজার বাজার বসিয়া যায়, তখন এই অধম কাঙ্গাল ভাবে—মনের দুঃখে, প্রাণের বেদনায় ভাবে—আমি কি দিয়া পূজিব? আমার নিজস্ব কি আছে? আমার দেহ মন আত্মা—এ সব যে এই সংসারে—কর্ম্মে—নিযুক্ত রাখিয়াছি।

আচ্ছা, আমার নিজের তো কিছুই নাই—বাহিরে অপরের কাছে যদি কিছু ভিক্ষা মাগিয়া পাই—চাহিয়া দেখি না। বাহিরে কিন্তু কি দেখি?

পথে লোকের ভিড়, ট্রেণে স্থান মেলে না, সকলেরই মুখে পূজার কথা। চিনা মুচিদের দোকানে পূজার জুতো, কাপড় ওয়ালার দোকানে পূজার কাপড়,

জামার দোকানে পূজার পোষাক ! যাহা হউক, সহরে পূজা যে কোথায় তাহাতো দেখিলাম। ঢাক ঢোলের শব্দ শুনিতে পাই আর না পাই, ফেরিওয়ালার "পূজার কাপড়" এই হাঁক শুনিয়া পূজা আসিতেছে তাহাতো বুঝিলাম। কিন্তু যাঁহার পূজা তাঁহার জন্য কি আয়োজন হইল ? তাঁহাকে আবাহন করিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছি !

'পূজার বাজার' দেখিয়া, জন-কোলাহল দেখিয়া, সহরের পথে দাঁড়াইয়া এই এক কথা মনে হয়—মা যে আনন্দময়ী, সে আনন্দময়ীর পূজার আয়োজন কৈ ? জুতা, জামা, কাপড়ের সংগ্রহে কি সেই আনন্দের সংবাদ পাওয়া যায় ? ক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করুন, 'মহাশয় ! আনন্দে ক্রয় করিতেছেন তো', তিনি তৎক্ষণাৎ বলিবেন, 'আনন্দ কি মশাই, চক্ষুস্থির। এবার একা নূতন বেয়াই দুইশত টাকার ফর্দ্দ পাঠাইয়াছেন।' বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করুন, 'কিহে বাপু আনন্দে বিক্রয় করিতেছ তো ?' সে তৎক্ষণাৎ বলিবে, কৈ এবার তেমন খদ্দের কৈ ? বাজার বড়ই মন্দা।' পূজার বাজারের যে আনন্দ এই খানেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল।

তারপর সহরের যে সব বড় বড় বাবুদের বাড়ী পূজা হয়, তথায় যাইয়া সন্ধান লউন ; দেখিবেন যে, কর্ম্মকর্ত্তাদিগের মধ্যে অনেকেরই মুখ 'ভারি'। কেহ বলিবেন—"হাঁ পূজা হবে বটে, কিন্তু যে বাজার প'ড়েছে, 'নমো নমো' ক'রেই সারিতে হইবে।" কোথাও বা সরকার মহাশয়ের মুখে শুনিবেন, "এবার, বাবুদের বিষয় 'পাটিশনে' উঠেছে—তা পুজার কি হবে বলা যায় না।" আবার কোথাও বা নব্যতন্ত্রের বৌদ্ধ-দার্শনিক বাবুর দলের মুখে শুনিবেন—"এবার বসু মহাশয়দিগের পূজা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ ওসব পৌত্তলিকতা, শিক্ষিত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতেছে। আর সাহেবেরাও এই প্রথাকে অসভ্যতার চূড়ান্ত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং এই সকল কারণে ও দেশের অবস্থা ভাবিয়া আমরা বসু মহাশয়কে অর্থ-শাস্ত্র ও অর্থ-নীতির মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছি। তিনি অতঃপর পূজা বন্ধ করিয়া বাজে খরচের মাত্রা কমাইয়াছেন।" কর্ম্ম কর্ত্তাদের মধ্যে অনেকের মুখেই এইরূপ নানা ওজর শুনিতে পাওয়া যাইবে।

সহর ছাড়িয়া একবার পল্লীগ্রামে আসুন। দেখিবেন যেখানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহা সমারোহে পূজা হইত, আজ সেই চণ্ডীমণ্ডপের ছাউনীতে খড় নাই। কোন কোন স্থানে দুই একজন প্রাচীনা আছেন, তাঁহারা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পূজার তিন দিন সেই ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপে 'আলিপনা' দিয়া থাকেন। কোন কোন গৃহস্থের বাটীতে তালা বন্ধ। বাটীতে 'সুন্ধ্যা' পায় না, 'ম্যালেরিয়ার' কৃপায় গৃহস্থেরা গ্রাম ছাড়িয়া পশ্চিমে গিয়াছেন। মুচিপাড়ায় গিয়া দেখুন, কাহারও কাহারও ঢাকে কুই ধরিয়াছে, কাহারও ঢোলটি আবর্জ্জনা স্তুপে পড়িয়া আছে। কি করে, গ্রামে পূজা নাই, পেট চলে না; যদিও পেট চলে তো জ্বরের ধমকে প্রাণ বাঁচে না, তাই তাদের মধ্যেও অনেকে সহরের আশে পাশে 'চটকলে' বা কারখানায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। আর যে সকল কৃষক শ্রেণীর জীব অস্থিচর্ম্মসার দেহ লইয়া কোন গতিকে গ্রামে পড়িয়া আছে—তাহারা এই পূজার সময় ঐ প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে, আর মনে মনে ভাবে "হায়! গ্রামে দু'দশ খানা পূজা থাকিলে আশ্বিন কিস্তীর খাজনাটার ভাবনা থাকিত কি?"

তাই মনে হয়, আনন্দময়ী মা আসিতেছেন শুনিয়া মনে হয়, মা কোথায় আসিবেন, কে তাঁহাকে আবাহন করিবে, আর কি দিয়াইবা তাঁহার পূজা করিব? আমাদের সম্বল কি? আমরা যে দীন—কাঙ্গাল।

তবে আছে শুধু আঁখিজল। দরিদ্রের, বিপন্নের, ভ্রান্ত জীবের সেই দু'ফোঁটা আঁখিজলে মায়ের পদে অর্ঘ্য দিবার শক্তিটুকুও কি আমাদের নাই? তাহাও যদি না থাকে তো কি দিয়া মায়ের চরণ বন্দনা করিব? আত্মাভিমান, মিথ্যা-জ্ঞানময় সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অহরহঃ পাপ অসুরের তাড়নায় অস্থির হইয়া যদি দু'ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া মাকে ডাকিতে না পারি তো তবে আর কি দিয়া মাকে পূজিব। আমরা মায়ের অন্ধ, পতিত, দীনহীন, কাঙ্গাল সন্তান ভাবিয়া প্রাণ বিহ্বল হয়—মা কোথায় আসিবেন, কে তাঁহাকে আহ্বান করিবে, আর কি দিয়াইবা মায়ের পূজা করিবে!

শুষ্ক চোখে জল ঝরে না, নির্ব্বেদ প্রাণে আর্ত্তনাদ উঠে না, প্রাণ ভরিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারি না, চোখ মেলিয়া মাতৃরূপ দেখিতে পাই না। মায়া পিশাচী—পাপ অসুরের ভয়ে সদাই ত্রাসিত হইয়া থাকি, ভয়ে ভয়ে চোখ

খেলিতে পারি না, যদিও খেলিয়া থাকি তো সর্ব্বত্র সেই বিভীষিকার ভাব জাগিয়া উঠে। ওগো করুণাময়ী! আমাদের এদশা দেখিয়া যদি তুমি করুণা করিয়া আগমন কর, তবে এইটুকু কর মা, যেন জগতের পশুভাব তোমার চরণতলে দলিত হয়, যেন পাপ অসুর তোমার করাল কৃপাণ-বিদ্ধ হইয়া থাকে, যেন দশদিকের শত বিভীষিকা তোমার দশভুজের দশ-প্রহরণের দ্বারা নিবারিত হয়। যেন জগতের জীব, মাতৃত্বের ভাবে বিভোর হইয়া ভ্রাতৃভাবে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরম প্রীতি, শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ পাইয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়া বলিতে পারে—

দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াং।
সর্ব্বলোক প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাং॥
মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাং।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহং॥

১১—আনন্দ ও আনন্দময়ী।

—:*:—

বৎসরান্তে, জলভরা চোখে, বুকভাঙ্গা শোকে, আকুলিত প্রাণে, কাঙ্গাল আহ্লাদ ক'রে বলে,—"আয় মা আনন্দময়ী নিরানন্দ ভবনে।"

ভক্ত ভক্তির উচ্ছ্বাসে, পীড়িত ভোগের অস্থিরতায়, আর্ত্ত বিহ্বলিত চিত্তে, অশান্ত ব্যাকুল কণ্ঠে, নির্য্যাতিত কাতর প্রাণে,—ঐ শুন সমস্বরে সেই বৈদিক তানে তান মিলাইয়া গাহিতেছেন :—

"আবিরাবীর্ম এধি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী মাতার আবির্ভাবের জন্য এই যে আহ্বান, এ কিসের জন্য? ভক্ত, তুভিক্ষু, তাপিত, পীড়িত সকলে সমস্বরে যে এই আবাহন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে, ইহার চরম লক্ষ্য কি? কোন্ শুভ আকাঙ্খায়, কোন সিদ্ধি লাভের প্রত্যাশায় হিন্দুর প্রাণে এই শ্যামল-শরতে এ ভাব-লহরী ফুটিয়া উঠে? কোন্ আকর্ষণে চিত্ত এ ভাবে আকৃষ্ট হয়? বড় দুঃখে প্রাণ জ্বলে, অতিকষ্টে হৃদয় ফাটিয়া যায়, তবু কিসের আশায়, কোন তৃপ্তির উদ্দেশে, তাহারা আজ এ

আবাহনের প্রতিধ্বনি অতল-সিন্ধুতীরে, উচ্চ-গিরিশিখরে সমুত্থিত করে। সাধ, সে প্রতিধ্বনি মৃদু-মন্দ-মলয়-পবনে রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাউক; ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশে সে স্বর-লহরী গুরু-গম্ভীরে ঘোষিত হউক; সুদূরে সাগরপারে নগরে নগরে নরনারীর মুখে সে মন্ত্র মুখরিত হউক, কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর-গুঞ্জনে তাহারই ঝঙ্কার ধ্বনিত হউক।

এ আবাহন কি একের জন্য? এ কি নীচ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য? একি মর-জগতের ক্ষণস্থায়ী জড়ীয় লাভের প্রত্যাশায়? না তাহা নহে। শুন— শ্রবণেন্দ্রিয় সংযত করিয়া শুন, সাধন-রত নরনারী ভক্তি-বিমিশ্রিতভাবে, অবনত মস্তকে, যুক্ত করে, মুক্তকণ্ঠে ঐ বলিতেছে;—

"নমো সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি! নমোঽস্তু তে॥

শুনিলে?—এতো একের কথা নয়, এতো নীচ স্বার্থসিদ্ধির কথা নয়, এতো ক্ষণস্থায়ী জড়ীয় অভাব পূরণের কথা নয়, এ যে "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যের" কথা, এ যে বিশ্বমঙ্গলের কথা; বিশ্ববাসীর সুমঙ্গল সংবাদ। শুধু মনুষ্যের নয়, বিশ্বের সর্ব্বত্র, স্থাবর জঙ্গম যেখানে যা কিছু প্রকট বা অপ্রকট হইয়াছে, তৎসমুদায়ের আনন্দ-বার্ত্তা—অভিনব-সুসংবাদ।

যুগে যুগে হিন্দু এ সুসংবাদ জগতে প্রচার করিয়াছে,—ভবিষ্যতেও করিবে। শ্যামল-শরতে, যখন বর্ষান্তে সরল প্রকৃতি আপন মাধুর্য্যে আপনি বিভোর হইয়া বিমলতম চন্দ্ররশ্মির আলিঙ্গনে সমগ্র বসুধার চিত্তবিনোদন করিতে চেষ্টা করেন, তখন মানব এ বাহ্য প্রকৃতির সহিত অন্তঃ প্রকৃতির মিলন করিবে না কেন? এই মিলনে যে পূর্ণতা লাভ হয়, জগতের তন্মাত্রিক সমতা স্থাপিত হয়; সে অবস্থায় দুঃখ থাকে না, শোক থাকে না, হিংসা থাকে না;—আসে কেবল অবিমিশ্র আনন্দ, বিরাজ করে কেবল স্বর্গীয় শান্তি। সে অবস্থায় প্রকৃতি বিভোর, বিশ্ব তন্ময় হইয়া এক অপরিসীম অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-তরঙ্গে প্রবাহিত হয়, তাই আজ বিশ্বের শান্তি ও আনন্দ-রাজ্য স্থাপনের জন্য ভক্তগণ কর্ত্তৃক এ আবাহন!

আনন্দময়ীর, এ দৈবী প্রকৃতির যাহা প্রতিকূল—সে দৈত্যভাব বিদূরিত না করিলে তো জগতে শান্তি স্থাপিত হয় না? তাই ভক্ত এ শুভক্ষণে জগতে

শান্তির সুসংবাদ প্রচার করে, আর আনন্দময়ীর সাধনায় নিমগ্ন হয়। যাহারা শান্তি প্রয়াসী, যাহারা আনন্দের ভিখারী তাহারা এ আহ্বানে আকৃষ্ট হয় আর সমস্বরে যুক্তকরে ধারা-বিগলিত নেত্রে গাহিতে থাকে ;—

"দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে! প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য॥
বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ।
দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতের্নিত্যং যথা সুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥"

উঠুক এ মোহন-মন্ত্র কণ্ঠে, ছুটুক এ ভাবতরঙ্গ বিশ্বের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বিশ্বের দৈন্য-ভাব বিদূরিত হউক, সর্ব্বত্র ভূমানন্দে প্লাবিত হউক, দেবী আনন্দময়ী, শান্তিময়ী, জগজ্জননী, বিশ্ব-হৃদয়ে বিরাজিতা হউন। আর বিশ্ববাসী হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া, পশু-ভাব বিদূরিত করিয়া ; ঐ শ্যামল-শরতের বিমল চন্দ্রকিরণবৎ, শুভ্র-সাহসে, হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সাগ্রহে আবার বলুক— ;

"আয় মা! আনন্দময়ী নিরানন্দ ভুবনে।"

প্রীতিময়ী, শান্তিময়ী, করুণাময়ী জননীর আগমনেও যে আনন্দ—মায়ের পূজাবসানে দশমীতেও সেই আনন্দ। যিনি আনন্দময়ী—সর্ব্বত্রই তাঁহার আনন্দের বিকাশ হয়। তাঁহার নামে আনন্দ, তাঁহার পূজায় আনন্দ, তাঁহার আরাধনায় আনন্দ, তাঁহার দর্শনে আনন্দ, তাঁহার অদর্শনেও আনন্দ প্রবাহ চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া দেয়।

জীব! তুমি না সেই আনন্দের অধিকারী? আনন্দময়ীর অংশকণা আশ্রয় করিয়া আছ বলিয়া না তোমার সুখ-লালসা জাগিয়া উঠে? কোথা সুখ, কিসে সে সুখ পাওয়া যায় এই ভাবনায় তুমি অহরহঃ অস্থির হইয়া বেড়াইতেছ। সংসারে স্ত্রী, পুত্র, ধন, যশ, মান—এ সকলের ভিতর সুখের সন্ধান করিয়াও তো তোমার সুখের আকাঙ্ক্ষা মেটে নাই। তাই না আজ আনন্দের আধার আনন্দময়ীকে দেখিয়া তোমার প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে? বিশাল বিস্তৃত মহাসাগর-সমক্ষে তটিনীর ন্যায় তোমার প্রাণ মার পানে ছুটিয়া যায়? আর মায়ের চরণে শরণ লইয়া—তোমার সুখের কণ্টক, তোমার আনন্দধামের

পথাবরোধক, রিপু-দস্যুদল দলিত হওয়ায় তুমি বিমল আনন্দের আস্বাদ পাইয়া ধন্য হও, কৃতকৃতার্থ হও, আর প্রাণের মাঝে প্রার্থনার ধ্বনি ঝঙ্কার করিয়া উঠে।

তখন তোমার জীবনে নব ঊষার নব আলোক পতিত হয়, মাতৃ-প্রেমালোকে অজ্ঞান, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ কাম উজ্জ্বল আলোকের প্রকাশে অন্ধকারের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়। আর তুমি তখন মায়ের আদর পাওয়া, মায়ের সোহাগ পাওয়া—সরল শিশুটির মত যেন বিজয় গৌরবে যেদিকে চাও সেদিকেই মায়ের অপরূপ রূপের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাও। তোমার অন্তরে যে আনন্দ বাহিরেও সেই আনন্দের লীলা খেলা। আহা! আনন্দময়ীর জগতে সর্ব্বত্রই এই আনন্দ. জীবন এমন মধুময়। প্রাণে প্রাণে, অণুতে পরমাণুতে সে প্রেমানন্দের লীলা চলিতেছে। সে আনন্দের বেগে তুমি বাহু প্রসারিত করিয়া জগতের প্রত্যেক জীবকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হও। মধুর ভাবে, প্রীতির বাঁধনে স্নেহের সম্ভাষণে—হৃদয়ে হৃদয়ে—সে আনন্দের লহরী প্রবাহিত হইয়া জগতকে মধুময় করে, সর্ব্বত্র শান্তি প্রীতি ও আনন্দের অপূর্ব্ব ভাব জাগিয়া উঠে।

তাই মায়ের আগমনে যে আনন্দ, দিবসত্রয় সাধনায় যে আনন্দ, বিজয়া দশমীতে ততোধিক.আনন্দের বিকাশ হইয়া থাকে। হায়! ভ্রান্ত মানব! সেই ভাবটুকু ধরিয়া রাখ না কেন? জগৎবাসী একবার চাহিয়া দেখ, এ দৃশ্যটি মর্ম্মে আঁকিয়া লও। মানব নীচবৃত্তির দাস হইয়া কি দশা প্রাপ্ত হয়, আর মাতৃপ্রেমে বিভোর হইয়া ভ্রাতৃভাবে জগৎবাসীকে আলিঙ্গন করিলে—কোন অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী হয়, কোন অপূর্ব্ব বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হয়, কোন্ আনন্দময়ী শক্তির অধিকারী হয়। তুলনা কর, তাহার সহিত তোমার ধন, জন, রাজ্য, সম্পদ কত ক্ষুদ্র। ভাবিয়া দেখ, সে বিজয় গৌরব অপেক্ষা তোমার যশ, মান, নগর-বিজয় কত তুচ্ছ! আলোচনা করিয়া দেখ—সে আনন্দময়ীর অসীম শক্তির অপূর্ব্ব প্রভাব অপেক্ষা তোমার রক্তমাংসময় পতনশীল দেহের জড়ীয় শক্তি কত নীচ, কত খাটো। তোমার এ সকল যে পার্থিব—আর সে যে অপার্থিব। তোমার অহঙ্কার ব'লে যা কিছু তা সকলই যে নৈসর্গিক, আর সে যে স্বাভাবিক। তোমার যা কিছু বাহাদুরী সেতো ক্ষণিক—দু'দিনের জন্য, আর মাতৃপ্রেমের সুমঙ্গল বর লাভ যে, চিরদিনের জন্য আর সে যে ইহপরলোকের চিরসম্বল।

জগৎবাসী, যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, সকলেই তো জানেন যে, তাঁহাদের অস্থি মাংসময় দেহ কয়েকটা বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজা হউন, কাঙ্গাল হউন, বীর হউন বা কাপুরুষ হউন, ধনী বা নির্ধন, বিদ্বান্ বা মূর্খ—শেষ দশায় সেই মৃত্যুর তোরণদ্বারে প্রবেশ করিতে হইবেই। কিন্তু তারপর? তারপর যে কি তাহাই ভাবিবার কথা।

সে কথা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছে? সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রই তো পরলোকের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল ধর্ম্ম গ্রন্থ তো পরলোকের পথ উজ্জ্বল করিবার জন্য বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন ও ইহলোকে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করিলে পরলোকে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইবে—এ কথা বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পারেনাই; ভ্রান্ত মানব, মায়ামোহিত জীব, অহঙ্কারে মজিয়া যদৃচ্ছা জীবন যাপন করিতেছে। সেটা কি উচিত? জীব যে এইভাবে নিদ্রিত থাকিবে তাহা কি করুণাময়ী মায়ের প্রাণে সহ্য হয়? তাই প্রতি বৎসর জগতে প্রীতি, শান্তি ও আনন্দের ভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার অন্যতম উদ্দেশ্য। জীব মাতৃপ্রেমে বিভোর হইয়া থাক, ভ্রাতৃভাব হৃদয়ে পোষণ কর, আনন্দময়ীর লীলা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর। এ ভাব লইয়াই জীব—এ ভাব ছাড়া হইলেই পতন।

"ভাগবত-তত্ত্ব-সুধা।"

—:•:—

নিবেদন।

বহুদিন পরে পুনরায় পাঠকগণের সমীপে সাজি হস্তে উপস্থিত হইলাম, সাজি ভগ্ন ও মলিন; কিন্তু ইহার মধ্যে যে পুষ্পগুলি আছে, আশা করি তাহা রসজ্ঞ পাঠকগণের তৃপ্তিপ্রদ হইবে, কেননা পুষ্পগুলি আমার উদ্যান-জাত হইলেও ইহার স্রষ্টা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। প্রিয় পাঠকগণ! আমার ভাষার সাজিটি মলিন, ইহাতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইবেন না কিন্তু ভাবগুলি শ্রীভগবানের, এজন্য ভাবুক ভক্তগণের এ উপহার অযোগ্য হইবে না।

ভাষায় অধিকার না থাকিলেও যাঁহার উৎসাহে প্রাণের ভাবগুলি "ভক্তি" পত্রিকায় লিখিত হইত, "ভক্তি" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয়

সেই পূজ্যপাদ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের তিরোধানে আমার লেখনীরও সমাধি হইয়াছিল, কিন্তু কেবল আমাদের পরম স্নেহভাজন বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহেই তাহার পুনরুত্থান সম্ভবপর হইল। কিন্তু তিনি আমার স্কন্ধে যে বিষম ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহা আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তি বহন করিতে পারে কি না, অন্ধ-বিশ্বাসের বশে সে সম্বন্ধে তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই, তবে ভরসা এই যে, শ্রীভগবানের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়, সম্পাদক মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাসের আকর্ষণে শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি যদি আমার ন্যায় অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়, আমাকে যন্ত্র স্বরূপ করিয়া শ্রীভগবান যদি তাঁহার লীলার নিগূঢ় তত্ত্বগুলি প্রচার করেন, তবে তাহা আমার পূর্ব্ব-সুকৃতি জনিত মহাভাগ্যের ফল বলিয়াই জানিব।—শ্রীকৃষ্ণলীলার ধারাবাহিক সূক্ষ্ম-তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা শ্রীভগবান যে বীজ রোপণ করিলেন পরে কোন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা তাহা ফলে ফুলে শোভিত হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

সূচনা।

শ্রীভগবান চৈতন্য-স্বরূপে সর্ব্বব্যাপী। শ্রদ্ধাবান হইয়া ব্যাকুল ভাবে সচ্চিদানন্দের পথে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে অনুভব, প্রত্যক্ষ ও লাভ করা যায় এবং এই জন্যই সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিগণ তাঁহার নাম রাখিয়াছেন সচ্চিদানন্দ। কেননা সতের পথে তাঁহার অস্তিত্বের অনুভূতি ও চিতের পথে তাঁহার বিকাশ প্রত্যক্ষীভূত হইলে, সূর্য্য ও তাহার রশ্মি—সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গের ন্যায় জীব যখন শ্রীভগবানের সহিত আপনার অচিন্ত্য ভেদাভেদ হৃদয়ঙ্গম করে, আপনার ও শ্রীভগবানের স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে এবং তাঁহাকে "প্রাণস্য প্রাণ" রূপে অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিয়া কেবল তাঁহাকেই একমাত্র প্রিয়তম বোধে আত্মহারা হয় তখনই সে আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীভগবানকে লাভ করে।

সচ্চিদের পথেই সাধক শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপীত্ব ও অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু লক্ষ্যস্থলে গমন করিবার পূর্ব্বে যেমন্ প্রথমতঃ পথের পরিচয় জানিয়া লইতে হয়, সেইরূপ স্বাধ্যায় বা গুরু-উপদেশ জনিত পরোক্ষ জ্ঞানের সহায়ে মুখ্যতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপীত্ব অনুভব করিতে হয়, এই অনুভূতি স্থায়ী হইবার পরে সূর্য্য-রশ্মি যেমন আতস প্রস্তরে

পতিত হইলে ঘনীভূত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করে; সেইরূপ শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য-জ্যোতী সাধকের কেন্দ্রাভিমুখীন চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া তাহার ভাবানুযায়ি ইষ্টমূর্ত্তিতে পরিণত হয় এবং ইহাই অবতার তত্ত্ব। অব— নিম্নে + তৃ ধাতু — তরণ সুতরাং অবতার অর্থে নিচুতে নামা, সূর্য্য-রশ্মির মধ্যে অগ্নি সূক্ষ্ম ভাবে সর্ব্বব্যাপী হইলেও যখন তাহা আতস প্রস্তর সংযোগে প্রকাশিত হয়, তখন যেমন সূর্য্যমণ্ডলস্থ অগ্নিময় তেজ নিম্নে অবতরণ করিল বলিয়া মনে হয় সেইরূপ শ্রীভগবান যেন স্বধাম হইতে আমাদের নিকট নিম্নে অবতরণ করিলেন বলিয়া মনে হয় এবং এই জন্যই এরূপ প্রকাশকে আমরা অবতার বলি। ভাক্তের নির্ম্মল চিত্তে যেমন ইষ্টমূর্ত্তির স্ফুরণ হয় সেইরূপ বিশ্বপ্রকৃতির নির্ম্মলাংশে প্রতিফলিত চৈতন্য জ্যোতী ঘনীভূত হইয়া অবতার রূপে জগতে আদর্শ স্থাপন করেন মায়ার অতীত হইলেও এই অবতার সকল দেশ, কাল, পাত্রের উপযোগী হইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন এবং এই জন্যই শাস্ত্র বলেন :—

অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ

যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ভাঃ ১।৩।২৬

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে যেমন অসংখ্য নদনদী বাহির হয় সেইরূপ আমা হইতে বহু অবতারের উদ্ভব হয়।

মহাভারতে যে দশ অবতারের কথা লেখা যায় তাহা ভাব ও বহুত্ব ব্যঞ্জক। দশ শব্দের অর্থ বহু এবং বিভিন্ন যুগে মীন, কুর্ম্মাদির ভাবে বহু অবতারের আবির্ভাব হয়, কলিযুগের প্রথমে বুদ্ধ ও পরে কল্কি ভাব, ফলে এই অবতার-লীলারূপ কার্য্য* শ্রীভগবানের নিত্যভাব-রূপ কারণের ছায়া স্বরূপ অবতারগণ স্বর্গাদিতে কলি অজ্ঞানী জন সাধারণের কর্ম্ম-জীবনের পবিত্রতা সম্পাদনের জন্য স্থূলভাবে আচরণের দ্বারা আদর্শ স্থাপন করেন এবং ঐ স্থূললীলার মধ্যে যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত থাকে, প্রকৃত সাধকগণ সেই তত্ত্ব অবলম্বনে জীবন গঠন করিয়া মুক্তি পথে অগ্রসর হন, তাঁহারা সাধ্যায় সাধনের দ্বারা পরোক্ষ-

* "ভক্তি" পত্রিকায় তত্ত্ব সুধালহরী নামে যে প্রশ্নোত্তর মালা বাহির হইবে তাহাতে অবতার-তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাইবে। (লেখক।)

জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক স্থূলের যবনিকা ভেদ করেন, পরে শ্রীভগবানের কৃপা-শক্তি-বলে সূক্ষ্ম ভাবের পথে পরিচালিত হইয়া বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়া চরম লক্ষ্যে উপনীত হন।

যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, নাস্তিকতা ও সংশয়ের অন্ধকার যখন জন সাধারণের মধ্যে প্রবল ভাব ধারণ করে তখন নির্ম্মল 'প্রকৃতি সম্পন্ন মহাত্মাগণ জগতের মঙ্গলের জন্য আকুল ভাবে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, ফলে সেই প্রার্থনার আকর্ষণে ভক্তাধীন শ্রীভগবান চিন্ময় মূর্ত্তিতে অবতার রূপে আবির্ভূত হন, সুতরাং ভক্তগণই গৌনভাবে লোকরক্ষক আর শাস্ত্র মুখে শ্রীভগবানের বাণীই তার সাক্ষী :—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্ত রূপেন লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

অর্থাৎ আমি নিত্য ও অব্যক্ত ভাবে অবস্থান করিলেও ভক্তগণের ভিতর হইতে লোক রক্ষা করি।

অন্ধকারের মধ্যে আলোক সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকিলেও যেমন স্থূল আলোকের প্রকাশ ভিন্ন অন্ধকার বিনষ্ট হয় না সেইরূপ চৈতন্য-সত্ত্বা অব্যক্ত সর্ব্বব্যাপী হইলেও অবতারগণের প্রকাশ ভিন্ন জন সাধারণের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয় না; অবতার লীলায় শ্রীভগবান মানবীয় ভাব অবলম্বন করেন, প্রভেদের মধ্যে এই যে, মানবগণ সর্ব্বদাই মায়ামুগ্ধ, কচিৎ কাহারও সাময়িক হংসের ভাব দেখা যায় কিন্তু অবতারগণের এই হংস বা জ্ঞান সর্ব্ব সময়ে অব্যাহত থাকে, শাস্ত্রে অন্যান্য অবতারগণের মধ্যে বরং সময় বিশেষে আচ্ছন্ন ভাব দেখা যায় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলার বিশেষত্ব এই যে, আবির্ভাব হইতে তিরোভাবের সময় পর্য্যন্ত ক্ষণেকের তরেও তাঁহাতে আচ্ছন্ন ভাব দেখা যায় না এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই শাস্ত্র তাঁহাকে পূর্ণাবতার বা অবতারি বলেন।

নির্ব্বোধ পাচালীকারগণ এ হেন অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে প্রাকৃত কালিমা ঢালিয়া জনসাধারণের সর্ব্বনাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই, অন্যান্য অবতার লীলায় আমরা যে স্থূল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপদেশ পাই, দ্বাপরযুগান্তে রজ-তম গুণের প্রাবল্যে শ্রীকৃষ্ণলীলায় সেই উপদেশের পূর্ণতা দৃষ্ট হয় কিন্তু হতভাগ্য আমরা—যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি নানা ভাবে আমাদের গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছে,

সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে যাঁহার নিকট আমরা মস্তক অবনত করি, তাঁহারই চরিত্রের হীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই না, ইহাতে যে আমাদের আদর্শ কত হীন হইয়া পড়ে এবং আধ্যাত্মিক অধঃপতন কিরূপ দ্রুতভাবে হয় তাহা ভাবিয়া দেখিনা, ক্ষণস্থায়ী সংসার-সর্ব্বস্য হইয়া নিত্য সম্পত্তি হারাইয়া ফেলি।

আহা! এই মহান্ শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থূলতত্বগুলিও কি চমৎকার শিক্ষা-প্রদ! পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু, আশ্রিত ও সমাজের প্রতি কি অদ্ভুত মায়া, লেশ শূন্য কর্ত্তব্য পরায়ণতা। শত্রুগণের প্রতি কি অদ্ভুত ক্ষমা! দণ্ডের মধ্যেও কি অদ্ভুত করুণা! কর্ত্তব্যের জন্য কি অদ্ভুত ত্যাগ! ব্রজবাসীগণের অপার প্রীতির আকর্ষণ কি তাঁহার কর্ত্তব্যকে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত করিতে পারিয়াছিল? সম্মুখে নিজের বংস ধ্বংস হইতে দেখিয়া ক্ষমতা সত্বেও কর্ত্তব্যের প্রেরণায় যিনি দর্শকের ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারই আবার প্রাণঘাতী শত্রু জরা ব্যাধের প্রতি কি অপার করুণা! এরূপ সহস্র দৃষ্টান্ত আছে, পাঠক-গণ! তাঁহার সমগ্র স্থূল লীলা আলোচনা করিয়া দেখুন কোন স্থানে অণুমাত্র উজ্জ্বল আদর্শ ভাবের ত্রুটিও দেখিতে পাইবেন না। পাঁচালীকারগণ ব্রজ লীলা যে ভাবে বর্ণনা করেন, মূল শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার কিছুই নাই, জয়দেবাদি কোন কোন উচ্চশ্রেণীর সাধু আদিরসে রাধাকৃষ্ণের বা ভক্ত-ভগবানের কাম-গন্ধ শূন্য অপ্রাকৃত লীলার যে রূপক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সাধক জন ভোগ্য, অনধিকারির হস্তে পড়িয়া ইহাই কলুষিত ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ব্রজধাম হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় আসেন তখন তাঁহার বয়ক্রম অতি অল্প ছিল সে বয়সে কি কামগন্ধের আভাস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে? পাঠকগণ! আমার নিজের জীবনের একটি ঘটনায় এ সমস্যা কিরূপে মিমাংসিত হইয়া ছিল তাহা আপনাদিগের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

একজন ভিখারী দুইটি সুন্দর সুকণ্ঠ বালককে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের বেশে সাজাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, একদিন আহার করিতে বসিয়াছি, গ্রীষ্মকাল, আমার স্ত্রী বাতাস করিতেছে, এমন সময় নিম্নতলে সেই বালক দুইটির সঙ্গীতের শব্দ শ্রুত হইল, শ্রবণমাত্রই আমার স্ত্রী পাখা ফেলিয়া সেইদিকে ছুটিল, আমার নিষেধ গ্রাহ্য করিল না। আহারাদির পরে এ জন্য তাহাকে অল্প তিরস্কার করিলাম বটে কিন্তু বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না, কেননা সে ভগবানের নাম

শুনিতে গিয়াছিল, আমার সামান্য স্বার্থের জন্য তাহাকে আর অধিক কি বলিতে পারি? কিন্তু সেই সময়ে সহসা ব্রজলীলার কথা মনে হইল, ভাবিলাম এই ভাবেই বাঁশীর রব শুনিয়া ব্রজগোপীগণ আপনাহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে ছুটিত, পিতার কথা—পতির কথা শুনিতেই পাইত না, সকল লাজে লজ্জিত সামান্য ভিখারী বালকের সঙ্গীতের যেরূপ আকর্ষণী শক্তি দেখিলাম, সেই সৌন্দর্য্যের খনি বালকরূপী বিশ্বমোহন শ্রীভগবানের বংশীধ্বনী, যাঁহার রব শ্রবণে যমুনা উজান বহিত, পশু পক্ষী এমন কি বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত মুগ্ধভাবে নিশ্চল হইত, তাঁহার মধুময় আকর্ষণে ব্রজগোপীগণ আপনাহারা হইয়া উদ্ভ্রান্ত প্রাণে ছুটিবে না কেন? স্বজনের নিষেধ কি তখন তাহাদের শ্রবণ গোচর হইত? পাঠকগণ! আর একটি কথা ভাবিয়া দেখুন, যদি তাহাদের মনে কোনরূপ গ্লানির ভাব বা কার্য্যে কোনরূপ ব্যভিচারের আভাস পর্য্যন্ত থাকিত, তাহা হইলে কি পিতা কন্যাকে, স্বামি স্ত্রীকে, পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিতে দিত? কোন ইতর পুরুষেও যে তাহা পারেনা, বিশেষতঃ সমাজ কি তাহা হইলে নীরব থাকিত? ফলতঃ অল্প বয়স্ক বালকরূপী ভগবানের উপর যাহারা কুভাবের আরোপ করিতে পারে তাহারা বাতুল মাত্র।

এবারে এই পর্য্যন্ত বলিয়া পাঠকগণের নিকট বিদায় লইলাম, আগামীবার হইতে বক্তব্য বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিব।

শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

কাঙ্গালের মনের কথা।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য।)

—:•:—

কতকাল হইতে যে এই জগদ্-যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে,—আর কত-কালই বা চলিতে থাকিবে,—এ কথা তুমি আমি কেন? কেহই বলিতে পারিবে না আর কেহ কোন দিন বলিয়াও যায় নাই।

তবে এক দিন এই বিশ্ব সংসার সৃষ্ট হইয়াছিল,—আর একদিন বিনাশ হইবে এ কথা যদিও যুক্তি সঙ্গত সত্য, তথাচ নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারিবে না,—সেই সৃষ্টি বা প্রলয়ের দিন কোন্ দিন?

...এ সম্বন্ধে একটি গণনা চলিতেছে বটে,—পরন্তু সেই গণনার সূত্র ধরিয়া দেখিলে সেই আদ্যন্ত দিন দুইটি আমাদের বহু দূরে। দূরে হউক বা নিকটে হউক,—তাহাতে সেই অখণ্ড অব্যয় মহাকালের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রলয়ের দ্বারা অবিনশ্বর সময়ের কণা মাত্রও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছেনা। আদ্যন্ত শূন্য সময় পড়িয়া আছে,—আর তাহার ভিতর দিয়া, অসংখ্য কোটি সৃষ্টি-প্রলয়ের ক্রিয়া সংসাধিত হইয়া যাইতেছে

এখন ভাবিয়া দেখ তো এই সীমা শূন্য সময়ের কতটুকু তুমি আমি "আমার" করিয়া লইয়া আসিয়াছি। কত তুমি আমি যে কালের চর্ব্বণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—এবং ভবিষ্যতে যাইবে, তাহার সংখ্যা করিবে কে?

তবে আমরা কি লইয়া এত গৌরব করিতেছি,—এত অহঙ্কার করিতেছি, পর-পীড়ন করিয়া পশুত্বের চরমসীমায় যাইতেছি? দু'টা দিনের জন্য কেন এই মরজগতে মরিতে আসিয়াছি? এই বিষয়টী অবশ্যই আমাদের চিন্তনীয়। আমরা এই সংসারে আসিয়া কি করিয়া চলিয়া গেলে, যথার্থ মানবোচিত কর্ত্তব্য পালন করা হইল, জীবনের লক্ষ্য স্থির থাকিল, ইহাই আমাদের প্রধান ভাবনার বিষয়।

আমি ধনী, আমি মানী, আমি কুলীন, আমি বিদ্বান, আমি রাজা, আমি বড় লোক, ইত্যাকার অভিমান মানবান্তঃকরণের সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক বৈ আর কি? প্রকৃতির ধ্বংসলীলায়,—রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, বড়লোক ছোটলোক, কুলীন, অকুলীন, সকলের অবস্থাই এক। দু'দিন পরে কোথায় র'বে তোমার রাজ্য, আর কোথায় র'বে তোমার কুল, মান, ধন, জন, কোথায় র'বে তোমার বিদ্যা বুদ্ধির গরব আর কোথায়ইবা র'বে তুমি ॥

রক্ত মাংসের মানুষ কেন যে কুল, মান, ধন, জনের গরবে আত্মহারা হইয়া পড়ে,—আমি ইহাই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিনা। ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি যাহাই তোমার থাকুক না কেন, তুমি বুঝিবে, "এ সকল আমার ঈশ্বর দত্ত সম্পদ;—এ সকলের সদ্ব্যবহার দ্বারা আমি জগতের কল্যাণ সাধন করিব।"

ঈশ্বর দত্ত সম্পদ লাভ করিয়া তাঁহার (ঈশ্বরের) ঈঙ্গিত বুঝিতে হইবে। এবং ঐ সকল সম্পদের ন্যায্য ব্যবহার দ্বারা তাঁহার প্রীতি সাধন করিতে হইবে। ইহাই হইল তোমার মানব জীবনের একটি কর্ত্তব্য সাধন বা গৌন কার্য্য। আর

মুখ্য কার্য্য হইল—প্রেম-ভক্তির পবিত্র পুষ্পাঞ্জলী দ্বারা আপন আরাধ্য দেবতার পূজা। জগতে যাঁহারা প্রেম-ভক্তির উপাসক তাঁহারাই ধন্য। অকিঞ্চনা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে মানুষ আর মানুষ থাকেনা,—দেবতা হইয়া যায়।

ভক্তি অমৃত স্বরূপা। জীব ভক্তি লাভ করিলে অমর হয়। অর্থাৎ তাঁহার আর জন্ম মৃত্যু হয় না। প্রেম, পঞ্চম পুরুষার্থ পরম ধন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের মুকুট মণি। ভক্তি যুক্ত ব্যক্তির মুক্তি পিপাসা থাকেনা। মুক্তি আপনি আসিয়া ভক্তের পরিচর্য্যা করে ইহাই শাস্ত্রের কথা।

ভক্তিলাভ করিলে, মরজগতের ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে হয় না। অতএব প্রেম ভক্তির পবিত্রালোকে সর্ব্বদা হৃদয়কে আলোকিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মিথ্যা সংসারের অনিত্য কোলাহলে মজিয়া থাকা উচিত নহে। আমার যখন একদিন মরিতে হইবে,—তখন আর কয়েকটা দিন অভিমানের দাসত্ব করিয়া যাওয়া সঙ্গত কি? একবার অবশ্য ভাবা উচিত,—"আমি কেন আসিয়াছি? কি করিতেছি?" তবে দেহ রক্ষার্থ যাহা যাহা করিতে হয় তাহা অবশ্য করিব। কিন্তু মনে রাখিব,—আমি মানব হইয়া পর-পীড়ন করিতে কি পরস্বাপহরণ করিতে আসি নাই। আসিয়াছি,—আত্মোদ্ধারের জন্য। পরোপকার করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিবার জন্য, আর আসিয়াছি,—ভগবানের অমৃত-মধুর প্রেম-ভক্তি লাভে মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে।

দিন তো এক দুই করিয়া পলে অনুপলে ফুরাইয়া যাইতেছে, ক্রমশঃ শ্মশান শয্যার দিকে অগ্রসর হইতেছি। হঠাৎ একদিন তোমার,—আমার সেই শেষের দিনটি আসিয়া উপস্থিত হইবে; যে দিন, আমি বা তুমি মায়ার সংসার ছাড়িয়া যাইব, মরা মানুষ হইব। সেদিন কিন্তু কেউ তোমার আপন হইবে না? মরা মানুষ না হইয়া আর কাহারই নিষ্কৃতি নাই।

মৃত্যু যে কখন হইবে,—তাহা কেহই বলিতে পারে না। অতএব মৃত্যুকে অতি নিকটবর্ত্তী জানিয়া সর্ব্বদা সরল মনে হরিনাম করা আমাদের কর্ত্তব্য। ভগবান্ গৌরহরির প্রবর্ত্তিত প্রেম-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী থাকিয়া কৃষ্ণ কথায় কাল যাপন করা উচিত। নতুবা শেষে হায় হায় করিতে হইবে।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইলে, শয়নে স্বপনে জাগরণে কেবল হরি নাম করিতে হইবে। হরিনাম ভিন্ন পরিণামের সম্বল আর কি আছে ভাই? বল, সকলে প্রাণ ভরিয়া মনের আনন্দে বল, হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

শ্রীশ্রীচরণ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কেশব লাল সেন।)

—:•:—

ভক্তি-পদ্মের উপর শ্রীচরণ সুন্দর শোভা দিবে বলিয়া "শ্রীশ্রীচরণ" ভক্তির অঙ্গে অঙ্কিত করা হইল। ভক্তবৃন্দ, একবার হৃদয় মাঝে দেখিয়া এ অধমকে কৃতার্থ করুন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে রাধাকৃষ্ণের মিলিতাঙ্গ তাহার সাক্ষী ঐ শ্রীচরণ। এখানে পুরুষের কঠোরতা ও কামিনীর কোমলতা, একত্রে মিঠেকড়া; তাই প্রভু, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন। আমার গৌরাঙ্গ এবার অন্য অবতারে, অনর্পিত অমূল্য প্রেমধন দান করিতে আসিয়াছেন, এজন্য অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে নাই। গোপনে শ্রীচরণ মধ্যেই সব লুকাইয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের সকল সম্পত্তি এই শ্রীচরণে সমাবেশ করিয়াছেন। ভক্ত, প্রেমিক, ভাবুক একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখুন, স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন।

আসুন এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাউক্। ধ্বজ চিহ্ন যেন আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আশা দিয়া বলিতেছে যে, প্রভুর চরণে শরণ লইলে সকল দারিদ্রতা ঘুচিয়া যায়। চক্র বলিতেছে, ব্রহ্মাণ্ডকে আমিই চালাইতেছি। ছত্র দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি যে, শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে লইলে ত্রিতাপের সন্তাপ আর গায়ে লাগে না। কমল, ভক্ত-রসিক ভ্রমরকে সুগন্ধ দ্বারা নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া বলিতেছে, একবার এ মধু খেয়ে দেখ, এত মিষ্টতা কোথাও পাবে না। পতাকা দেখাইতেছে যে, কালে শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্মই জগতে বৈজয়ন্তী নিশান তুলিবে। প্রভুর শ্রীচরণে "অঙ্কুশ" থাকিতে ভক্ত তোমার হৃদয়ে এত চঞ্চলতা কেন? মন মাতঙ্গের উপর ধর, তাহার সমস্ত বিষয়োন্মত্ততা দূর হইয়া যাইবে, তখন যে পদধূলী স্পর্শে পাষাণ হৃদয়া অহল্যার উদ্ধার হইয়াছিল, সেই শ্রীচরণধূলী খুঁজিয়া বেড়াইবে। বজ্র, হৃদয়ের মলিনতা নষ্ট করিবার ভার লইয়াছে। ভাই পাপী, শ্রীচরণে অবনত হইয়া নরকের ভয় করিতেছ কেন? "উর্দ্ধরেখা" যে তোমায় সঙ্কেত করিয়া বলিতেছে, অভয় পদে শরণ লইলে জরা মৃত্যুর

হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া নিত্য-বৃন্দাবনে স্থান পাইবে। আমার প্রভু, সর্ব্বত্র বিরাজমান্; ঐ দেখ, "অষ্টকোণ" তাহার নির্দ্দেশ;—তুমি বিপদে পড়িয়া প্রভুকে খুঁজিতেছ, কোথায় যাইতেছ, প্রভুর শ্রীচরণ যে তোমার হৃদয়ে। শুষ্ক মরুভূমি সদৃশ প্রাণে একটু অশ্রুবারি সিঞ্চন কর, দেখিবে, কেমন সুন্দর শ্রীচরণের দাগ্ উঠিয়াছে, দর্শনে বিভোর হইবে। শঙ্খ, গগনভেদী শব্দে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছে। ভণ্ড, পাষণ্ডী, কপটাচারীকে ধ্বংস করিবার জন্যই "ধনু" সর্ব্বদা উত্তোলিত রহিয়াছে। দীনহীনের বন্ধু থাকিতে আমাদের ভয় কি? গোষ্পদের মত ভবসিন্ধু পার হইয়া যাইব। প্রভু আমার পাপী তাপী, ধনী, কাঙ্গাল, বৃদ্ধ, বালক, মূর্খ, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শূদ্র, পুরুষ, স্ত্রী সকলকে সমান ভালবাসেন তাহা "ত্রিকোণ" দ্বারাই পরিস্ফুট। যদি প্রেমধনে ধনী হইতে চাও, যদি হৃদয় সাগর উথলিয়া শ্রীচরণ চুম্বিতে চাও, তবে পদধূলী হৃদয়ে মাখিয়া লও; শুক্লপক্ষের "অর্দ্ধচন্দ্র" সম একদিন প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া প্রেম-সৌন্দর্য্যে নিজে ডুবিবে এবং জগতকে ভাসাইতে পারিবে। তৃষ্ণাতুর! তোমার এ পিপাসা,—ধন, জন, ঐশ্বর্য্য সম্পদে মিটিবে না, অমৃত "কলস" হইতে একবিন্দু অমৃত পান করিয়া লও, সকল তৃষ্ণা দূরে যাইবে। ভীরু তুমি ভাবিতেছ তোমার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যময় পঙ্কিল আবিলতা পূর্ণ হৃদয়-সরোবরে ভক্তি-পদ্ম কেমন করিয়া ফুটিবে; ভাই, অশরণ-শরণের শ্রীচরণে শরণ লও, "মৎস্য" রূপে তোমার হৃদয়ের সকল অপবিত্রতা ঘুচাইয়া দিবেন। যদি সুন্দর অলঙ্কারে নিজ দেহকে সাজাইতে চাহ, শ্রীচরণকেই "বলয়" করিয়া লও, তবেই না তোমার হাত দুইখানি সুন্দর শোভা দিবে। কিম্বা যেন বলয় বলিতেছে শ্রীচরণ সেবা করাই হস্তের শোভা। শ্রীচরণ-কল্পতরুতে "লক্ষ্মী"র মত বেষ্টিত হইয়া থাকা বড়ই প্রাণারাম, চির শান্তিপ্রদ; তরু যেমন শীত, আতপ, বৃষ্টি সহ্য করিয়া আশ্রিতকে রক্ষা করে, তেমনি প্রভু আমার শ্রীচরণাশ্রিতকে মায়ের অঞ্চলের মত ঢাকিয়া রাখেন। শ্রীমতী রাধা শ্রীচরণ সেবা করিয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ নাম কর্ণের ভূষণ করিয়াছিলেন, তাহার আভাষ এই "কুণ্ডল।" শ্রীচরণই প্রেম, ভক্তি, স্নেহাদি রত্নের আকর, প্রমাণ স্বরূপ "পর্ব্বত" তাহার চিহ্ন। কুতর্ক, মূর্খতা ও অজ্ঞানতা চূর্ণ করিবার জন্যই "গদা" শ্রীচরণে স্থান লইয়াছে। যদিও ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা শুনা যায় তথাপি আমার মনোভাবই প্রকাশিত হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মধুরত্ব দুইটী চিহ্নে সুস্পষ্ট আছে,—দণ্ড ও কমণ্ডলু। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের, ইহাই অদ্ভুত রহস্য। মায়াবাদী অসুরদিগকে দণ্ড দিতে "দণ্ড" এবং ভক্তের নিকট হইতে প্রেম-নবনীত ভিক্ষার ছলে "কমণ্ডলু" পরিগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু জগতেরপাপ তাপ গ্রহণ করিয়াই, পাপীর "দণ্ড" নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শ্রীচরণ হৃদয়ে লইলেই এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন ভাই! একটা কথা মনে রাখিও, শ্রীচরণ যদি পাইতে ইচ্ছা কর, তবে আগে নিজে পতিত হও, অবনত না হইলে শ্রীচরণ ছুইতেও পাইবে না। পতিত হইলেই পতিত পাবনের কৃপা পাইবে জাতি, কুল, বিদ্যা, রূপ ইত্যাদি অহঙ্কার লইয়া যদি আইস, তবে গর্ব্বিত মস্তক কি শ্রীচরণের দিকে নামিত হইবে? কখনই না। যদি নিজেকে পাপী স্বীকার কর, অবনত হইয়া ধুলায় লুণ্ঠিত হও তবেই শ্রীচরণ স্পর্শে ধন্য কৃতার্থ হইবে। এ জগতে পাপী কে নয়? যাহার অহঙ্কার নাই। যদি পাপ না করিতে, তবে এ মায়ার বন্ধনে পড়িতে না। মনে রাখিবে অহঙ্কারেই পাপ। আর কপটতাকরিয়া কুলের গৌরব করিও না। জাতি, কুলে বিদ্যায় বা ধনে ভগবানকে পাওয়া যায় না ঐ শুন বৈষ্ণব কবি প্রেমানন্দ দাস বলিয়াছেন—

"জাতি কুলাচার কি করিবে তার
সে হরি যে ভজে তারি॥

দীনবন্ধুকে যদি পাইতে ইচ্ছা কর তবে আগে নিজে দীন হও। দীন না হইলে দীনবন্ধুকে পাইবে কিরূপে?

"অহঙ্কারী পাপী যারা, আমার দেখা পায়না তারা।
দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে।"

আর ভাই, যে বিদ্যায় শ্রীচরণে অনুরাগ হয় না, সে বিদ্যায় ধিক্! ওরূপ বিদ্বান অপেক্ষা মুর্খ থাকাই ভাল। তৃণের মত সৌভাগ্যশালী হও, তবেই শ্রীচরণ স্পর্শে ধন্য হইবে।" বল ভাই কাঙ্গাল, সেদিন কি সুখের দিন হবে, যেদিন কমলার বাঞ্ছিত শ্রীচরণ বুকে লইয়া বুক জুড়াইব!

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা যে অদ্যাপিও বর্ত্তমান, তাহার জলন্ত সাক্ষী "কমণ্ডলু" এখনও তাঁহার শ্রীহস্তে বিরাজিত। ইহাই লক্ষ্য করিয়া গৌরগত প্রাণ কোনও ভক্ত কবি লিখিয়াছেন—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

গৌর আমার "প্রেম-নবনীত" চিরকালই ভক্তের নিকট চাহিয়া থাকেন। আমরা বড়ই অধম, প্রভু আমাদের হৃদয়-দ্বারে নিত্য আসিয়া ফিরিয়া যান, আমরা তাঁহাকে আহ্বান করি না। আমরা যে কামিনী-কাঞ্চনরূপ অর্গল দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ধিক্ আমাদের জীবনকে, যাঁহা হইতে জীবন পাইলাম তাঁহাকেই স্মরণ না করিয়া রঙ্গরসে কাল কাটাইতেছি; এমন অকৃতজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ডে কেহ আছে কি? এখনও চেতন হও, দিন ফুরায়ে এল, ঐ দেখ কাল শিয়রে দাঁড়াইয়া। কি অনুতাপের বিষয় যে হৃদয়-সিংহাসনে "শ্রীশ্রীচরণ" মনোরম হইয়া শোভা দিবে, তথায় সাংসারিক অনিত্য নশ্বর "কামনা"কে বসাইয়া তাহার পূজা করিতেছি। এস একবার সরল মনে কপটতা ত্যাগ করিয়া "শ্রীশ্রীচরণ" ধ্যান করিতে বসি, সকল "কামনা" দূরে চলিয়া যাইবে। হৃদয় গলিবে, প্রেমের মন্দাকিনী ধারা ছুটিবে, ত্রিভুবন প্লাবিত হইবে। উদ্ধারের একমাত্র উপায়,—অবনত হইয়া "শ্রীশ্রীচরণ" ধ্যান কর। যাঁহার করুণায় "শ্রীশ্রীচরণ" মাহাত্ম্য এ লেখনী মুখে আসিল, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, "শ্রীশ্রীচরণে" মস্তক অবনত করিতেছি। ভক্তবৃন্দ, আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ মস্তক "শ্রীশ্রীচরণে" চিরকালই নত থাকে। যাঁহার হৃদয়-মন্দিরে শ্রীশ্রীচরণ সদা বিরাজিত, সেই প্রেমিক-পাগলের পদধূলী যেন অন্তিম সময়ে মস্তকে পাই, ইহাই "শ্রীশ্রীচরণে" ও ভক্তগণ সমীপে প্রার্থনা।

আনন্দ-নগর।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত উকীল।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

না।—ভগবানে প্রগাঢ় বিশ্বাস হইবার উপায় কি?

প্র।—এই সংসারে যাহাকে তুমি ভালবলিয়া জানিতে পার তাহাকেইত বিশ্বাস কর? যদি তুমি কাহাকে অতিশয় দয়ালু বলিয়া জান তবে তিনি লোকের দুঃখ দেখিলে যে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিবেন এ বিশ্বাস তোমার হইবে। যদি তাঁহার দুঃখ দূর করিবার সাধ্য থাকে তবে তিনি লোকের দুঃখ নিশ্চিতই

দূর করিবেন এ বিশ্বাস তোমার হইবে। একটী লোককে দয়ালু বলিয়া জানা এবং তাঁহার পরদুঃখ নিবারণ করিবার ক্ষমতা আছে ইহা জানা এই দুইটী জ্ঞান হইতে সেই লোক যে পরদুঃখ দূর করিতে পারিবেন এই বিশ্বাস তোমার উদ্ভূত হইয়াছে। এখন যদি তুমি জানিতে পার যে, ভগবানের ন্যায় দয়ালু আর দ্বিতীয় নাই এবং তিনি সকল জীবের সমগ্র অবস্থা নিরন্তর দেখিতেছেন। তাঁহার ন্যায় জীবের দুঃখ দূর করিবার সাধ্য আর কাহারও নাই। তবে কি লোকের দুঃখ ভগবান্ দূর করিবেন এ বিশ্বাস তোমার হইবে না? ভগবানের যত শক্তি, যত গুণ আছে এরূপ শক্তি ও গুণ আর কাহারও নাই। ভগবানের এই শক্তি ও গুণ যিনি নিরন্তর চিন্তা করেন তিনি ঐ শক্তি ও গুণের বিষয় জানিতে পারেন এবং এই বিষয়ক চিন্তা যতই বৃদ্ধি লাভ করিবে ঐ শক্তি ও গুণ সম্বন্ধে বিশ্বাস ততই বৃদ্ধি লাভ করিবে। শেষে ঐ বিশ্বাস এরূপ প্রবল হইবে যে সংসারে কিছুতেই তিনি ব্যতিব্যস্ত হইবেন না। ইহা হইতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভগবৎ শক্তি ও গুণ নিরন্তর চিন্তা করিলে ভগবানের উপর জীবের বিশ্বাস প্রগাঢ় হইয়া যাইবে।

শ্রদ্ধারত্নের এই সমস্ত সারগর্ভ সদুপদেশ নাগরিকগণের মর্ম্মে মর্ম্মে বিজড়িত হইয়াছিল। যে সন্তাপ তাহাদের হৃদয় তন্ত্রী আকুলিত করিয়াছিল এক্ষণে সে সন্তাপ নিবৃত্তি লাভ করিল। যেব্যক্তি স্বার্থরাজের প্রীতি কামনায় অপরের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, আজ তাহার চিত্ত অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল; শান্তি কামনায়—অপরের সুখের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অপরের সুখ নিমিত্ত যদি এখন তাঁহাকে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে হয় তিনি তাহা করিতেও প্রস্তুত। নাগরিকগণের শান্তি লাভই এক্ষণে প্রধান লক্ষ্য। শ্রদ্ধারত্ন নাগরিকগণের গুরুদেব। তাহাদের হৃদয় হইতে এক অদ্ভুত ভাবের প্রকাশ লক্ষিত হইল। তাহাদের নয়নে অশ্রুজল দেখা দিল। কথা সকল অর্দ্ধস্ফুটিত, শরীর রোমাঞ্চিত। কে যেন তাঁহাদিগকে বলিয়া দিল এই গুরুদেবের চরণ একান্ত মনে সেবা কর। তাহারা গুরুদেবের সঙ্গ ছাড়িতে চাহেনা। গুরুদেবের সন্নিধানই তাহাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল। গুরুদেবের উপদেশ পরম্পরায় তাহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল যে, স্বার্থরাজই তাহাদের সকল অনর্থের মূল। তাঁহারা এক বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিল যে, স্বার্থ বা তাঁহার প্রিয় বন্ধু অধর্ম্মের আর সেবা করিবে না। অপরকে কোনরূপে সুখী করিলে নিজের সুখ। অপরের ক্লেশ, দুঃখ, অভাব যথাসাধ্য দূরীকৃত করিতে পারিলে মনুষ্যের সুখ, মনুষ্যের স্বচ্ছন্দ। প্রকৃত সুখ লাভের অন্য উপায় নাই এই সিদ্ধান্ত তাঁহারা স্থির করিল এবং এই সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিল।

ক্রমশঃ

অকূল-কাণ্ডারী হরি।

জীবন জীবন হে প্রভু আমার,
    অপার পাথার তরী,
অকূলে আকুল ডাকি হে কাতরে,
    এস হে করুণা করি।

কেহ নাহি আর জগতে আমার,
নয়নে নিরখি সকলি আঁধার,
শুনেছি আমাব তুমি হে কেবল,
    অগতির গতি হরি।

ডাকি আজি তাই, এস হে দয়াল,
    মধু-মুর-অঘ অরি॥

কুবাসনা-বিষে দেহ জর জর,
    জ্ব'লে মরি সদা প্রাণে,
জুড়াইতে চাহ অনলে পশিয়া,
    সলিল শীতল জ্ঞানে।

ভু'লে যাই নাথ, ক্ষণে ক্ষণে আমি,
পরম অভয় তব পা' দু'খানি,
কি জানি কি মোহে কা'বে লই টানি,
    আশা,—কূলে যাবে তরি।

ভাঙ্গে ভ্রম ক্ষণে, ডাকি সকাতরে,—
    অকূল-কাণ্ডারী হরি!
জীবন জীবন হে প্রভু আমার,
    অপার পাথার তরী,
অকূলে আকুল ডাকি হে কাতরে,
    এস হে করুণা করি।

দীন—শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।

"সত্যলাভ।"

("গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা" প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, লিখিত।)

——:•:——

জগন্নাথ। আজ আমি তোমায় দু'টি কথা বলি, দয়া ক'রে শুনবে কি? তুমি জগতের পতি—আমি জগতের দাস, তুমি দীনবন্ধু—আমি দীনহীন, তুমি বিশ্বের আশ্রয়—আমি নিরাশ্রয়, তুমি রাজরাজেশ্বর—আমি পথের ভিখারী, তুমি পুণ্যের আধার—আমি পাপের আগার, তুমি জ্ঞানের মূর্ত্তিমান বিকাশ—আমি অজ্ঞানের অভেদ্য অন্ধকার, তুমি প্রেমের অনন্ত সমুদ্র—আমি স্বার্থের কুজ্ঝটিকা কণা, তুমি আনন্দময়—আমি আনন্দ হীন, তুমি সুখ—আমি দুঃখ, তুমি আলোক—আমি আঁধার, তুমি হর্ষ—আমি বিষাদ, তুমি দিবা—আমি রাত্রি, তুমি জ্যোতিঃ—আমি ছায়া,—আমি এইরূপে বিপরীত ধর্ম্মী অথচ তোমার নিত্য সহচর, তুমি না শুনিলে আমার কথা আর কে শুনিবে প্রভো!

গুণ হিসাবে আমি তোমার সহিত কথা কহিবার উপযুক্ত নহি সত্য, কিন্তু তবু আমি বলিব। কাঙ্গাল চিরদিনই দাতার দ্বারে আর্ত্তনাদ করে, শোনা না শোনা দাতার ইচ্ছাধীন। আমি তোমার দ্বারে যাহা বলিবার বলিব, শোনা না শোনা তোমার ইচ্ছা। তুমি সর্ব্বত্র চক্ষুময়, সর্ব্বত্র শ্রুতিমান, সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়; আমি যেখানে যেমন করিয়াই বলি তোমার কর্ণে তাহা প্রবেশ করিবেই। আমার চক্ষের কাতর চাহনি তোমার চক্ষে প্রতিভাত হইবেই। আমার হৃদয়ের তরঙ্গ-বিক্ষোভ তোমার হৃদয়ে অনুভূত হইবেই। তবে যে শুনিয়াও না শোন, দেখিয়াও না দেখ সে আমার অদৃষ্ট।

"আমার প্রথম কথা—তোমাকে কি আমি পাইব না? কেমন করিয়া চাহিলে তোমাকে আমি পাইব? কি করিয়া ডাকিলে তুমি আমার উত্তর দিবে? কি বেদনে সম্বেদিত হইলে বুঝিব তুমি আমার ব্যথার ব্যথী। কোন্ চক্ষে দেখিলে, দেখিতে পাইব তুমি আমার সাধের সাথী?"

শ্রুতি বলেন,—জ্ঞান ভিন্ন কেহ তোমায় পায় না। সেই শ্রুতি বাক্য বিশ্লেষিত করিয়া যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—জ্ঞান প্রত্যানুভূতি বা ভক্তির আকার পরিগ্রহণ না করিলে তোমায় হৃদয়ে নামাইয়া আনিতে সক্ষম হয় না। তদপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী বলেন ;—জ্ঞান ভক্তির আকারে এবং ভক্তি কর্ম্মের আকারে ঘনীভূত না হইলে তোমায় লাভের আশা দুরাশা মাত্র। কথা সত্য। জ্ঞান যতক্ষণ হৃদয়ে বেদন তুলিতে সক্ষম না হয় ততক্ষণ উহাকে মৃত জ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই বেদনেই শ্রুতির "বেদ" শাস্ত্রের সার্থকতা। আবার সে বেদন যদি আমাকে তোমার দিকে পরিচালিত না করে, তোমার সেবায় যদি নিযুক্ত না করে, তোমার কর্ম্মে যদি দীক্ষিত না করে, তোমার আরাধনায় যদি বিভোর না করে, আমার বলিয়া যে সকল কর্ম্ম সে সকলকেও যদি তোমার কর্ম্মে পরিণত না করে, তবে সে বেদন বা ভক্তি নারী চক্ষের লবণাম্বু মাত্র। আরাধনাময় জীবের নামই রাধা। জ্ঞান শূন্য ভক্তি বন্ধ্যার পুত্র শোক; ভক্তি শূন্য কর্ম্ম শিশুর ধূলা খেলা বা অন্ধের যুদ্ধ-বিক্রম। ভক্তি শূন্য জ্ঞান সারিকার পঠন। কিন্তু আমার সে আলোচনা অনাবশ্যক, কেন না আমায় তুমি এ তিনেই বঞ্চিত করিয়াছ বলিয়া মনে হয়। তবে কেমন করিয়া আমি তোমায় দেখিব—পাইব—জানিব ?

"আমার দ্বিতীয় কথা—তুমি না হইলে যখন আমার চলিবে না, জন্ম-মৃত্যু আবর্ত্তনময় কাল-চক্রের সংঘর্ষণে চূর্ণিত হইতে হইতে অবিরাম যখন তোমার দিকে আমায় ছুটিতেই হইবে, তোমার চরণের নূপুর-মেখলায় গ্রথিত হইতে না পারিলে যখন আমার সুখ বিরাম অসম্ভব, অথচ সেই তুমি স্নেহময়, করুণাময়, প্রেমময় তখন, তুমি দয়া করিয়া আসিলেই'ত আমার এ যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। আমার সহস্র চেষ্টা বিফল হইতে পারে, আমার বুকভরা উদ্যম ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, অনন্ত পথের মহাযাত্রায় আমার ক্লান্তি আসিতে পারে, পদস্খলন হইতে পারে, কিন্তু তোমার'ত সে সকল অন্তরায় নাই। তোমার ইচ্ছা ত কালের অনুকূল স্রোতের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। তুমি আসিলেই'ত আমার সকল জ্বালা দূর হয়। আমি আর যাইতে পারিতেছি না তাই বলিয়া তুমি কি দু'পা অগ্রসর হইয়া আসিতে পার না ?"

নৈশ অন্ধকারে আপনার হৃদয়ের অন্ধকার মিশাইয়া কোন একটী জীব দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে পূর্ব্বোক্ত রূপ চিন্তায় যখন আপনাকে হারাইয়া

ফেলিতেছিল তখন সহসা কোথা হইতে একটী সুন্দরী সুকুমারী নগ্ন বালিকা তাহার সম্মুখে আসিয়া অতি অপূর্ব্ব সরল ভঙ্গিমায় দাঁড়াইল। বালিকার প্রশান্ত স্থির স্নিগ্ধোজ্জ্বল আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নের সরল নিশ্চিন্ততাময় চাহনি সেই চিন্তামগ্ন ঋষির চিন্তাকুটিল চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত হইবামাত্র তাহার সঙ্কুচিত হৃদয় লজ্জায় আরও কুঞ্চিত হইল। ধীর স্থির সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততাময় সরল অথচ গম্ভীর আকাশবৎ উদার ভাবভঙ্গিমাময় সে বালিকা করপ্রসারণ করিয়া কোমল মধুর অথচ মহাসত্যের ধ্রুবাশক্তিভরা স্বরে কহিল, "তুমি ভগবানকে চাহ— আমার অঙ্গুলি ধারণ কর; আমি তোমায় তাঁহার নিকট লইয়া যাইব। দেখ, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এ তিনের একত্র সমাবেশ হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায়; তাঁহার করুণার মুখাপেক্ষী হইলেও তাঁহাকে বক্ষে আনা যায়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম বা নির্ভরতা এ সকলের যে কোন একটীকে অবলম্বন করিলে যদি অপরগুলি আসিয়া তাহার সহিত সম্মিবিষ্ট হয় তবেই তাহাকে লাভ করা যায়। কেন জান?

ওই চারিটি আমারই অঙ্গের জ্যোতিঃ। আমারই জ্যোতিঃ ক্ষেত্র বিশেষে এই চারিটি বিশেষ বিশেষ ভাবের বর্ণ রঞ্জনা ফুটাইয়া তুলে। এগুলি ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ নহে। আমি যত নিকটস্থ হইতে থাকি ততই উহাদিগের বিভিন্নতা বিদূরিত হইয়া গিয়া উহারা আমার এক মূল জ্যোতিঃরূপে পরিণত হয়। উহার প্রত্যেকটির মধ্যে বস্তুতঃ আমারই মূল জ্যোতিঃ ভিন্ন আর কিছু নাই। আমি না আসিলে, আমার অঙ্গুলি ধারণ না করিলে এ জ্যোতিঃ বিভ্রম দূর হয় না ভগবৎ লাভও হয় না। শাস্ত্রজ্ঞানের দীপ্তবিভা, করুণ ভক্তির কাতর অশ্রুধারা, কর্ম্মের দুরন্ত সংগ্রাম, নির্ভরতার সর্ব্বধ্বংসী ঔদাস্য আমি আসিয়াই সঞ্জীবিত করিয়া দিই। আমিই উহাদিগের জীবন। আমা শূন্য জ্ঞান আলোকহীন উত্তাপ মাত্র। আমা শূন্য ভক্তি লবণাম্বুধারা মাত্র। আমা শূন্য কর্ম্ম কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি মাত্র। আমা শূন্য নির্ভরতা আলস্য মাত্র। ওই সকল ও আমার আভাষ সত্য, কিন্তুমাত্র ও ক্ষীণ আভাসে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ওই ক্ষীণ আভাস পথে যখন আমি আসিয়া উপস্থিত হই, যখন জীব আমাকে পাইয়া আমার অঙ্গুলিধারণ করে, তখন তাহার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়। ওই চারিটীর যে কোনটী ধরিয়া হউক আমি আসিলেই তবে যাথার্থরূপে ওই চারিটীই লাভ হয়।

বলিতে বলিতে বালিকার দেহ ভঙ্গিমা পর্ব্বতবৎ অচল মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের বিকাশ ফুটিয়া উঠিল চির-প্রচ্ছন্ন মহাসত্য যেন সহসা আবির্ভূত হইল। সে সত্যের আলোকে চিন্তাকুল ব্যক্তির হৃদয়দেশ অবধি সহসা উন্মুক্ত হইয়া গেল; শেষে চিন্তাকুল ব্যক্তি বালিকার প্রসারিত করাঙ্গুলিধারণ করিয়া বাক্‌শূন্য স্তব্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বালিকা বলিতে লাগিল ;

"লোকে যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা কত করে, কত শাস্ত্রাদি পাঠ, কত ভগবদালোচনা, কত ভগবৎ বিরহের সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ক্ষেপ, সংসারাদি ত্যাগ করিয়া কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ, কত কি জীবকে করিতে দেখিতে পাই, কিন্তু যখন সত্য দেখিতে পায় তখন তাহারা বোঝে, তাহারা ভগবানের অস্তিত্বই মানে না। তিনি রহিয়াছেন শুধু এইটুকু যে সত্যভাবে মানিতে পারে সে-ই তাঁহাকে লাভ করে। তুমি কি তাঁহাকে মান? তিনি রহিয়াছেন এ জ্ঞান সত্যভাবে তোমার বুকে কখনও ফুটিয়াছে কি?"

তখন সেই চিন্তাকুল জীব আকুল ক্রন্দনে বালিকার দিকে চাহিয়া বলিল "মা, —তোমার আলোকে সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে—মা—যথার্থই আমরা মুখে যাহাই বলি তাহাকে মানি নাই—এ কথা কখনও ভাবিয়াই দেখি নাই। কে তুমি—মা কে তুমি?"

বালিকা বড় গম্ভীর হাসি হাসিয়া, চক্ষুদ্বয় আরও বিস্ফারিত করিয়া কহিল—আমার নাম "শ্রদ্ধা" আমার মূল জ্যোতিঃ বিশ্বাস।

কাঙ্গালের মনের কথা।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য।)

—:•:—

কাল, কর্ম্ম, স্বভাবের বশীভূত পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে জীবের স্থূলদেহ গঠিত হয়;—জীব, এই পতনশীল পাঞ্চভৌতিকদেহকে আশ্রয় করিয়া, কর্ম্ম ভোগ করিতে কয়েক দিনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র জড়জগতের এক জন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে মাত্র আবার ক্রমে অতীত জন্মের কর্ম্ম ফলের ভোগাবসান

হইলে, ইহ জন্মের কর্ম্ম পুঞ্জ সঙ্গে লইয়া, আর একদিন আপনার অতি সাধের পাঞ্চভৌতিকদেহটা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। কোথায় যায়,—কে জানে?

এই যে আত্মীয় স্বজন,—বিষয় বিভব ফেলিয়া চলিয়া যায়,—আর ফিরিয়া আসে না! বাসনা-জড়িত অমুক্ত জীব কর্ম্মভোগের জন্য আসিলেও পূর্ব্ব স্বরূপে না আসিয়া অন্যরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং আমরা বুঝি,—যে চলিয়া গিয়াছে,—সে আর ফিরিয়া আসিবে না। তবে রূপান্তরে আসাটা,—না আসারই মত। এখন প্রশ্ন আসিতেছে,—"কেন আসিলাম?" এত বড় নর দেহটাকে আশ্রয় করিয়া এই জ্ঞান-বুদ্ধির অফুরন্ত ভাণ্ডার বুকে করিয়া কেন আসিলাম? এই দুর্ল্লভ জন্মটা কি একবারেই উদ্দেশ্য হীন? মানব জীবনের কি একটা যথার্থ লক্ষ্য নাই?

ঈশ্বরের কার্য্য, উদ্দেশ্য হীন হইতে পারে না। এই নশ্বর মায়িক জগতে জীবের একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য আছে। সেই কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন জন্যই, জীব জন্ম গ্রহণ করে। সদসৎ কর্ম্ম ভোগত সঙ্গে সঙ্গে আছেই আছে।

ঈশ্বর দিব্যজ্ঞান রূপ এক পরম সম্পদ সঙ্গে দিয়া মানুষকে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিয়াছেন। মানুষ ঈশ্বর দত্ত স্বাধীন শক্তি ও দিব্য জ্ঞানের অপব্যবহার করিয়া ক্রমে কর্ম্ম জালে জড়িত হইতে থাকে। সেই কর্ম্মভোগের জন্য মৃত্যু ও পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। মানবেতর জন্তুর কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন মানব জীবনের লক্ষ্য স্থির করাই উচিত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। মূল কথা এই মরজগতে মানব হইয়া আসিলাম কেন? এই দুর্ল্লভ মানব জন্মের সার্থকতা কি? মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কোন দিকে? রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সকলকেই একদিন এই—সাধের সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে,—একদিন 'নাই' হইতে হইবে, তবে এই কয়েকটা দিনের জন্য এই মরজগতে মরিতে আসিলাম কেন?

এই প্রশ্নটি সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন সাধু-হৃদয়ে অবশ্যই উদয় হইবার কথা। এ প্রশ্নের উত্তর দাতা কে? এই সার-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য জীবের এমন অকৃত্রিম পরম বন্ধু কে? উত্তরে সকলেই বলিতে বাধ্য যে "গুরু।" গুরু বলিতেছেন,— এই জগতের জীব সমূহ জন্ম মরণের ভিতর দি [illegible]

পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া করিতেছে। জন্ম-মরণের সময় জীবের অত্যন্ত দুঃখ হয়। ইহাপেক্ষা জীবের গুরুতর দুঃখ আর নাই বলিয়াই ইহার নাম আত্যন্তিক দুঃখ। এই জন্ম-মৃত্যু জনিত আত্যন্তিক দুঃখের অবসান করাই পুরুষের পুরুষকার।

সকাম কর্ম্মের ফলে মানুষ বারম্বার কর্ম্ম জগতে আসিয়া মর্ম্ম পীড়ায় পীড়িত হয়,—এবং অবশেষে অসহ্য যম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিয়া যায়। অতএব আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণ করিতে হইলে,—আজীবন নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে হইবে। কর্ম্ম মাত্রেরই যখন একটা ফল আছে,—তখন ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পুর্ব্বক, কর্ম্মকে নিষ্কামকরিতে হইবে। এই প্রকার অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মের ফল শ্রীশ্রীভগবান্ যশোদানন্দনের পাদপদ্মে উৎসর্গী কৃত হইলে জীব আর কর্ম্ম বন্ধনে জড়িতহয় না। কর্ম্মজগতে আসিয়া কেহই আর কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারে। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যক্ত হইলেই, কর্ম্ম ত্যাগ করা হইল।

ভগবানের পাদপদ্মে কর্ম্ম ফল সমর্পণ পুর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যাইতে পারিলে আর জন্ম-মৃত্যু হইতে পারে না। সেই মুক্তাত্মা নিত্যত্ব লাভ করিয়া অনন্তকাল নিত্যধামের অধিবাসী হইয়া চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করে। তাঁহার আর জন্মিতে মরিতে হয় না। এক মানব জন্ম ভিন্ন অপর কোন জন্মে জীব জন্ম-মরণের পথ বন্ধ করিয়া মহাপ্রস্থান করিতে পারে না।

সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্তে হরি ভজন করা কর্ত্তব্য। ভজনানন্দে সুখী হইতে পারিলে কোন প্রকার জাগতিক দুঃখ তাঁহার সান্নিধ্যে পহুঁছিতে পারে না। শরণাগত ভক্তকে ভগবান্ সকল প্রকার আপদ বিপদ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করেন।

গুরুদেব আরো বলিতেছেন দয়া বৃত্তিকে সযত্নে হৃদয়ে পোষণ করিবে। জীবে দয়া, তোমার মোক্ষের কারণ হইবে। সুখ, দুঃখ, পাপ-পুণ্য মানাপমান, লাভালাভ,—জয়াজয়—সমস্ত সমান জ্ঞান করিতে পারিলে আর তোমার দ্বারা অসাত্ত্বিক সকাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে না।

জগদস্থ যাবতীয় জীবে ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া নিজে নিরভিমান হইবে ও কাহাকেও পীড়ন করিবে না। প্রাণ দিয়া পরের উপকার ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে। সংসারের কামিনী-কাঞ্চনে যাহাতে তোমার মনকে আকৃষ্ট করিতে না পারে,—তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে।

এই সংসারের ধন-জন সমস্তই মিথ্যা, ধ্বংসশীল,—এইরূপ বিবেক বুদ্ধির বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা পরমার্থ চিন্তা করিবে। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু প্রভৃতি পথের পথিক হইলেও তাহারা কিছুকালের জন্য তোমার পোষ্য। তুমি সদুপার্জ্জনের দ্বারা তাহাদিগকে যত্নে প্রতিপালন করিবে। না করিলে তোমার কর্ত্তব্যের ভুল হইল, তুমি অপরাধী হইলে।

অনাসক্ত চিত্ত লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে,—কোনরূপ পরিতাপ ভোগের আশঙ্কা থাকে না।

সকলের প্রতিই সমভাবে প্রীতি প্রদর্শন করিবে। সাধ্যানুসারে দীন জনের সাহায্য করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে ইহ জগতেই স্বর্গ সুখের অনুভূতি হইবে। আত্ম পর ভেদ বুদ্ধি ঘুচিয়া না গেলে মানুষ প্রকৃত সত্য সমর্থন করিতে পারে না। মনুষ্যত্বেরও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

সত্য হইতে স্খলিত জীব বিষয় বুদ্ধির অনুচর হইয়া আপন মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে। পরহিংসা পরোপদ্রব করণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকার মানুষেরা দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইয়া ক্রমে কর্ম্ম সূত্রে জড়িত হয় ও বহুকাল জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া এই জঞ্জাল-যন্ত্রণা-পূর্ণ মরজগতে আসা যাওয়া করে।

অতএব যদি মানব জীবনের—সাফল্য লাভ করিতে চাও,—আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণ করিয়া চির সুখী হইতে ইচ্ছা কর,—তবে সর্ব্বদা সরল মনে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর। সাধু সঙ্গে বসিয়া আনন্দে কৃষ্ণ কথা কও। সাংসারিক সুখ-দুঃখে উৎফুল্ল বা অবসন্ন হইয়া পড়িও না। অহঙ্কারাভিমানের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না। কাহাকেও ঘৃণা করিয়া আপন মনুষ্যত্বের অপচয় করিও না। প্রেম ভক্তির পবিত্র সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ভগবানের পাদপদ্ম লাভই তোমার অত বড় মানব জীবনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বদা সৎসঙ্গে থাকিয়া, সদালাপ সৎকার্য্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য। ভগবানের সেবার্চ্চনা করিয়া, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবৎ প্রীতি সাধন করিতেই মানুষ হইয়া এই মর্ত্তলোকে প্রবেশ করিয়াছি। ধন, মান বৃদ্ধি করিয়া দু'টা দিন আমার আমার করিয়া,—পাশবশক্তির বলে পরপীড়ন করিয়া যাইতে আসি নাই।

পথের কাঙ্গাল।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।)

১২—আনন্দ-মীমাংসা।

—:o:—

কবি, দার্শনিক, ভক্ত এবং সাধকদিগের নিকট শরৎ-সমাগম যে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়, সে কথা—সেকালের সকল সৎসাহিত্যেই দেখিতে পাই। এখনও কবির প্রাণ,—নীলাম্বর-তলে হরিৎ-শস্য-প্রান্তরে ব্রীড়াবণতা নববধূর চারু চঞ্চল গমন-ভঙ্গীর ন্যায় বাত-বিকম্পিত ধান্যদলের লহরী-লীলায় সমাসীনা, শ্যামা-প্রকৃতির, মেঘ-মুক্ত চন্দ্র-কিরণ-বিধৌত শারদীয় সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া—বিভোর, বিমোহিত ও আত্মহারা হইয়া যায়। হিন্দু দার্শনিকের দিব্যদৃষ্টিতেও—এই শরৎ-সমাগমে—দিবি পৃথিবীর দুর্জ্ঞেয় বিরাট ব্যবধান, বিদূরিত হইয়া যায়, ইহ পরলোকের মধ্যবর্ত্তী মহাতমসাচ্ছন্ন অপরিচিত পুরীর প্রহেলিকাময় পরিচয় দেবীপক্ষীয় তর্পণ-বিধি প্রতিপালনে প্রকটিত হইয়া পড়ে। দিবা ও রজনীর সন্ধিস্থলে সন্ধ্যার দীপশিখা যেমন সচকিত চেতনার স্থিতি স্থাপনা করে,—জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, দেবীপক্ষীয় তর্পণ মন্ত্রের দিব্যালোকে সেইরূপ মানব চিত্তের কি বিরাট ব্যাপকতাই না প্রকাশিত হয়। দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অসুর, ক্রূর, সর্প, সুপর্ণ, তরু,—প্রভৃতি মানবাতীত জীব বা সৃষ্ট পদার্থ যাহা কিছু আছে—আর মানবের মধ্যে আত্মীয় পরিজন বন্ধু, অবন্ধু পরিচিত অপরিচিত—যে যেখানে আছে—সকলের মঙ্গলের জন্য—সকলের তৃপ্তির জন্য কি বিরাট বিশ্বজনীন প্রীতি প্রেরণা উন্মেষিত হয়। তাই এই শরৎ-সমাগমে—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বিরাট বিশ্ব যেন মধুময় হইয়া মধুবাতাচ্ছন্দের সুমধুর ঝঙ্কারে মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীষ দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত করে। ভক্ত ও সাধকের নিকট, এই শরৎ সমাগম যে সাধের—যে সাধনের, যে আশার, যে আনন্দের—যে ধ্যানের, যে ধারণার বিষয় ভাষায় তাহা ফুটিয়া উঠে না, বাহিরের বর্ণনায় সে

আন্তরিক আনন্দ অনুভূতির ভাব বিকাশ হয় না। শারদীয়া—সাধনা, যে, বিরাট বিশ্বব্যাপী—সার্ব্বজনীন্। এতো তোমার আমার নয়, এতো কেবল নীচ স্বার্থপর, কামনা কলুষিত চিত্তের প্রশমন প্রয়াস নহে। যে অঘটন ঘটন-পটিয়সী মহিয়সী আদ্যাশক্তি বিশ্বের অণু পরমাণু হইতে পূর্ণ সৃষ্টি পর্য্যন্ত — "অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—প্রকরণে, জড়ে-চেতনে, রাগে-বিরাগে, জ্ঞানে-অজ্ঞানে, শান্তি-অশান্তিতে, আনন্দে নিরানন্দে—প্রয়োজন অনুযায়ী ভাবে সর্ব্বথা প্রকটমানা—শারদীয়া সাধনা—সেই—শক্তিরই সাধনা। তাই না সাধক আপন সঙ্কীর্ণ সসীম গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অনন্তের অসীম প্রবাহের অনুভূত উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া বিশ্বের পরম হিতকর বিজয় বাণী ঘোষণা করে—"সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে, শরণ্যে এম্বকে গৌরী নারায়ণি! নমস্তুতে।"

এসব সতের কথা। এ সৎ-ভাব সকল সৎ-সাহিত্যেই দেখিতে পাই—এ সৎ-সত্তার তন্মাত্রা সকল সদ্ভাবাপন্ন মানবেরই মনে পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে অল্পাধিক পরিমাণে বিকশিত হয়। কিন্তু কেবল "সৎ" লইয়াইতো মানব সমাজ গঠিত নহে—সৎএর ভাগও আছে—বরং সৎএর সংখ্যাই অধিক।

শরৎ সমাগমে, সৎ ও সৎএর পার্থক্যটুকু হয়তো অনেকের নজরে ঠেকিবাও ঠেকেনা—কিন্তু নেহাৎ দায়ে ঠেকিয়া যাহাকে—এদিক্ ওদিক্ চুদিক্ দেখিয়া বেড়াইতে হয়—তাহাকে সত্যের অনুরোধ অবশ্য বলিতে হইবে যে, শারদীয়া মহামহোৎসব লীলা সৎ-সমাজে—অন্তর হইতে অন্তরতম স্থলে বিকশিত হয়। গ্রামের দীন, দুঃখী, কাঙ্গালের আনন্দের কথা ভাবিয়া তাদের আনন্দ—স্বভবনে দীনদয়াময়ীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাদের আনন্দ—বিধি নির্দ্দেশিত পূজা অর্চ্চনায় সসীম মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিকে, অসীম চিন্ময়ী ভাবে ধ্যান ধারণা করিয়া তাদের আনন্দ উথলিয়া পড়ে। সৎএর দলেও—এই শারদীয়া মহোৎসব সাধিত হয় বটে—তবে তার ভাব-ভঙ্গী সমস্তই বাহিরের ব্যাপার—সেটা কেবল খোলস লইয়াই নাড়াচাড়া। তাদের মধ্যে কেহবা গ্রামবাসীদের নিকট "আশ্বিন কিস্তির" খাজনা আদায় করিয়া—কেহ বা গৃহের গণেশাদি পঞ্চ দেবতা এবং গৃহ প্রতিমার* 'অঙ্গ-সজ্জার' আয়োজন করিয়া—কেহবা—গৃহ—গ্রাম—নগর—মার

* (আত্মীয় স্বজন ও স্ত্রী ইতি ভাবঃ।)

বাঙ্গালা—মুল্লুক পর্য্যন্ত ছাড়িয়া গিয়া এই উৎসব উদ্‌যাপন করেন। দেশে দীনদয়াময়ী মার আবির্ভাবেই যখন এ উৎসব—তখন মা'র নামে এ আড়া-আড়ি—ছাড়াছাড়ি ভাব কেন? সংএর দল ইহার উত্তরে যাহাই বলুন না কেন—কোন কোন প্রবীণের মুখে কিন্তু শুনিতে পাই—মাতৃ প্রতিমার নিকট নাকি পশুভাব বলি দিতে হয়, মনের কলুষ-কালিমা—ভক্তি অশ্রু প্রবাহে ধুইয়া ফেলিতে হয়; নীচ স্বার্থপরতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পরার্থপরতার দীক্ষা লইতে হয়, ঘৃণা—অবজ্ঞা—হিংসার ভাব সাধনা-খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিয়া—প্রেমের চক্ষে, প্রীতির টানে—আনন্দের আহ্বানে—বাহু বাড়াইয়া ছোট বড় বিচার না করিয়া—সকলকে বুকের কাছে টানিয়া আনিতে হয়। সংএর দলে—বিত্তবান্ বাবুরা—এ সব তো পারেন্ না—তথা কথিত দেশ হিতৈষীর দল—সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া এ মহাপ্রাণতা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন না। তাই গৃহ জননীর মত—জগজ্জননীর নামেও তাঁদের বিরাগ, মার নাম শুনিলেই কাণে হাত দিয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যান্।

এ কথা প্রবীণের কথা। ইহার জেরা করিতে যদি কাহারও প্রবৃত্তি হয় তিনি করুণ—কিন্তু প্রবীণের পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথার উপর কথা কহিবার অধিকার আমাদের নাই। অধিক আর বলিব কি—বিজয়া—দশমীর দিনও যেন ম্লান হইয়া আসিতেছে। সে রাম দাদা, শ্যাম খুড়োর হাসি মাখা প্রীতি সম্ভাষণ তো উঠিয়া গিয়াছে—বোস্‌জা—ঘোষজা—রায় মহাশয়ের দলও তো গা-ঢাকা দিয়াছেন—এখন যাঁহারা আছেন, আজন্ম যাহাদিগকে আপনার বলিয়া ভাবি,—তাঁহাদের মধ্যেও সে আনন্দ-মিলনের পরিসর যেন ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। এ কথা কাল্পনিক নহে—বৃদ্ধের প্রতি সম্মান—জাতি ও বর্ণগত মর্য্যাদা রক্ষা—এ সব যেন অতি দ্রুতবেগে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

কালের গতিতে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী—সত্য বটে লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা কমিয়াছে—পূজা প্রকরণও হ্রাস পাইয়াছে—কিন্তু একেবারেতো মূলচ্ছেদ হয় নাই। এখনও যেখানে শারদীয়া উৎসব হয়—সেখানে চোখ্ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে—সমবেত নর-নারীর সভক্তি পুষ্পাঞ্জলির আগ্রহ লক্ষ্য করিলে, শত শত নর-নারীর প্রসন্ন চিত্তে প্রসাদ গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিলে—সন্ধ্যায় দীপ

দানের পর—ধূপধূনাগন্ধামোদিত পূজামণ্ডপে মঙ্গলআরত্রিক ধীর চিত্তে সন্দর্শন করিলে—সংএর মধ্যেও সৎ সত্তা উন্মেষিত হয়—সদ্ভাব জাগিয়া উঠে। তাই শরৎ সমাগম আমাদের মত সংএর নিকটও এত প্রিয়—এত সাধ্যসাধনের বলিয়া মনে হয়। সারা বৎসর নানা-দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া—তিনটি দিনের জন্যও যেন সং—সৎ হয়। ঢাক্ ঢোলের শব্দ শুনিতে পাই আর না পাই—পূজা বাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হউক আর না হউক—কারো বাড়ীতে কেহ নিমন্ত্রণ করুক আর নাই করুক—এই শারদীয় মহামহোৎসব যেন বিস্মৃত না হই; সারা বৎসর সংএর ঢং দেখাইয়া তিনটি দিনের জন্যও যেন সৎ হইতে পারি—আত্মার—বোধন করিয়া—আত্ম প্রসাদ লাভ করিতে পারি।—আর সেই সৎ-ভাবে থাকিয়া—ইহ পরলোকের, প্রান্তবর্ত্তী অবশ্যম্ভাবী গন্তব্য প্রদেশ মহাশ্মশানের মহানরক ভস্ম-ভূষণ মহাদেবকে-স্মরণ-করিয়া আত্মস্বরে বলিতে পারি :—

"পাবনা কি সতীনাথ সৎ-স্বরূপ হেরিতে—
ভক্তি-মালা পায়ে দিয়া জগদম্বা পূজিতে।"

বিরহে।

—:০:—

সখি! পরাণ জ্বলিয়া যায়—
যুবতি হইয়া কেমনেতে বল
বিরহ সহিব হায়!
যমুনার ঘাটে তমালের তলে
প্রতিদিন তারে হেরি সাঁঝকালে
ফিরে আসা হয় দায়;
পিছন ফিরিয়া পরাণ কেবল
তাহারে দেখিতে চায়॥
সখি! পরাণ জ্বলিয়া যায়।

সখি! হৃদি করে দুরু দুরু—
হৃদয়ের মাঝে কেবলি তাহার
বাজিছে বাঁশীর সুর!
সকলেতে বলে কলঙ্কিণী রাধা
নাহি শু'নে কথা নাহি মানে বাধা,
সকলি গোপের পুর।
পাইয়াও তারে যেন পাই নাই
মনে হয় কত দূর!
সখি! হৃদি করে দুরু দুরু!

সখি! কেমনে বেদনা বলি—
নিশি দিন সে যে রাখিয়াছে মোরে
শতেক কথায় ছলি!
কুলের কামিনী ছেড়ে দিয়ে কুলে
পরাণ ঢালিনু তার পদ মূলে,
গুরুজন কথা দলি,
পাপ করমের অনল শীখা
শীরায় উঠিছে জ্বলি!
সখি! বেদনা কেমনে বলি।

সখি! বিরহের কত জ্বালা—
না পারি বলিতে প্রিয় সখি তোরে
দেয় কত মোরে কালা!
দূর হ'তে শুধু বাঁশরী ফুকারি,
বেতসের আড়ে ডাকে নাম ধরি
মজাতে কুলের বালা,
হৃদয়-কাটিয়া-পরাণ কেবল
হেরিতে চাহে লো কালা।
সখি! বিরহের কত জ্বালা!

সখি! দিন রাত নাই জ্ঞান—
হৃদয়ের মাঝে জাগিছে কেবল
কালার কুটিল ঠাম।
মদনের বাণ অহরহ প্রাণে
ফুল ধনু লয়ে অবিরত টানে,
পাগল হ'য়েছি হায়।
না রহে পরাণ শেষে হয় বুঝি—
বিরহ জুয়ারে টান।
সখি! দিবারাতি নাহি জ্ঞান!

সখি! যাবনা যমুনা জলে—
ব'লো তুমি শ্যামে মরিয়াছে রাধা
তোমার বিরহানলে।
অভিশাপ তোমা করিয়াছে গিয়া
"রাধা হ'য়ে শ্যাম তুমি অনমিষা
"ভাসিবে আঁখির জলে,
"কাঁদিয়া জীবন অবশান হবে
"যমুনার কুলে কুলে।"
সখি! যাব না যমুনা-জলে।

দীন—শ্রী—

আনন্দ-নগর।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত উকীল।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

এতক্ষণ নাগরিকগণ শ্রদ্ধারত্নের সহিত কথা প্রসঙ্গে ব্যস্ত থাকায় রতিদেবী প্রভৃতি শ্রদ্ধারত্নের আত্মীয়বর্গের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে পারে নাই। অধিকন্তু শ্রদ্ধারত্নের সহিত প্রথম আলাপের সময় তাঁহারা যেরূপ বিভাব সম্পন্ন ছিল একণে তাঁহাদের সেই স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ফলতঃ

যে কারণেই হউক তাহারা ভক্তিভাবে বিনয় শিষ্টাচার পরিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগে রতিদেবী, প্রীতিসুন্দরী ও ভাবসুন্দরকে সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। শ্রদ্ধারত্নের সুমধুর সারগর্ভ সদুপদেশেই ইহাদের চিত্ত যে নির্ম্মল হইয়া এরূপ ভাবান্তরিত হইয়াছে ইহা রতীদেবী প্রভৃতি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের ভবনগরে আসিবার উদ্দেশ্য যে অনেকটা সফল হইয়াছে ইহা তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন। এক্ষণে নাগরিকগণের সম্বর্দ্ধনায় তাঁহারা বিশিষ্ট আনন্দ লাভ করিয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু সদুপদেশ দিবার ইচ্ছা করিলেন। রতিদেবী সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে সস্নেহে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—বৎসগণ! প্রভু শ্রদ্ধারত্ন প্রায় সমস্ত ধর্ম্মের গূঢ় রহস্যই তোমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। তোমাদিগকে অতিরিক্ত কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বৎসগণ! সামান্য দুই চারিটী কথা তোমাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ভগবানে আসক্তি মনুষ্যের করণীয়। আসক্তি লাভ সহজ সাধ্য নহে। মনুষ্যের সাধনা প্রয়োজনীয়। যাহার মধ্যে উৎকৃষ্টগুণ দেখা যায়, যে আমার মঙ্গল বিধান করিতে সতত সচেষ্ট এবং যে সততই মঙ্গল বিধান করে তাহার প্রতি আমাদের আসক্তি জন্মিয়া থাকে। ভগবান্ অনন্ত গুণের আধার এবং তিনি নিরন্তর বিবিধ প্রকারে জীবের কল্যাণ সাধন করিতেছেন এই বিষয় লইয়া প্রত্যেক মনুষ্যের প্রগাঢ় চিন্তার আবশ্যক। প্রগাঢ় চিন্তার বলে মনুষ্য যখন তাঁহার গুণ ও কল্যাণের বিষয় অবধারণ করে আসক্তি স্বতঃই আসিয়া তাহার চিত্তে তখন দেখা দিবে। মনুষ্য সংসারে থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে ভগবানের ইহাই উদ্দেশ্য। যে কার্য্য করিবে তাহা ভগবানের কার্য্য, তুমি কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহ এই বিশ্বাস সর্ব্বদা অন্তরে পোষণ করিবে। ভগবানে চিত্তের আসক্তি এবং এই বিশ্বাস একত্রীভূত হইলে মনুষ্যের কার্য্য কদাপি দোষাবহ হইবে না। যখনই কার্য্য হইতে বিরাম লাভ করিবে ভগবচ্চিন্তা তোমার চিত্তকে কখন ছাড়িবে না তুমি মঙ্গলময়ের চিন্তায় রতিলাভ করিবে।

তদনন্তর প্রীতিসুন্দরী স্বাভাবিক মধুর হাস্যে সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া কহিলেন:—বৎসগণ! ভগবানে মনুষ্যের যাহাতে প্রীতির উদ্রেক হয় তাহাও করা মনুষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবানের গুণ ও কল্যাণ মনুষ্য চিন্তা করিলে

চিত্ত মধ্যে আসক্তি যে আসিবে তাহা নিশ্চিত। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একটী নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইবে। সেইটী ভগবানে ভালবাসার উন্মেষ। স্ত্রী বল পুত্র বল মাতা বল পিতা বল ভগবানের সহিত আমাদের যত নিকট সম্বন্ধ সেরূপ নিকট সম্বন্ধ উহাঁদের মধ্যে কাহারও সহিত নহে। স্ত্রী পুত্রাদি আমাদের বাহিরের জিনিষ কিন্তু ভগবান্ আমাদের অন্তরের ধন, অন্তরের জিনিষ। যাঁহার সঙ্গে এইরূপ সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে জীব কেন মিশামিশি করে না? পিতা মাতা বল তাহাও তিনি, বন্ধু বা পতি বল তাহাও তিনি। জীব সাধনার উৎকর্ষাদি অনুসারে তাঁহাকে পিতা বলিতে পারেন প্রিয়তমও বলিতে পারেন। অন্যান্য ভাবে ভগবান্‌কে সাধনা করা অপেক্ষা মধুর ভাবে তাঁহাকে সাধনা করিলে সকল রসে তাঁহার সাধনা করা হয়। এই মধুর ভাবে সাধনার অবতারণা করিতে হইলে সেই অন্তরের ধনের সহিত মিশামিশি করা চাই। শ্রদ্ধারম্ভের নিকট তাঁহার রূপের বিষয় অবগত হইয়াছ সেই রূপ হৃদয়ে ধ্যান কর। তিনি বড়ই চঞ্চল। বিশেষরূপ সাধনা না করিলে সেই চঞ্চল মূর্ত্তিকে স্থির রাখিতে পারিবে না। যখন ঐ মূর্ত্তিকে স্থির রাখিতে পারিবে তখন হইতে প্রিয়তম বলিয়া তাঁহার সহিত মিশামিশি করিবে। তিনি যাহাদের প্রিয়তম সেই প্রিয় সখী গোপিকাগণের শরণ লও তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিতে করিতে মিশামিশি সঙ্ঘটিত হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কিরূপে গোপিকাগণের শরণ লইব বা তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ কিরূপে অনুসরণ করিব? গোপিকাগণকেও এক্ষণে দেখা পাওয়া যায় না। তাঁহাদিগকে পাই বা কোথায়? আর গোপিকাগণের শরণ লইবারই বা কি আবশ্যক? গোপিকাগণের সহিত ভগবানের যৌন সম্বন্ধ ছিল না। গোপিকাগণ পরনারী। তাঁহাদের নির্ম্মল স্বপ্রকাশ প্রেমের অনুকরণ করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা ভগবান্‌কে ভালবাসিতেন। লোক-নিন্দা, লোক-গঞ্জনা তাঁহারা অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদের ভালবাসার মধ্যে কোন বাধ্য বাধকতা ছিল না। ভগবানের নিকট কোন প্রকার সুখ বা মঙ্গলের কামনা তাঁহাদের ছিল না। অথচ সেই ভগবান্‌কে ভালবাসিবার জন্য আপন আপন পতি পুত্র পরিহার করিয়া নিভৃত নির্জ্জন স্থানের দিকে ধাবমানা। সেই নিভৃত নির্জ্জন স্থানে ভগবান্ মধুর মুরলী বাদন করিতেছেন। তিনি মহাজ্ঞানী

মহাবিরাগী মহারসজ্ঞ। গোপিকাগণ তাঁহার সহিত নানাবিধ হাস্য পরিহাস করিতেছেন, তাঁহার গুণগান করিতেছেন এ সকল হাস্য পরিহাসাদির মধ্যে কোনরূপ কাম গন্ধ ছিল না। গোপিকাগণের ভালবাসা, তাঁহাদের মর্ম্মের ভালবাসা মহারসজ্ঞ বিলক্ষণ বুঝিতেন ; সেই ভালবাসার প্রতিদান তিনি করিতে পারিতেন না। সেই নিভৃত স্থলে তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া নৃত্য-গীতাদি দ্বারা মহানন্দ উপভোগ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের সুখে তাঁহারা সুখিনী। এই মহারাস-কেলি দেখিয়া কামদেব, ব্রহ্মাদি প্রমুখ দেবগণ বিমোহিত। এইরূপ রাসকেলি ভগবানের সহিতই সম্ভব। অন্য জীবে চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে। এই সকল গোপিকাগণের ন্যায় তোমরাও সর্ব্ববিধ কামনা ত্যাগ করিয়া হৃদয়স্থ সেই আনন্দময় মূর্ত্তিকে এবং যাবতীয় পদার্থ ও জীব-মধ্যগত সেই আনন্দময়কে সেবা কর, ভালবাস। এইরূপ ভজন সাধন করিতে করিতে তাঁহার সহিত মিশামিশি ঘটিবে। গোপিকাগণের প্রেম যদিও অনুকরণীয় নহে তথাপি পূর্ব্ব কথিত সাধন প্রণালী অবলম্বন করিলে পরম কারুণিক ভগবানের আশীর্ব্বাদে কোন না কোন সময়ে স্বপ্রকাশ প্রেমের আস্বাদন পাইয়া কৃতার্থ হইবে মহা-নন্দের প্রস্রবণ আসিয়া প্রাণ মন বিভোর করিবে।

প্রীতিসুন্দরীর বাক্যে নাগরিকগণের মধ্যে কতকগুলির চিত্তে ভালবাসার উন্মেষ দেখা দিল, তখন নাগরিকগণ ভাবসুন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভাবসুন্দর নানাভাবে ভগবানকে আপন হৃদয়-ক্ষেত্রে দেখিতেছেন। তিনি কখন হাসিতেছেন কখন নাচিতেছেন কখন গান করিতেছেন কখন রোদন করিতেছেন কখন বা বিকট চীৎকার করিতেছেন। বাহ্যিক ভাব দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব অনুমান করা যায় না। ভাবসুন্দরের অবস্থা উচ্চ সাধকের অবস্থা। ভাবসুন্দরের বাহ্যিক কার্য্য দর্শন করিলে তাঁহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত হয় কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিলে শ্রদ্ধা ভক্তি আসিয়া দর্শকের প্রাণ মন বিদ্ধ করিতে থাকে। ভগবৎ সাধনে জীব কিরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ, নাগরিকগণ ভাবসুন্দরকে দর্শন করিয়া বিলক্ষণরূপে তাহা বুঝিতে পারিল।

নাগরিকগণ শ্রদ্ধায়ত্ত ও তাঁহার স্বজনবর্গের সন্নিধান ছাড়িতে একান্ত অনিচ্ছুক। তাহারা কি ছিল এক্ষণে কি হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে।

অমূল্যধনের লাভ যাঁহাদের হইতে হইয়াছে তাঁহাদের সঙ্গ জীব কিরূপে ত্যাগ করিবে? শ্রদ্ধারত্ন তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন বৎসগণ! তোমরা যাহা শুনিলে তদপেক্ষা আরো ভাল বিষয় জানিতে পারিবে ও দেখিতে পাইবে। দেবনগরবাসী জনগণ তোমাদের মঙ্গলের জন্য সতত যত্নশীল। তোমাদিগকে ভগবদ্বিমুখ জানিতে পারিয়া তোমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্ব প্রথমে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। তোমাদের মনের উন্নতি অনুসারে উত্তরোত্তর তাঁহাদের মধ্য হইতে মহা মহা ভাগবতের এখানে আগমন হইবে। দেবনগরবাসী জনগণের ব্যবসায় বাণিজ্যে তাঁহারা জীবগণকে অবাধে হৃদয়ের ধন বিলাইবেন। জীবের নিকট তাঁহারা কোন মূল্য গ্রহণ করেন না। জীব তাঁহাদের প্রদত্ত ধনে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন ইহাই জানিতে পারিলে তাঁহাদের প্রচুর লাভ। বৎসগণ! এক্ষণে আমাদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া ভগবৎসাধনে অগ্রসর হও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল পরম করুণাময় ভগবানের কৃপায় অচিরাৎ হইবে। এক্ষণে তোমাদিগের যেরূপ মনের অবস্থা ভগবৎ সাধনে একান্ত যত্নশীল না হইলে সেই অবস্থা লয় প্রাপ্ত হইবে পুনরায় যে দুঃখ ক্লেশে ছিলে সেই দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, এখানে আমাদের কার্য্য একরূপ শেষ হইয়াছে; অদ্য রজনীতে আমরা দেবনগর যাত্রা করিব এবং কিছুকাল মধ্যে আমি দেবনগরবাসী কতিপয় ভাগবত লইয়া এখানে পুনরায় আসিব।

নাগরিকগণ শ্রদ্ধারত্নের মুখে এই আকস্মিক বিচ্ছেদ বার্ত্তা অবগত হইয়া নিতান্ত ম্রিয়মান হইল। কি প্রকারে আমাদের শান্তিদাতা মহাভাগবতগণের বিরহ সহ্য করিব? কে বা আমাদিগকে মধুর মধুর উপদেশ রাজি বিতরণ করিয়া চিত্তের সকল ক্ষোভ দূর করিবেন? কাহার নিকট বা জ্বালা জুড়াইব? এইরূপে বিবিধ ক্ষোভ ও দুঃখের চিন্তায় তাঁহাদিগের হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। গুরুদেব তাহাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টাশীল তাহারা বুঝিতে পারিয়াও হৃদয়ের আবেগ কিছুতেই উপশমিত করিতে পারিল না। বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। শ্রদ্ধারত্ন ও তাঁহার পরিজনগণ নাগরিকগণের রোদনে একান্ত ব্যথিত হইলেন। নাগরিকগণকে বিবিধ প্রকারে তাঁহারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। নাগরিকগণ গুরুদেবের ভবিষ্যৎ বিরহ মনোমধ্যে

চিন্তা করিয়া মুহ্যমান হইতে লাগিল, বহু কষ্টে ও বহু আশ্বাস-বাক্যে শ্রদ্ধারত্ন তাহাদিগকে একরূপ সুস্থির করিলেন। নাগরিকগণ অতঃপর অশ্রুপূর্ণ লোচনে শ্রদ্ধারত্ন ও তাঁহার পরিজনগণের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। শ্রদ্ধারত্ন ও পরিজনগণ সমভিব্যাহারে রজনীযোগে দেবনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।)

ক্ষমা কর, ক্ষমা পাবে।

—:০:—

শুন মোর ভাই মন!
তোমার নিকটে, শত অপরাধে,
অপরাধী যেই জন—
(তুমি) ক্ষমিয়া তাহারে, কোলে তুলে' লাও,
স্নেহ-সন্তোষ-ভরে।
মনে ভেবে দেখ, তা'র কিবা দোষ?
(তিনি) যা' করান তাই করে॥
অবশ্য তোমার, দোষ কিছু ছিল,
এখন অথবা আগে।
তা'র প্রতিফল, ফলদাতা হরি,
ভুঞ্জা'লেন দিয়া তা'কে॥
ইহাই ভাবিয়ে, নিজে শান্ত হ'য়ে
দোষী জনে কর ক্ষমা।
আঘাত পাইলে, পালটিয়া যেন,
প্রতিঘাত করিও না॥
(আর) হৃদয়ে তোমার, আছেন যে জন,
অকলঙ্ক পূর্ণ চাঁদ।

প্রতিপদে তুমি, তাঁহার চরণে,
করিতেছ অপরাধ॥
"করিব" বলিয়া, সে কাজ কর না,
দাস হ'য়ে তোল মাথা।
স্নেহ কার্য্যে তাঁ'র, বিপরীত ভাবি,
তাঁর উপরে কহ কথা॥
(তিনি) বারণ করিলে বারণ মান না,
অমতে কার্য্য কর।
তাঁর ঘরে বসি, তাঁহারি খাইয়া,
বিরোধ করিছ দঢ়॥
এ সব দোষের, শাস্তি দিতে গেলে,
বল তবে করযোড়ে।
দয়াময় হরি! অবোধের দোষ,
ক্ষমা কর কৃপা ক'রে॥
যবে সেই প্রভু, পুছিবেন হাসি,
"তুমি ক্ষমিয়াছ কা'রে?
বল দেখি কা'র দোষের নিষ্কৃতি,
দিয়াছ এ সংসারে?"
তবে সে সময়, কি বলিবে ভাই!
কোন মুখে ক্ষমা চা'বে।
তাই কৃষ্ণদাসী, কহে হিত কথা,
"ক্ষমা কর, ক্ষমা পাবে॥"

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র।

——:•:——

জয় জয় গৌরচন্দ্র, জয় বিশ্বম্ভর।
আনন্দ বিগ্রহ জয়, প্রভু সর্ব্বেশ্বর॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ সর্ব্ব মাধুর্য্যের সার।
জয় জয় ভুবন-পাবন অবতার॥
কলি-কলুষ কুঞ্জর বিনাশ কারণ।
অবতীর্ণ গৌর-সিংহ নদীয়া ভুবন।
নবীন কোমল কায় অতি নিরমল।
গলিত কাঞ্চন কান্তি করে ঝলমল॥
বদন চাঁদের ছাঁদে দশদিক আলো।
কুঞ্চিত কুন্তলদাম গাঢ়-ঘন-কালো॥
ললাটে শোভিত কিবা চন্দনের বিন্দু।
স্বর্ণ ফলকেতে যথা পূর্ণিমার ইন্দু॥
আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি অনঙ্গ মোহন।
করুণা কটাক্ষ পূর্ণ চারু দরশন॥
খগ-চঞ্চু জিনি কিবা নাসিকা সুন্দর।
হিঙ্গুল মণ্ডিত কর পদতল ওষ্ঠাধর॥
আজানু লম্বিত ভুজ রাম রম্ভা উরু।
পরিসর বক্ষ কটি অতিশয় সরু॥
চম্পক কলিকা হেন শ্রীকর পল্লব।
ঝক্‌মক্‌ করে তাহে নখ-মণি সব॥
মনোমদ কম্বু কণ্ঠ মধুর বচন।
রসময় তনু শ্রীকীর্ত্তন পরায়ণ॥
সুরধুনী তীরে গোরা নাচিয়া বেড়ায়।
দরশে পরশে কত পাষাণ মিলায়॥

সর্ব্বজীবে সম দয়া নাই আত্ম পর।
প্রেমের পুতুল মোর নদীয়া নাগর॥
রাধিকার ভাব-কান্তি বিলাস-বিভোর।
মানব দানব আদি সর্ব্ব-চিত্তচোর॥
প্রেম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নর্ত্তক সুধীর।
পাপ তম বিনাশক শ্রীগৌরমিহির॥
কলি কবলিত জীবে করিতে উদ্ধার।
পঞ্চতত্ত্ব সহিতে নদীয়া অবতার॥
দুর্ব্বলের বল হরি অন্তের সম্বল।
বিজয় বলিছে মন গৌর হরি বল॥

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

সাধু-সঙ্গে একদিন।

সে আজ ছয় বৎসর পূর্ব্বের কথা। নদীয়া জেলায় শান্তিপুরের নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় এক অভাবনীয় বিপদে পতিত। সাত দিনের মধ্যে পিতা, মাতা, ও একমাত্র পুত্র সন্তোষ কুমার কালের করালকবলে পতিত হইয়াছে। যদিও শোকের মাত্রাটা অত্যধিক হইয়াছিল বটে তথাপি বাল্যকাল হইতে পিতার নিকট সৎ শিক্ষা পাইয়া—ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থের নানাপ্রকার উপদেশ শুনিয়া নলিনীকান্ত আপন হৃদয়কে এমন ভাবে গঠিত করিয়া ছিলেন যে, এই নিদারুণ শোকেও তাঁহাকে বিহ্বল করিতে পারে নাই। যদিও সংসারের অন্যান্য সকলে দিবারাত্র শোকে মুহ্যমান থাকিত তথাপি আমাদের নলিনীকান্তের হিমাচল সদৃশ অচল—অটল চিত্ত কিছুতেই চঞ্চল হইত না। তিনি সর্ব্বদাই আনন্দে থাকিতেন।

দিন যায়—থাকে না, কত সুখ দুঃখের ভীষণ ভীষণ ঝাঞ্ঝাবাৎকে পদ দলিত করিয়া সে চলিয়াছে, কাহারও কোন কথায় সে কর্ণপাত করেনা, কেননা সেত্তো কাহারও হাতধরা নয়, কেউ তাহাকে দেখুক বা না দেখুক, সংব্যবহার করুক আর নাই করুক, সে যে অবিরাম গতিতে চলিয়াছে সে চলার আর বিরাম নাই। এই ভাবে ক্রমে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, সময়ের গতিতে সকলই হইয়া থাকে, নলিনীকান্তের পরিজনবর্গও ক্রমে এক প্রকার শোক ভুলিয়া গিয়া পুনর্ব্বার আপনাপন কাজ কর্ম্মে মন দিয়াছেন।

*　　*　　*　　*

অগ্রহায়ণ মাস পূর্ণিমা তিথি, শশধর সমস্ত রাত্র অকাতরে নিজ রজত-শুভ্র জ্যোৎস্নারাশী জগৎময় ছড়াইয়া সমস্ত দিবসের প্রখর রবি-তাপে সন্তপ্ত জগৎকে সুশীতল করিয়া এখন যেন একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাই বিশ্রাম লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া আস্তে আস্তে বিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এদিকে উষার অরুণ রাগে পূর্ব্ব গগন ধীরে ধীরে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। বিহঙ্গমগণ তরু শাখায় বসিয়া মুক্তকণ্ঠে সুমধুর প্রভাতী গাহিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের নিকট আপনাপন প্রাণের সরলতা মাখান কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে, শিশির সম্পৃক্ত মলয়ানিল মৃদুমন্দ হিল্লোলে ঘুমন্ত বিশ্বকে ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে, এমন শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ভাবুক ভক্তগণ কেহ বা প্রাণের আবেগ পূর্ণ ভাব-ভক্তি মাখান সুমধুর স্বরে প্রভাতী প্রার্থনা সঙ্গীত দ্বারা শ্রীভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছে। কেহ বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানযোগে আপন হৃদয় পটে ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া নয়ন ধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া জীবন জনম সফল করিতেছে।

জগতে এমন পাষান কে আছে, যাহার হৃদয় প্রকৃতি দেবীর এই মনোমোহন শান্তিপ্রদ দৃশ্য দর্শনে বিগলিত না হয়? কে এমন সময় আবেগ ভরা প্রাণে সেই জগৎ পিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণোদ্দেশে মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারে? যে যত বড়ই পাষণ্ড হউক না, যত বড়ই নাস্তিক হউক না হৃদয় যতই পাষান হউক না কেন এমন কোমল উষায়, প্রকৃতিদেবীর এই নব অরুণ রাগরঞ্জিত মনোহর বেশভূষা দর্শনে প্রাণ একটু না একটু গলিবেই, ভ্রান্ত মতের কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হইবেই।

এই ভাবে সকলেই যখন আপনাপন গুরুদেবের উপদেশানুসারে নিজ নিজ ইষ্টদেবের স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেছে, আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত নলিনী-কান্তও সেই সময় গুন্‌গুন্ করিয়া তাঁহার স্বভাব-মধুর-কণ্ঠে গাহিতে ছিলেন—

জয় গোবিন্দ গৌরচন্দ্র গোপাল গোবর্দ্ধন।
হরে নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত মাধব মধুসূদন॥
তুমি পরমেশ্বর পীতাম্বর পদ্মপলাশলোচন,
তুমি বলিবে ছলিলে তিনপদ ;দিলে করিলে দান গ্রহণ।
কৃপাময় হরি করুণা সাগর কৃষ্ণ কংশ-নাশন
তুমি যদুকুল ধন যশোদা জীবন জগতজীব-তারণ॥
তুমি শমন দমন শ্রীশচীনন্দন ভরসা তোমার ঐ চরণ
তুমি দর্পহারী কানাইয়ালাল কাল কালিয়-দমন॥
অনাথ শরণ করুণানিদান ভকত হৃদি-রঞ্জন
আমায় অন্তিমকালেতে জাহ্নবী জলেতে হয় যেন তোমায় স্মরণ॥

কীর্ত্তন শেষ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামান্তে যেমন শয়নাগার হইতে বাহির হইয়াছেন অমনি তাঁহার পরিচারক রামধন সংবাদ দিল যে, বাহিরে নলিনী-কান্তের বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বসু আসিয়াছেন। হটাৎ এত প্রত্যূষে সুরেশ বাবুর আগমনে প্রথমে তিনি যদিও একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যখন পরিচারক রামধন এক খণ্ড কাগজ দিয়া বলিল 'সুরেশ বাবু আপ্‌কো এহি চিঠি দিয়া, আউর বোলা জল্‌দি বাবুকো নিচু আনে বোলো।" উষার অর্দ্ধ প্রকাশিত আলোকে নলিনীকান্ত যখন কাগজ খানি দেখিলেন তখন আর তত চিন্তার কারণ রহিল না ; তবে এটা ঠিক বুঝিলেন যে, একটা কিছু নূতন রকমের ঘটনা ঘটিয়াছে। কারণ সুরেশ বাবুর প্রেরিত কাগজে এই লেখা ছিল ;—

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণম্।

শ্রীচরণ কমলেষু।—

প্রণাম নিবেদন মিদং——ভাই নলিনী! একেবারে বেড়াইবার পোষাকে বাহিরে আইস, আজ এক শুভ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সেখানে যাইতে হইবে। ইতি। তোমার—(সুরেশ দাদা।)

পত্রখানি পাঠ করিয়া নলিনীকান্ত চিন্তার কারণ নাই বুঝিয়া চোকে মুখে জল দিয়া একেবারে বেড়াইবার পোষাকে বাহির হইয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সুরেশ বাবুর সেই প্রসান্ত প্রফুল্ল সৌম্য মুর্ত্তিতো আছেই অধিকন্তু তাঁহার সঙ্গে ২২২৩ বৎসরের একটী যুবক সন্ন্যাসী। নলিনীকান্ত-সেই প্রশান্ত তেজ-পুঞ্জময় মূর্ত্তি খানি দর্শনে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে তাঁহার বদন পানে চাহিয়া রহিলেন। কিছুকাল এইভাবে থাকিয়া যেমন সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়াছেন অমনি সুরেশ বাবু বলিলেন "ভাই নলিনী! আজ একটু গঙ্গার ধারে বেড়াইতে চল।" নলিনীকান্ত যদিও সন্ন্যাসীর পরিচয় জানিবার ব্যগ্র হইয়াছিলেন কিন্তু সুরেশ বাবুর তাড়াতাড়িতে আর তাহা ঘটিয়া উঠিলনা। তিনজনে ধীরে ধীরে গঙ্গার ঘাট অভিমুখে চলিলেন, পথে দু' একটী কথা ভিন্ন বেশী কথা হইল না।

তিন জনে গঙ্গাভিমুখে চলিয়াছেন, পথ প্রদর্শকরূপে পূর্ব্বোক্ত যুবক সন্ন্যাসী অগ্রে আর নলিনীকান্ত ও সুরেশ বাবু পশ্চাতে আছেন। ক্রমে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া গঙ্গারধার দিয়া কিঞ্চিত উত্তর মুখে অগ্রসর হইয়া একটী প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ মূলে কয়েকজন ভক্ত-পরিবেষ্টিত সূর্য্য-মণ্ডল সদৃশ মহাতেজ পূর্ণ একজন মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। ইহারা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তখন কীর্ত্তন হইতেছে কীর্ত্তন আর কিছুই নয় কেবল;—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরেকৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা গোবিন্দ॥" এই পদেরই সুর করিয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি। অন্য বাদ্য যন্ত্র না থাকিলেও সমবেত ভক্তবৃন্দের সম্মিলীত ভাবপূর্ণ কণ্ঠে ও ভক্তবৃন্দের আপনাপন করতল তালে এক অপূর্ব্ব মহান্ শক্তি-ব্যঞ্জক স্বর প্রকাশ হইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত যুবক সন্ন্যাসী প্রমুখ তিন জনে ক্রমে সেই বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা, কুল কুল প্রবাহিণী, শান্তি প্রদায়িনী গঙ্গাদেবীর তীরবর্ত্তী কীর্ত্তন স্থলে উপস্থিত হইলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে যদিও কীর্ত্তন বন্ধ হইল, কিন্তু ভক্তবৃন্দের নয়ন ধারার বিরাম না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর পূর্ব্বকথিত মহাপুরুষ যুবক সন্ন্যাসীটীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন;—"বৎস! বেশ আনন্দে আছ তো? শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রচারিত নাম-ধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান হও, জীবন জনম ধন্য হইবে।" মহাপুরুষের

বাক্য শ্রবণে যুবক সন্ন্যাসী মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "দেব! আপনার কৃপায় যেরূপ আনন্দ লাভ করিতেছি বোধ হয় অনন্তকাল ধরিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে ইহার কণামাত্রও লাভ করিতে পারিতাম না। কৃপা করুন—শক্তি সঞ্চার করুন যেন প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের সুমধুর নাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।" এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সমবেত ভক্তমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে "জয় জয় মহাপ্রভু" ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

আমাদের পূর্ব্ব কথিত নলিনীকান্ত ও সুরেশ চন্দ্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অদূরে বসিয়া মহাপুরুষের সেই মহাতেজ পরিপূর্ণ শান্তি মাখান মূর্ত্তি দর্শন করিতে ছিলেন ও তাঁহার সুধামাখা বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময় একটী আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা প্রকাশ পাইল।

অদূরে গঙ্গাবক্ষে একখানি নৌকা পাল ভরে বেগে যাইতে ছিল, দুর্ব্বিপাক বশতঃ সেখানি গঙ্গা মধ্যস্থ একটী লৌহ নির্ম্মিত বয়ার আঘাতে জলমগ্ন হইল। মাঝিগণ সাঁতার দিয়া তীরের দিকে আসিতে লাগিল কিন্তু নৌকা-মধ্যস্থ একটী বালক সন্তরণ বিদ্যায় অপটু বলিয়া মধ্য গঙ্গায় হাবুডুবু খাইতে লাগিল এই ব্যাপার দর্শনে মহাপুরুষ ব্যস্তভাবে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া উচ্চৈস্বরে "জয় শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর" এই কয়েকটী কথা বলিয়া একেবারে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন, ভক্তগণ ব্যস্তভাবে "কি হইল কি হইল" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিলেন। এই সময় যদিও উপস্থিত জনগণের মধ্যে নানারূপ গোলমাল হইতেছিল কিন্তু উক্ত মহাপুরুষ সেই যে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গঙ্গায় ডুব দিলেন আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ঘাটের অনতি দূরে সেই জলমগ্ন বালককে কোলে করিয়া মহাপুরুষকে আসিতে দেখিয়া তীরস্থিত ভক্তবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে গঙ্গাতীর লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল ক্রমে মহাপুরুষ সহাস্য বদনে বালকটীকে লইয়া ধীরে ধীরে তীরে উঠিয়া আসিলেন, বালক তখনও অচৈতন্য। উপরে উঠিয়া ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "সকলে উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন কর, কোন ভয় নাই, অবিলম্বেই বালক চৈতন্য লাভ করিবে।" মহাত্মার আদেশে ভক্তবৃন্দ গাহিতে লাগিলেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, ক্রমে লোকসঙ্ঘ বৃদ্ধি পাইয়া একটী প্রকাণ্ড সম্মিলন ক্ষেত্র হইল। এইভাবে কীর্ত্তন চলিতেছে মহাপুরুষ সেই বালককে ঘিরিয়া ঘিরিয়া মধ্যে মধ্যে "নিতাই গৌর সীতানাথ" এই ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছেন। এইভাবে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা উত্তীর্ণ, এমন সময় সকলেই দেখিলেন যে, বালকটী ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মেলন করিতেছে ভক্তগণ আরও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ধরিলেন, ক্রমে বালকটী উঠিয়া বসিল।

মহাপুরুষের আদেশে কীর্ত্তন বন্ধ হইল, তখন সকলেই বালকের পরিচয় পাইতে উৎসুক দেখিয়া মহাপুরুষ বালকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! তুমি কোথা হইতে কোথায় যাইতে ছিলে তোমার নিবাস কোথায় ব্যক্ত কর। ভক্ত-বৃন্দ তোমার পরিচয় জানিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।" সমস্ত নিস্তব্ধ, এই যে কিছু পূর্ব্বে এখানে জনসঙ্ঘের গোলমালে কাণে তালা লাগিতেছিল সকলই একেবারে চুপ্। মহাপুরুষের বাক্যের কোন উত্তর বালকটী দিতে পারিল না কেবল নয়ন ধারায় বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিল—"জানি তুমি মঙ্গলময় প্রতিপলকে পাই পরিচয়।" তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আর কেহই কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। সকলেই নির্নিমেষ নেত্রে উক্ত বালকটীকে ও মহাপুরুষকে দেখিতে লাগিল।

এই ভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হইলে মহাপুরুষ বলিলেন, "ভক্তগণ! বেলা অনেক হইয়াছে এক্ষণে সকলে বিশ্রাম কর আবার সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"—মহাপুরুষের আদেশানুসারে উপস্থিত জনমণ্ডলী একে একে বিদায় হইলেন দেখিতে দেখিতে সেই বৃহৎ জনসঙ্ঘ গণনায় আসিল, ক্রমে আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত নলিনীকান্ত এবং সুরেশ চন্দ্রও মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া, পুনরায় আসিবার অনুজ্ঞা লইয়া বিদায় হইলেন কেবল মহাপুরুষের নিকট রহিল আমাদের পূর্ব্ব কথিত যুবক সন্ন্যাসীটী ও যাহাকে কিছু পূর্ব্বে উত্তাল তরঙ্গ পরিপূর্ণ গঙ্গাবক্ষ হইতে মহাপুরুষ উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই ১২।১৩ বৎসরের বালকটী। বাহিরের লোক আর কেহই নাই।

অন্যান্য জনগণ যেমনই হউন না কেন আমাদের নলিনীকান্ত ও সুরেশ চন্দ্র কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া স্নান আহার সমাপনান্তে বিশ্রাম না করিয়াই বেলা চার ঘটিকার সময় আবার সেই গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ মূলে মহাপুরুষের কাছে উপস্থিত হইলেন। নলিনীকান্তের মনে যদিও নানাপ্রকারের প্রশ্ন উঠিতে ছিল কিন্তু মহাপুরুষ উঁহাদিগের কাহারও প্রতিক্ষা না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুগণ! প্রেমিকের ভাব, প্রেমিকের চালচলন কেমন সাধারণ লোক অপেক্ষা ভিন্ন প্রকারের। যিনি ভাবুক, যিনি প্রেমিক। যিনি একবার সেই বিশ্ব-প্রেমাধার শ্রীগোবিন্দের প্রেমে মজিয়াছেন তাঁহারই জীবন ধন্য। স্থাবর, জঙ্গম, গুল্মলতা যাহা কিছু দর্শন করেন তাহাতেই তাঁহার সেই বিশ্ব-প্রেমিকের ভাব স্ফূর্ত্তি পায়। ভাবুক প্রতি পত্রে পুষ্পে সেই আনন্দঘন শ্রীগোবিন্দের প্রেমের উৎস অবলোকন করেন। আকাশ পানে চাহিয়া নবীন মেঘ দর্শনে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ হয়, নব কুসুম কান্তি দেখিলে তাহার সেই শ্রীগোবিন্দের রাতুল চরণ মনে পড়ে, পাখির গানে শ্যাম বাঁশরীর ঝঙ্কার শুনিতে পায়, শিশুর হাসিতে নিভৃত নিকুঞ্জের বিমল ছবি দেখিতে পায়। তখন প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহার মনে হয় যে, জগতের যাবতীয় জীবই কি যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত ময় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া এই সংসার পথে চলিতেছে। তখন সাধকের যে অবস্থা হয় তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বেশ স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রই হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

মহাপুরুষ এই বলিয়া চুপ্ করিলেন। আমাদের পূর্ব্ব কথিত নলিনীকান্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কথা শুনিয়া এই অবসরে সেই সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলিতে লাগিলেন, নলিনীকান্ত বলিলেন,—'প্রভো! এই যে আপনি শ্রীচরিতামৃতের কথা বলিলেন উহা কি, এবং উহাতে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে দয়া করিয়া তাহা আমাদিগকে বলুন।

মহা।—বৎস। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ অমৃতের সিন্ধু, আমাদের বঙ্গদেশে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যে প্রেমের ঠাকুর অবতীর্ণ হইয়া আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ আদি করিয়া সকলকে প্রেমের সাগরে স্নান করাইয়া ছিলেন সেই রসময় শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের লীলা কাহিনী এবং নানা ভাবে নানাপ্রকার শিক্ষা এই গ্রন্থে ব্যক্ত

হইয়াছে। এই চরিতামৃত গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের নিকট বেদবৎমান্য। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা চরিত বর্ণন-চ্ছলে নানাপ্রকার জটীল সিদ্ধান্তাদি অতি সরল ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। প্রধানতঃ এই চরিতামৃত দুই ভাগে বিভক্ত,—ইহার একটী লীলাংশ ও অপরটী সিদ্ধান্তাংশ। এই সিদ্ধান্তাংশটী আবার তিন ভাগে বিভক্ত যথা,—অপ্রপঞ্চতত্ত্ব, প্রপঞ্চতত্ত্ব এবং উপাসনাতত্ত্ব। বৎস! এ সকল বিষয় একটু জটিলতা পরিপূর্ণ দয়াময়ের ইচ্ছা হইলে যখন প্রসঙ্গ উঠিয়াছে তখন ক্রমে আলোচিত হইবে। নতুবা আমাদের ইচ্ছায় কি হইবে? তিনি যদি আমাদের দ্বারা কোন তত্ত্ব মীমাংসিত করিয়া দেন তবে তাহাতে আমাদের কিছু বাহাদুরী নাই কেন না;—"কাঠের পুতুলি যৈছে কুহকে নাচায়" শ্রীভগবানের হাতে জীবও তদ্রূপ তিনি কৃপা না করিলে আমাদের এমন কি ক্ষমতা যে তাহা ব্যক্ত হয়।

নলিনী।—প্রভো। আমি যাহা খুঁজিতেছিলাম পিতৃদেবের নিকট হইতে যে বিষয়ের একটু আভাষ বাল্যকাল হইতে পাইয়া ছিলাম আপনি সেই বিষয়ই বলিলেন, যখন দয়া করিয়া প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন তখন বলুন, উপাসনা তত্ত্ব কি?

মহা।—বৎস। কেবল মাত্র উপসনার বিষয় আলোচনা করিলে ২।৪ দিনে শেষ হয় না তবে এক কথায় বলিতে হইল যাহাতে জীবের সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয় নির্ণয় হয় তাহাকেই উপাসনা তত্ত্ব বলে।

নলিনী।—প্রভো। ভাল বুঝিলাম না যখন কৃপা করিয়া বলিলেন তখন একটু বিস্তারিত ভাবে বলুন।

ক্রমশঃ।

গুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

—:০:—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবোমহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ

গুরুকরণ প্রথাটী সকলদেশে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অত্যাবশ্যকীয় ও অবশ্য করণীয় বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকার ভেদ মাত্র লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে গুরুকরণ ভিন্ন কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। জন্ম গ্রহণ দিন হইতে মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত

আমরা যে সমস্ত কার্য্য করি সমস্ত কার্য্যেরই একজন না একজন প্রদর্শক বা শিক্ষাদাতা গুরু আছেন, কোন কার্য্য বা কাহারও দেখিয়া শিক্ষা করিয়া থাকি, আবার কোন কার্য্য বা কেহ শিক্ষক রূপে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন সুতরাং জাগতীক সামান্য সামান্য কার্য্যের জন্যই যখন গুরুকরণের বিশেষ আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়, তখন পরমার্থ জগতে উন্নত হইবার জন্য যে গুরুর প্রয়োজন তাহা বোধ হয় অনায়াসেই সকলে বুঝিতে পারেন। কেবল হিন্দু বলিয়া নয় সকল জাতির মধ্যেই এই গুরুকরণ প্রণালী পরিদৃষ্ট হয়, তবে হিন্দুর মধ্যে অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা এইটার একটু বিশেষ আধিক্য ও প্রাধান্য দেখা যায়। গুরু-কৃপা ব্যতিত কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া তাহা বড়ই কঠিন, আর শাস্ত্রও গুরুকরণ ব্যাপার একটী বিশেষ আবশ্যক ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এমন কি স্বয়ং শ্রীভগবানও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া লোক শিক্ষার্থ গুরুকরণ করিয়া বিশেষ ভাবে উহার প্রয়োজনিয়তা দেখাইয়াছেন। এই পরম কল্যাণপ্রদ গুরুকরণ প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-জগতে ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুর এত শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়।

অহং এই অভিমানটাই আধ্যাত্মিক উন্নতীর বিশেষ অন্তরায়, যে দিন—যে মুহূর্ত্ত হইতে যাঁহার যত পরিমাণে ঐ অহঙ্কারের বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন—সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার সেই পরিমাণে ধর্ম্ম জগতে প্রবেশের পথ পরিষ্কার হইতেছে বুঝিতে হইবে। হিন্দু শাস্ত্রে শাস্ত্রকারগণ মন্ত্রার্থ ও মন্ত্র চৈতন্য এই দুইটী কথার অতি গভীর গবেষণাপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষেও সাক্ষাৎ কৃতকর্ম্মা যোগী ভিন্ন মন্ত্রের চৈতন্য এবং তদ্বিষয়ক অতি গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশে অন্য কাহারও শক্তি নাই। আজ যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহার সহিত যদি মন্ত্রার্থ বা মন্ত্র শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যায় তবে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে এই আশঙ্কায় সে বিষয় বিরত হইলাম মন্ত্রাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা থাকিল।

গুরু-ভক্তিবলে মনুষ্য অসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়। শ্রীগুরুদেবের অপার করুণাবলে এবং তৎ প্রদত্ত জ্ঞানালোকের সাহায্যে যিনি নিজ নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিজকে "তৃণাদপি সুনীচ" জ্ঞানে স্বীয় মন প্রাণ আপন ইষ্ট

দেবের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তিনিই প্রকৃত গুরু ভক্ত, নতুবা কেবল মুখে আমার কিছুই নাই সমস্তই গুরুদেবের এই ভাব দেখাইয়া "তৃণাদপি সুনীচ" ভাবের অভিনয় করিয়া কপটতার প্রশ্রয় দিলে, কোটী কোটী জন্মেও প্রাণে একবিন্দু প্রকৃত গুরু-ভক্তি আসিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না; আজকাল অনেকেই কিন্তু আমার মত ঐরূপ মুখে গুরুভক্তির ভাব দেখাইয়া উন্নতীর পরিবর্ত্তে অপরাধী হইয়া অধঃপতনের পথ পরিস্কার করিতেছেন, তবে এ দোষটা কেবল শিষ্যদেরও দেওয়া যায়না, কারণ গুরু প্রভুদের ভিতরেও অনেক কপটাভারূপ আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং ঐরূপ গুরুর নিকট হইতে ঐ কপটতা ভিন্ন অন্য কিছু প্রত্যাশা করা যায় না, নিম্ব বৃক্ষের তলায় গিয়া সুমিষ্ট আম্রফল প্রত্যাশা করিলে তাহা কি কখনও পাওয়া যায়? যিনি নিজে সৎ হইতে না পারিয়াছেন, যিনি নিজে অকপট হইতে না পারিয়াছেন, যিনি নিজে সেই শান্তিময়ধামে যাইবার রাস্তা অবগত না হইয়াছেন তিনি অপরকে কি করিয়া সৎ করিবেন, তিনি অপরকে কি করিয়া অকপট করিবেন, আর কি করিয়াই বা তিনি অপর একজন পথ-ভ্রষ্ট ভ্রান্ত পথিককে সেই শান্তিময়ধামের রাস্তা প্রদর্শন করাইবেন?

শিষ্য অকপট প্রাণে গুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া যতই সাধনে উন্নত হইতে থাকেন ততই তাঁহার বহির্মুখীন বৃত্তি সকল অন্তর্মুখীন হইয়া আসিতে থাকে, ততই তাঁহার আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সংসার ক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রথমে আমরা আপনাপন পিতা মাতা গুরুজনদিগকে এবং আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণকে ভক্তি করিতে শিখি, এই শিক্ষাই গুরু ভক্তিরূপ প্রাসাদে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। মানবের অন্তর্নিহিত যে আনন্দ সত্তারূপ ভক্তিতত্ত্ব তাহাই পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের পাদপদ্মে আমাদিগকে স্বর্গ সুখ অনুভব করাইয়া দেয়। এই ভক্তিরূপ ক্ষুদ্র স্রোতটীই ক্রমে ক্রমে প্রবলতর ভাব ধারণ করিয়া গুরুদেবের চিদানন্দ সত্তার সহিত সেই অনাদি অপার ব্রহ্ম-তত্ত্বের মিলন করাইয়া সাধককে অপার আনন্দের সহিত কৃতার্থ করে, শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ও উদাহরণ দৃষ্ট হয় বাহুল্য ভয়ে কেবল স্মরণার্থ একটী উল্লেখ করা হইতেছে।

মহাভারতে পৌষ্য পর্ব্বে দেখা যায় যে, আয়োধধৌম্যের উপমন্যু নামে এক শিষ্যছিলেন, আয়োধধৌম্য উপমন্যুকে গোরক্ষার আদেশ দিয়া গোচারণে প্রেরণ করিলেন, উপমন্যুও গুরুদেবের আদেশানুক্রমে গোরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন যায় এক দিবস উপমন্যু দিবাভাগে গোরক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরু-গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন, গুরুদেব উপমন্যুর স্থূল কলেবর দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমাকে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি, তুমি কি আহার কর তাহা আমাকে বল?" উপমন্যু

গুরুদেবের বাক্য শুনিয়া বলিলেন। "গুরুদেব! ভিক্ষা লব্ধ অন্ন দ্বারা উদর পূর্ণ করি।" শিষ্যের উক্তি শ্রবণ করিয়া গুরুদেব বলিলেন "অতঃপর আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেনা।" শিষ্য ও গুরুর আদেশানুসারে যাহা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হয় সমস্তই গুরুর নিকট সমর্পণ করেন। পুনরায় কিছু দিন পর যখন একদিন গুরুদেব বলিলেন, "বৎস উপমন্যু। আমি তোমার সমস্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি তথাপি তোমাকে স্থূলকায় দেখিতেছি সত্য করিয়া বল একণে কি আহার কর?" উপমন্যু উত্তর করিলেন, "ভগবন! আমি আপনাকে প্রথম বারের ভিক্ষা সমর্পণ করিয়া দ্বিতীয় বারের ভিক্ষা গ্রহণ করি।" ইহা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন," গুরুকুলবাসীর ইহা ধর্ম্ম নহে, তুমি এবম্প্রকার ভিক্ষা দ্বারা অন্যান্য ভিক্ষা জীবীর বৃত্তি প্রতিরোধ করিতেছ ও নিজের লোভ-বৃত্তির প্রশ্রয় দান করিতেছ সুতরাং অতঃপর তুমি আর দ্বিতীয়বার ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেনা।" পুনর্ব্বার শিষ্য উপমন্যু এইরূপ অভিহিত হইয়া পূর্ব্ববৎ গোরক্ষায় মনঃসংযোগ করিলেন। পুনরায় কিছু দিনান্তর গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় গুরুদেব পূর্ব্বের ন্যায় স্থূল দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "বৎস! আমি তোমার সমস্ত ভিক্ষাই গ্রহণ করি তথাপি তুমি পূর্ব্বের ন্যায় স্থূলকায় কি প্রকারে থাক?" তদুত্তরে উপমন্যু বলিলেন "প্রভো! এই সকল গাভির দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করি।" গুরুদেব বলিলেন, "আমিতো তোমাকে ঐরূপ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই, তথাপি তুমি বৎসগণকে বঞ্চিত করিয়া ঐরূপ ভাবে দুগ্ধ পান কর কেন?" উপমন্যু 'আর করিবনা' বলিয়া চলিয়া গেলেন, আবার কিছুদিন পরে একদিন গুরু উপমন্যুকে স্থূলকায় দৃষ্টে বলিলেন, "বৎস উপমন্যু। ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করনা, বারান্তরে ভিক্ষা করনা এবং গাভির দুগ্ধও পান করনা তথাপিও তুমি স্থূলকায় আছ কি প্রকারে তাহা আমাকে বল?" তদুত্তরে উপমন্যু বলিলেন, 'মহাশয়। বৎসগণ স্ব স্ব মাতৃস্তন পান করিয়া গেলে তাহাদের মুখে যে ফেন উদ্গীর্ণ হয় তাহাই পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকি।" উত্তরে গুরুদেব বলিলেন, "সুশীল বৎসগণ তোমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া অধিকতর পরিমাণে ফেন উদ্গার করে, ফেন পানে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি উহাদের আহারে ব্যাঘাত করিতেছ সুতরাং তজ্জন্য তোমার অপরাধ হইতেছে ঐরূপ আর করিও না।" গুরুভক্ত শিষ্য উপমন্যুর এইবার শেষ পরীক্ষা, অকপট গুরু ভক্তির বলে নির্ব্বিঘ্নে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, বলিলেন "গুরো। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন আর আমি ওরূপ করিবনা।" এই বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত গোধন রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমশঃ।

ভক্তি ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ মাস, ১৩২৫।

"তব প্রীতি লাগি' মোর জীবন ধারণ।" *

জয় শ্রীজাহ্নবামাতা শ্রীবংশীবদন।
বিপিনবিহারী প্রভু আদি গুরুগণ॥
জয় নিত্যানন্দ, জয় জয় বিশ্বম্ভর।
জয় সীতানাথ, জয় শ্রীবাস গদাধর॥
জয় সনাতন রূপ জীব ভট্টবর।
রঘুনাথ দাস সহ ছয় মহাশয়॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম জয় শ্যামানন্দ।
সবেমেলি কৃপাকর আমি অতি মন্দ॥
গৌর লীলা হেতু বিরচিতে ছিল মন।
তোমাদের করুণায় হইল স্ফুরণ॥
চারিশত বত্রিশ শ্রীগৌরাঙ্গ শকে।
কৃষ্ণাদশমীর শেষে পবিত্র কার্ত্তিকে॥

---

* জীবনের কোন সুপ্রভাতে স্মরণ নাই, অর্চ্চনীয়পাদ নিত্যধামগত পণ্ডিত দীনবন্ধুবেদান্তরত্ন মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। তখন তিনি খিদিরপুর হরিসভার আচার্য্য। পিতৃপিতামহগণের সৎপ্রসঙ্গ প্রভাবে বহুদিন হইতে যে বস্তু অন্বেষণ করিতেছিলাম উঁহাকে পাইয়া তাহাই লাভ হইল। ক্রমে নিতধামগত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গ লাভ হয়। তৎপর পূজ্যতম প্রেমিক ভক্ত শ্রীল রামদাস বাবাজী মহোদয়ের পদধূলি প্রাপ্ত হই। পরিশেষে এক শুভমুহূর্ত্তে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় লাভ ভাগ্যে ঘটে।

ইতিমধ্যে বাসনা জন্মে যে, আত্মশোধনার্থে কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র-সুধা অধুনাতন ভাবে কবিতায় সঙ্কলন করিব। শ্রীচরিত্র কিয়দ্দূর রচিতও হইল, কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরলীলায় হেতুমি লেখা হয় নাই। হেতুটী নবদ্বীপের

একাদশী শুভারম্ভে নিশা অবশানে।
আনন্দে লভিনু হেতু-প্রসাদ স্বপনে॥
ভগবান রাসে যবে পুছিলা গোপীরে।
"ব্রজে অনাময় কিবা বলগো আমারে॥"
গোপী ক'ন "অনাময় এবে আর নাই।
তোমার মুরলী রবে হইল বালাই॥
কত গোপী ভবস্থানে আসিতে নারিয়া।
করিলেন তনু ত্যাগ তোমার লাগিয়া॥
শ্রীব্রজমণ্ডলে উঠে বিলাপের ধ্বনি।
কারো কারো ভাগ্যে বাঁশী হানিল অশনি॥"
প্রেমসিন্ধু হরি শুনি হরিষে বিষাদ।
ভাবিলেন ব্রজে পূর্ণ নহে মনোসাধ॥
কি করিলে সর্ব্বজন অবাধে আমারে।
দরশন পরশন করিবারে পারে॥

সুখবোধ্য রূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে থাকি, পরে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই উক্ত কবিতার বিষয়। তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে এই যে,—

শ্রীরাসে সমাগতা গোপীবৃন্দকে শ্রীভগবান ব্রজের কুশল প্রশ্ন করিলে, কেহ বলিলেন "তোমার প্রেমোন্মাদকারিণী বংশীধ্বনি কোথাও কোথাও প্রমাদ ঘটাইয়াছে। কোন কোন গোপী এখানে আসিতে না পারিয়া তোমার তীব্র বিরহানলে গুণময় তনু আহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মীয় অন্তরঙ্গের বিলাপ-ধ্বনি শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রুত হইতেছে।" শ্রীভগবান বলিলেন "ব্রজে অনুতাপ অকুশল নহে।" এদিকে মনে মনে হরিষে বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া ভাবিলেন, "ব্রজে সাধ মিটিলনা। এবার এমন হইব কাহারও কোন ক্ষোভ না থাকে। জীবের তপোবল অপেক্ষা না করিয়া করুণাবশে সকলকে শ্রীমতীর মহামূল্য ভগবৎপ্রেম বিনামূল্যে বিতরণ করিব।" শ্রীমতীর প্রেম চিন্তামণি। তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নবজলধর তনু, কথিত কাঞ্চনাভায় মণ্ডিত হইল। রাসান্তে একদা সেইরূপে শ্রীমতীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া তাঁহার প্রশ্নমতে স্বীয় চিত্তবৃত্তি কি ভাবে তাঁহার নিকট উদ্ঘাটন করিলেন, পাঠকগণ! কবিতাপাঠে অবগত হউন।

এত চিন্তি'—ক্ষণে করি' ভাব-সংগোপন।
কহিলেন প্রেমময় প্রবোধ-বচন॥
"মা—মা, গোপাঙ্গনাগণ ক্ষোভ নাহি কর।
জগৎ আনন্দময় হইবে সত্বর॥
ব্রজধামে তনুত্যাগ নহে অমঙ্গল।
অনভিজ্ঞ জনে তাহে হইল বিহ্বল॥
ব্রজে যদি অনাময় না হইত এবে।
মুরলী মঙ্গল-ধ্বনি কেন বা করিবে?
না জানে মুরলী—বিনা পীযূষ-বর্ষণ।
প্রেমের অমিয়া-স্রোতে ভরিবে ভুবন॥"
পান করি' শ্রীহরির বচন অমৃত।
রাস-রসে মগ্না গোপী কান্তের সহিত॥
অতঃপর একদিন প্রেয়সীরে হরি।
স্বপ্ন-যোগে দেখা দিলা গৌর রূপ ধরি॥
চমকিয়া উঠি' রাই ক'ন ভগবানে।
"একি হ'ল নাথ! কিবা হেরিনু স্বপনে॥
নিশি শেষে সম্মুখে দাঁড়ায়ে এক যুবা।
সমুজ্জ্বল দীর্ঘ্য বপু হিরণ্ময় আভা॥
নবীন সন্ন্যাসীবেশ দুনয়নে ধারা।
মুখে সদা 'রাধাকৃষ্ণ' যেন মত্তপারা॥
'রাধে! দয়া কর'—বলি' হরে মোর মন।
সে হ'তে হারা'নু তোমা ভাবি অনুক্ষণ॥
কেন হেন হ'ল নাথ! বল গো আমারে।
তোমা বিনা কখনও ভাবিনা কাহারে॥"

এই কবিতায় যদি কোনরূপ ভ্রম প্রমাদ পরিদৃষ্ট হয় তাহা এই অধমের অজ্ঞতার ফল বলিয়াই জানিবেন। আর যদি কোন গুণ থাকে তাহা প্রাচীন মহাজনগণ ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রভাব মাত্র। (লেখক।)

বলিতে বলিতে রাই হ'ন মুরছিতা।
স্পন্দ নাই সংজ্ঞা নাই যেন ছিন্নালতা॥
প্রেয়সীর এই দশা করি' দরশন।
ধীরে শিখি-পাখা শ্যাম করেন ব্যজন॥
কতক্ষণে শ্রীরাধিকা চৈতন্য লভিলা।
ক্রোড়ে বসাইয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা॥
"শুন প্রিয়ে! তোমার স্বপ্নের বিবরণ।
অন্য কেহ নয় সেই হিরণ্য বরণ॥
আমার স্বরূপ শক্তি তুমি আহ্লাদিনী।
দ্বিধা হ'য়ে লীলা কৈলে পীযূষবর্ষিণী॥
আমিও করিনু কেলি বহু রসময়।
এ লীলায় কিন্তু মোর মন তৃপ্ত নয়॥
কেবল গোপিকাগণ সেবিল আমায়।
আর সকলের তরে মোর দুঃখ পায়॥
গোপীকার মধ্যে পুনঃ কত গোপনারী।
ত্যজিল শরীর মোরে সেবিতে না পারি॥
অল্পজন পায় সুখ বহুজন দুঃখ।
ইহাতে আমার চিত্তে নাহি হয় সুখ॥
তাই, মনে মনে আমি করিনু বিচার।
এ লীলা-বিলাসে মোর কাজ নাই আর॥
কেহ মোর দ্বেষ্য নয় সবে প্রিয় মম।
এই কথা শ্রীগীতায় হ'য়েছে ঘোষণ॥
এ লীলায় কিন্তু তার হয় ব্যভিচার।
কারে বধি, কারো সাধি, কি ভ্রম আমার॥
দুশ্চর তপস্যা করি' কেহ পায় মোরে।
বহুজন না পাইয়া ব্যথিত অন্তরে॥
জীবের তপস্যাবল হ'ল মোর মূল্য।
সর্ব্বজীবে অধিকার না পাইল তুল্য॥

শ্রীগীতায় যে সংবাদ পাইল প্রকাশ।
অসম্ভব ভাবি লোকে করে অবিশ্বাস॥
ইহাতে অন্তরে মোর বড় ক্ষোভ হয়।
চিন্তিলাম নিরজনে কি হবে উপায়॥
ভাবিয়া করিনু স্থির পৃথক থাকিলে।
তোমা লাগি' উৎকণ্ঠায় সব যা'ব ভুলে॥
অতএব তোমা সহ হইয়া মিলিত।
তোমার প্রেমের ভাবে হ'য়ে বিভাবিত॥
জীবের তপস্যা বল অপেক্ষা না করি।
সবারে বিলা'ব প্রেম তব ভাব ধরি॥
চিন্তামণি—তব প্রেম, চিন্তিতে চিন্তিতে।
আবৃত হইনু প্রিয়ে। তব সু-কান্তিতে॥
ত্যজিলে সকল যেন মোর লাগি' তুমি।
সন্ন্যাসী হইনু তব সেই ভাবে আমি॥
যদি কোন চিত্রকর চাহে গো। আঁকিতে।
তোমার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম মানব-মূর্ত্তিতে॥
অতুল সে প্রেম তত্ত্ব ধ্যান করি করি।
উপনীত হবে কিনা মূর্ত্তিতে তোমারি?
যার যেই ভাব তার সদৃশ আকার।
চোখে মুখে অঙ্গে ব্যক্ত হয় পরিষ্কার॥
এই বিধি বুঝি শিল্পী কি মূর্ত্তি রচিবে?
তব মূর্ত্তি বিনা রাধে। কোথা আর পাবে॥"
"ক্ষীণ দেহ-যষ্টি কান্তি সুবর্ণ বরণ।
সুঠাম সকল অঙ্গ সু-ছাঁদ বদন॥
সর্ব্বত্যাগী, মনে মুখে সদা ভগবান।
প্রিয়ের বিরহে সদা ব্যাকুল পরাণ॥
হা কৃষ্ণ! হা কান্ত! মুখে, দুনয়নে ধারা।
সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি, সদা আত্মহারা॥

কৃষ্ণ-সুখ মুখ্য হেতু জীবন ধারণে।
আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন কায় বাক্য মনে॥
বেশ ভূষা পানাহার সব কৃষ্ণ তরে।
অনন্য শরণ, প্রাণ—গোবিন্দ যা' করে'॥"
"বল রাধে। ইহা বই কি থাকিবে আর?
তোমার ধেয়ানে তাই হইল আমার॥
নবীন সন্ন্যাসী সাজ গৌর-বরণ।
মুখে—'রাধে! দয়াকর' সজল নয়ন॥
তাই স্বপ্নে হেরিয়াছ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
মম মনোবৃত্তি নহে তব অগোচর॥"
"এই যে গৌরাঙ্গ রাধে! হেরিলে স্বপনে।
প্রেমে পূর্ণ হবে বিশ্ব ইঁহার সেবনে॥
সঙ্গের তো কথা নাই স্মরিলে চরিত্র।
পুলকিত হবে অঙ্গ হৃদয় পবিত্র॥
স্তুতি-নিন্দা লাভালাভে না হবে বিকার।
আনন্দের জ্যোতি হৃদে খেলিবে সবার॥
কৃষ্ণ-লীলা আর নাহি ভাল লাগে মোরে।
করিনু কাহারে দণ্ড পুরস্কার কারে॥
কূট রাজনীতি চর্চ্চা ভীষণ সংগ্রাম।
অসাধু বিনাশ আর সাধু পরিত্রাণ॥
আর দেখ, জন্মে মোর কত জটিলতা।
রাসে পুনঃ দেখ প্রিয়ে! কতই শঠতা॥
কত লুকোচুরি কত আত্ম-আবরণ।
কত ব্যথা পায় কত আত্মীয় স্বজন॥
এ লীলার অবসান করিয়া এবার।
এমন হইব—দুঃখ না থাকে কাহার॥
জনমের জটিলতা এবারে না র'বে।
অসাধুরে দিব কোল—দণ্ড না থাকিবে॥

আপনি কাঁদিয়া সবে ক্রন্দন করাব।
সেই অশ্রুজলে শুভ অশুভ ধোয়াব॥
নামে সর্ব্বশক্তি দিয়া করাব সাধন।
নাম-গানে প্রেম-প্রাপ্ত হবে সর্ব্বজন॥
আপনি আচরি' ধর্ম্ম শিখাব জগতে।
অভিমান হীন, দীন, সহিষ্ণু হইতে॥
মুখে জগদীশ—বিশ্বসেবা—সেবা তাঁর।
যথালাভে পরিতোষ, স্ব-সুখ-সংহার॥
তুমি যেন চরাচরে হেরিলে আমারে।
আমিও তেমনি বিশ্বে হেরিব তোমারে॥
তোমার প্রেমের বলে বিশ্ববাসিচয়।
স্নিগ্ধ হবে মোর প্রীতি-প্রসাদে নিশ্চয়॥
তুমি যেন সদা কাঁদ "হা কৃষ্ণ" বলিয়া।
আমিও কাঁদিব তব নাম উচ্চারিয়া॥
কখনো তোমার ভাবে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি।'
আকুল পরাণে ভূমে দিয়া গড়াগড়ি॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানল জ্বালি' সবাকার।
কর্ম্মবীজ ভস্মীভূত করিব এবার॥
স্ব-ইচ্ছায় জীব কিছু করিতে না পারে।
কৃষ্ণ ইচ্ছা মাত্র পূর্ণ হইছে সংসারে॥
"জীব কর্ত্তা" এই ভ্রম করিয়া নিরাস।
শিখাব স্বরূপ—"সবে নিত্য কৃষ্ণদাস॥"
স্বরূপে আনিয়া তব প্রেম সুধাদানে।
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা শিখাব যতনে॥
স্ব-সুখ বাসনা—কাম, হেয়, বর্জ্জনীয়।
কৃষ্ণ-প্রীতি বাঞ্ছা—প্রেম, জীব শ্রেয়ঃ প্রেয়॥
শিখাইব তব-সুধা করি নির্ব্বাসন।
অর্পিব সন্তোষ-সুধা শান্তের লক্ষণ॥

সন্তোষ লভিয়া জীব হইলে কৃতার্থ।
তবে মম মনোসাধ পূরিবে যথার্থ॥
বিপদে বিপদ জ্ঞান না হইবে আর।
সম্পদের প্রমত্ততা না রবে কাহার॥
প্রাণেশের ইচ্ছা পূর্ণ হইছে সতত।
এ আনন্দে রবে জীব সুখ দুঃখাতীত॥
এই ব্রজলীলা র'বে আদর্শ হইয়া।
পঞ্চভাব পাবে জীব ইহা আস্বাদিয়া॥
রক্তক পত্রক আদি ব্রজে দাস যত।
শ্রীদাম সুবল আদি প্রিয় সখা কত॥
পিতা মাতা আদি আর যত গুরুজন।
তাঁদের ত্রিবিধ ভাব করি' আস্বাদন॥
আর এই বৃন্দাবন, তরুলতা চয়।
শ্রীযমুনা, ধেনু, বৎস, কুঞ্জ ছায়াময়॥
এই সব হরিকথা প্রসঙ্গে জীবন।
আনন্দ হিল্লোলে জীব করিবে যাপন॥
পরচর্চ্চা পরনিন্দা না রহিবে আর।
সর্ব্বত্র শ্রীহরি—পর কেহ নহে কার॥
ঈদৃশ জীবের সুখ দেখিতে বাসনা।
পূরাবে কি প্রিয়তমে। এ মোর প্রার্থনা?
আর যে মধুর ভাব—ভাব পরাকাষ্ঠা।
যার গুণে তুমি হও গোপীমাঝে শ্রেষ্ঠা॥
কিছুদিন আস্বাদিয়া সে উজ্জ্বল ভাব।
জীবে দেখাইব মহাভাবের স্বভাব॥
তোমার চরিত্র, তব যূথের আচার।
আস্বাদিয়া পাবে জীব আনন্দ অপার॥
নিত্যসিদ্ধাগণ মম পার্ষদ হইয়া।
শিখাবেন প্রেম-ভক্তি যাজন করিয়া॥

উত্তম উত্তম গ্রন্থ হবে পরচার।
প্রেম-ভক্তি-ধর্ম্ম বিশ্বে করিব বিস্তার॥
তুমি যদি কৃপা কর তবে সাধ পূরে।
আসন্ন কলির দুঃখ দহিছে আমারে॥
এস প্রিয়ে। এই লীলা করি সম্বরণ
সঙ্কীর্ত্তন প্রিয় লীলা করি প্রকটন॥
জন্মদোষ কর্ম্মদোষ কিছু না দেখিব।
তোমার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম সবে বিতরিব॥
যে প্রেমে না সুধা হয়, নাই হেন দোষ।
কারে না বর্জ্জিব, দোষে, না করিব রোষ॥
শ্রীগীতার সে প্রতিজ্ঞা করিব পালন।
কৃপা করি কর রাধে। সম্মতি জ্ঞাপন॥
তুমি মোর প্রাণমন্ত্র তুমি মোর বল।
তব কৃপাবিনা মোর সকলি বিফল॥
তব সহ হই পূর্ণতম ভগবান।
তোমা বিনা পূর্ণতার হয় তিরোধান॥"
ঠাকুরের বেদনায় হইয়া ব্যথিত।
"যথা আজ্ঞা"—ঠাকুরাণী করিলা বিদিত॥
"তোমার মনের সাধ করগো পূরণ।
তব প্রীতি লাগি' মোর জীবন ধারণ॥"
অন্তর্হিতা গোপী-চরণ চিন্তিয়া।
নির্ব্বাচন দীন সখা বিশুদ্ধি লাগিয়া॥

কাতর প্রার্থনা।

—:•:—

পতিতপাবন, অধমতারণ, বিপদবারণ, ভবভয়হারি, করুণাময়, শ্রীহরি! তুমি এ পতিতাধম, ভণ্ড, মূঢ়াত্মার উদ্ধার সাধন জন্য কি উপায় স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছ? পতিতোদ্ধারণ। তুমি এ পর্য্যন্ত যত যত পতিতের উদ্ধার করিয়াছ, আমাকে তাহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পতিত জানিবে। যে সমস্ত উপায় দ্বারা তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়াছ, তাহার কোন একটী অথবা সমস্ত উপায় একত্রেও আমার উদ্ধার সাধন সম্ভব নহে। কুকর্ম্ম, কুচিন্তা কুসঙ্গ এমন কি কু বলিতে যাহা কিছু সমস্তই আমি সাধন করিয়া ফেলিয়াছি, এবং এখনও করিতেছি। অন্যায়, অধর্ম্ম, পাপ বলিতে যাহা কিছু সমস্তই আমি সাধন করিয়া ফেলিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। অন্যায়, অধর্ম্ম, পাপ বলিতে যাহা কিছু সমস্তই আমার সাধ্য বস্তু, সমস্তই আমার আরাধ্য বা ইষ্ট স্থানীয়, সমস্তই আমার হৃদয়ানন্দ দায়ক হইয়াছে। অধিক কি, আমার তুল্য দ্বিতীয় পতিত ত্রিলোক খুঁজিয়া আর একটীও বাহির করিতে পারিবে না। অন্তর্য্যামীন্! ইহা সত্য কি না তুমি তোমার স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা শক্তিবলে জানিয়া লইয়া অবিলম্বে আমার উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন কর।

দীনবন্ধো! শুনিতে পাই তুমি সর্ব্ব-শক্তিমান। তাই আমার হতাশ প্রাণে এক্ষণে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইচ্ছাময়! তুমি ইচ্ছা করিয়া আমার উদ্ধার সাধন করিলেও করিতে পার। আর তুমি যখন পতিতপাবন তখন যে ইচ্ছা করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য, সে সম্বন্ধে আমার কোন কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু দয়াময়! উপায়টা যে কি করিবে তাহাতো আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি কেন, একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান! তুমি ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহা বিনির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব। পতিতপাবন। সর্ব্ব-শক্তিমান! যাহা হয় একটা কর। যদি তৎসঙ্গে আমায় কিছু করিবার থাকে তবে তাহাও আমাকে বলিয়া দাও। শুধু বলিয়া দিলেইবা কি হইবে? তাহা সম্পাদন করিবার শক্তি এবং তাহাতে ইচ্ছা দাও। এক

কথায় যাহা করিতে হয় তুমি কর। আমি কিছুই করিতে পারিব না। করিবার ইচ্ছাও যে আমাতে নাই, এই ভাব মুহূর্তের জন্য আমার অন্তরে উদয় হওয়ায় এতটা বলিয়া ফেলিলাম। ক্রমে তাহাও অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। বাঞ্ছাকল্পতরু! যাহা ইচ্ছা কর। তোমার বাঞ্ছাই পূর্ণ হউক্। কৃপাসিন্ধু। দীনে নিদয় হইয়া তোমার দীনদয়াময়, পতিতপাবন নামে কলঙ্কারোপ করিও না। দীনকে উদ্ধার কর, পতিতপাবন নাম সার্থক কর, দীনের ইহাই কাতর প্রার্থনা।

দীনহীন—শ্রী—

গোস্বামী শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর।

(লেখক—শ্রীযুক্ত সত্য চরণ চন্দ্র, উকীল।)

—:•:—

বন্দেঽহং শ্রীগুরুদেবস্য সর্ব্বাভীষ্ট প্রদৌপাদৌ।
যৎপ্রসাদাৎ ভবেৎ সদ্য শ্রীগৌরচরণে মতি॥

পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য শ্রীল রামচন্দ্রকবিরাজ মহাশয়ের নিবাস, গঙ্গা ও পদ্মাবতীর মধ্যস্থান পুণ্যক্ষেত্র তিলিয়া বুধরি গ্রাম। পণ্ডিত সমাজে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। কবিরাজ মহাশয়ের গোবিন্দ নামে এক সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহাদের পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন ও মাতামহ দামোদর সেন।

দামোদর সেন শ্রীখণ্ড বাসী। তিনি মহাপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁহার অকাট্য যুক্তি কেহই খণ্ডন করিতে পারিতেন না। একদা তিনি কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজয় করায়, দিগ্বিজয়ী দুঃখিত হইয়া অভিসম্পাত করেন যে, "তুমি অপুত্রক হইবে।" শুনিয়া দামোদর নিতান্ত আর্ত্তি সহকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করার বহু চেষ্টা করিলেন। পরিশেষে দিগ্বিজয়ী বলিলেন "তোমার কন্যা হইবে এবং সেই কন্যার গর্ভে দুই পুত্র রত্ন হইবে।" কবিরাজ রামচন্দ্র ও গোবিন্দ সেই দুই মহারত্ন।

ইহার কিছুদিন পরে দামোদরের সুনন্দা নামে এক অতি রূপবতী ও সচ্চরিত্রা কন্যা হয়। বিবাহ যোগ্যা হইলে ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কুমারনগর নিবাসী পূজ্যপাদ চিরঞ্জীব সেনকে এই কন্যারত্ন সমর্পণ করা হয়। বিবাহের পর চিরঞ্জীবসেন শ্রীখণ্ডে আসিয়া বসবাস করেন।

এই শ্রীখণ্ডবাসী চিরঞ্জীবসেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত ছিলেন, শ্রীসঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীত ছিল। শ্রীখণ্ডবাসী বহু দীনহীনজনকে তিনি ভক্তি রস-পাত্র করেন। শ্রীচরিতামৃতে মহাপ্রভুর মিলন প্রসঙ্গে মহারসিক শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই চিরঞ্জীবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আমাদের অতীব আদরের ধন শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় এই চিরঞ্জীব সেনকে পিতা ও সুনন্দা দেবীকে মাতারূপে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অল্প কালে বহু বিদ্যা অর্জ্জন করেন।

কালক্রমে গোস্বামী মহাশয়ের শুভ পরিণয় কাল উপস্থিত হইল। তাঁহার পিতা সেই শুভ উৎসবোপলক্ষে বহু যান বাহন ও বাদ্য সঙ্গীতের আয়োজন করেন। মহা সমারোহে পরিণয়োৎসব নিষ্পন্ন হইল। তৎপরে—কবিরাজ ঠাকুর বিবাহ করিয়া শিবিকারোহণে গৃহে গমন করিতেছেন, বাহকগণ বিশ্রামার্থ এক বৃক্ষমূলে শিবিকা উত্তোলন করিল।

সেইখানে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর স্থান, সৌভাগ্যক্রমে সেইসময়ে তিনি সেই তরুতলে দুই চারিজন ভক্তসহ কৃষ্ণ-কথা সুখে মগ্নছিলেন। বরের সহ যাত্রী বহু লোকজন ও বাদ্যকরগণ শ্রান্তিদূর করিবার জন্য তথায় উপবেশন করিয়াছিল। ঠাকুর রামচন্দ্র শিবিকা মধ্যে সমাসীন। তাঁহার গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তি, সৌম্যগঠন ও লাবণ্যময় সৌন্দর্য্যে অনঙ্গও লজ্জিত হয়।

শ্রীল আচার্য্য প্রভু সেই যুবকের এতাদৃশ অলোকসামান্য রূপ দর্শনে ভক্তগণকে বলিয়া ছিলেন যে, "এরূপ সুশ্রী পুরুষ যদি কৃষ্ণভক্ত হয় তবেই এ রূপের সার্থকতা হয়।" পুনরায় খেদ সহকারে বলিতেছেন—"এই জগৎ মায়াপুরী, এখানে মায়া মোহিত হইয়া লোকে অমঙ্গলকে মঙ্গল মনে করে। যে স্ত্রীসঙ্গ প্রভাবে লোক অনিত্যকে নিত্য মনে করিয়া স্বরূপ সন্ধানে বিরত থাকে, পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ জন্য নানাছলে অর্থ উপার্জ্জনে ব্যস্ত হইয়া সুখের আশায় দুঃখ ও অপমান সহ্য করে এবং পরিণামে পাপ-বশে নিরয়-গামী হয়,

সেই স্ত্রীকে পরম মঙ্গলের জনয়িত্রী বোধে লোকে পরিণয় উপলক্ষে কত না কৌতুক, কতনা ঘটা, কতনা মঙ্গলাচরণ করে।"

আরও বলিলেন—"বিবাহ বাদ্যে মায়া যে গলায় ফাঁসি পরাইয়া দেয় মানুষ তাহা বুঝিতে পারেনা। বাস্তবিক স্বরূপ জ্ঞান না হইলে কেহই তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না। কন্যা সমর্পণকালে বরকে যে বরণ-অঙ্গুরী আভরণ দেয় উহা মায়াপ্রদত্ত হাত বড়ি মাত্র। কণ্ঠে যে পুষ্পহার পরাইবার প্রথা আছে উহা কোমল কুসুম-মালিকা নয়, দৃঢ় মায়াপাশ মাত্র। বিবাহের পূর্ব্বে যে শুভ-দৃষ্টির ব্যবস্থা আছে তাহা পিশাচী-ঈক্ষণ। বিবাহের শেষে যে হস্তে হস্তে বন্ধনের প্রথা আছে তাহা মায়া কর্ত্তৃক প্রহরী নিয়োগ মাত্র। পাছে মানুষ মায়ার অধিকার হইতে পলায়ন করে সেই জন্য মায়া মহিলারূপা স্বীয় অনুচরীকে তাহার প্রহরিণী করিয়া দেন। আর এই যে উৎসব সূচক বাদ্যোদ্যম ইহা মায়ার জীবজয়োৎসবের ঘোষণা মাত্র।"

যুথকুলাগ্রণী ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্র শিবিকা হইতে সকলই শ্রবণ করিতেছেন। আচার্য্য প্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত সেই কঠোর মর্ম্ম-বাণী কবিরাজ মহাশয়ের কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালার প্রথম ভক্তি-প্রচারকের সেই জ্বলন্ত নিষ্ঠুর সত্যোপদেশ পরম পণ্ডিত কবিরাজ মহাশয়ের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে দীপ-শলাকার ন্যায় আঘাত করিয়া তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেক-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। রামচন্দ্র অধীর হইলেন।

তিনি নীরবভাবে গৃহে ফিরিলেন বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয় উৎসাহ বিহীন, সংসারে উদ্যম ও প্রবৃত্তি নাই। যেন অরুচি হইয়াছে। এইরূপে দুই তিন দিন যাপন করিয়া একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া শ্রীল আচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণ সমীপে উপনীত হইলেন। এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তদীয় শ্রীচরণ ধারণ পূর্ব্বক কাতর ভাবে নিবেদন করিলেন—"দয়াময়। আমি বিষয় কুসঙ্গে সতত রত, আমায় কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন।" শ্রীমৎআচার্য্য প্রভু আশ্বাস দিয়া বলিলেন "চিন্তা কি! শ্রীকৃষ্ণ অশেষ কৃপার আকর, যে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে তিনি অবশ্যই তাহাকে পরিত্রাণ করেন।"

এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রালাপ আরম্ভ করিলেন; অল্পক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন যে, কবিরাজ মহাশয় ভক্তিশাস্ত্র পাঠের উপযুক্ত পাত্র। বুঝিয়া

সাতিশয় প্রীতমনে তাঁহাকে যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষালাভ করিয়াই ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্র প্রেমানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার প্রেম যেন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত ছিল, শ্রীমদাচার্য্য প্রভুর উপদেশ তাহার বহিঃ প্রকাশের সহায়তা করিল মাত্র।

কবিরাজ মহাশয়ের গুরুভক্তি আদর্শ স্থানীয়। এক সময় শ্রীআচার্য্যপাদ স্মরণ মনন করিতে করিতে সাত দিবস চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একই অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীল বীরহাম্বীর রাজা শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া ঠাকুরাণী প্রভৃতি তদীয় ভক্তগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, প্রভু বোধহয় এইবারে লীলা সম্বরণ করিবেন। শ্রীঠাকুরাণীর অভিপ্রায় মত শ্রীল আচার্য্য-পাদের প্রিয়তম শিষ্য ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্রকে আনয়ন করা হইল। তিনি স্বীয় অভীষ্টদেবকে প্রণতি পূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। এবং ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে, প্রভু শ্রীযমুনায় শ্রীশ্রীযুগল কিশোরের জলকেলি দর্শন করিতেছিলেন এমন সময় শ্রীমতীর শ্রীকর্ণের কুণ্ডল চ্যুত হওয়ায় তাহার অন্বেষণে ব্যস্ত আছেন। দেখিয়া আপনিও স্বীয় গোপীদেহ ভাবনা করতঃ শ্রীযমুনায় উক্ত কুণ্ডল অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে এক পদ্মপত্র তলে উক্ত শ্রীকুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে শ্রীগুরুরূপা সখী সহ আলিঙ্গন করতঃ শ্রীমতীর কর্ণে পরাইয়া দিলেন। কিশোরী প্রসন্ন হইয়া তাম্বুল চর্ব্বিত প্রসাদ উভয়ের হস্তে দিলেন। তখন উভয়েই নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং ভক্তবর্গকে সেই ত্রিদিব-দুর্লভ সৌরভ-পূর্ণ অমৃত বণ্টন করিয়া দিয়া কৃত কৃতার্থ করিলেন।

কবিরাজ মহাশয় নিত্য গঙ্গাস্নানে যাইতেন। তিনি যে ঘাটে স্নান করিতেন তথায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্নানান্তে শিবপূজা করিতেন। শ্রীল কবিরাজ মহাশয় স্নানান্তে ঐরূপ করেন না দেখিয়া এক দিবস ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বলিলেন "তুমি শিবপূজা করনা কেন?" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবত অনন্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করাকেই সদাচার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।" ব্রাহ্মণগণ সেই সদুত্তর হৃদয়ঙ্গম না করিয়া রোষ পরায়ণ হইয়া বলিলেন "স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শিবপূজা করেন, আর তুমি তাঁহার আরাধনা না কর কেন?", তাহাতে শ্রীল কবিরাজ মহাশয় যে উত্তর করেন তাহা ভক্তগণ

সকলেই জানেন। তথাপি নবীনগণের অবগতির জন্ত প্রকাশ করিতেছি। তিনি বলিলেন "আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। তবে আমি উপাসনার ফল ও উপাসকের ভাব-তারতম্য বিচার করিয়া আরাধ্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছি। দেখুন, ব্রহ্মা ও শিবের ভক্ত বাণ ও রাবণ, পৌণ্ড্রক ও বৃকাসুর, নরক ও ক্রৌঞ্চকাদি নৃপগণ বরলাভ করতঃ কেহ স্বীয় ইষ্টদেবের শিরে হস্ত দিয়া তাঁহাকেই ভস্ম করিতে চান, কেহবা নিজেই কৈলাসপতি হইতে চান এবং শ্রীগৌরী মাতাকে অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করেন। এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার যিনি যাঁর ভক্ত তিনি তাঁরই প্রিয় হইতে পারেন না।

> প্রহ্লাদ ধ্রুব রাবণানুজ বলি ব্যাসাম্বরীষাদয়ঃ
> স্তে বৈ বিষ্ণুপরায়ণা বিদিতব প্রেষ্ঠা জগন্মঙ্গলাঃ।
> যেহন্যে রাবণবাণপৌণ্ড্রকবৃকাঃ ক্রৌঞ্চাঙ্ককাদ্যা অমীঃ
> যদ্ভক্তা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরে স্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ॥

এতদ্দর্শনে আমি শ্রীকৃষ্ণ ভজনই সার করিয়াছি। যাঁহারা হরিভক্ত তাঁহারা নিজ সুখ বা ক্ষমতা প্রতিপত্তি আদৌ চান্না, মুক্তিকেও তুচ্ছ মানেন।"

কিছুদিন পরে কবিরাজ মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি মনস্বী বৃন্দাবনবাসীগণ ইঁহার রচিত কাব্য ইঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া মহাপ্রীত মনে ইঁহাকে "কবিরাজ"—এই খ্যাতি প্রদান করেন।

ভক্ত পাঠকবর্গ। যিনি এইরূপে স্বীয় গম্ভীর পাণ্ডিত্য ও অখণ্ডনীয় সৎযুক্তি প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন, আসুন, আজ আমরা পরম করুণ ও মঙ্গলময় শ্রীভগবানের প্রসাদ-বিন্দুলাভার্থে শ্রীল আচার্য্য প্রভুর প্রিয়তম শিষ্য সেই ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের শরণাপন্ন হই। তাঁহার যুগল চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

প্রিয় পাঠকগণ! ভক্ত চরিত্র, ভক্ত মহিমা অসীম, অফুরন্ত। আমরা কেন, শ্রীভগবান নিজেই ভক্তমহিমা কীর্ত্তনে বিহ্বল হইয়া থাকেন। আমরা আর কত বলিব। কেবল আত্ম-শোধনার্থে কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ হইল।

গুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া সমস্তগুলী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপমন্যু গোরক্ষা করিতেছেন; একদিন ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করিলেন। ঐ ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ অর্ক পত্র ভক্ষণে তাহার চক্ষুর দোষ জন্মিল এবং ক্রমে অন্ধ হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে পতিত হইলেন। এদিকে সূর্য্যদেব সমস্ত দিন অকাতরে পরিশ্রম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য অস্তাচলাবলম্বী হইলেন গুরুদেব তথাপি শিষ্যকে গোরক্ষা করিয়া ফিরিতে না দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্নচিত্তে অন্যান্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসগণ! উপমন্যু এখনও কেন আসিতেছেন না? বোধ হয় আমি আহার প্রতিষেধ করিয়া দিয়াছি বলিয়া কুপিত হইয়াছে অতএব তাহার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া "বৎস উপমন্যু! কোথায় আছ শীঘ্র আইস" বলিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। উপমন্যু গুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি ক্ষুধার জ্বালায় অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইয়াছি।" গুরুদেব তখন তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বৎস। দেব বৈদ্য অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের স্তব কর তাঁহারাই তোমাকে কৃপা করিয়া চক্ষুঃ প্রদান করিবেন" গুরুদেবের আদেশে উপমন্যু অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের স্তব করিতে লাগিলেন তাহার স্তবে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার এই অবিচলিত গুরুভক্তি দর্শনে আমরা সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি তুমি চক্ষুষ্মান ও শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইলে।" এইভাবে চক্ষুলাভ করিয়া উপমন্যু গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে গুরুদেব বলিলেন, "অশ্বিনী কুমারদ্বয় যেরূপ বলিয়াছেন সেইরূপেই তুমি সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।"

গুরুভক্তি বলে সকল বেদ, সমুদায় ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও সর্ব্বকাল তোমার স্মরণ-পথারূঢ় থাকিবে।" পাঠকগণ! উপমন্যুর পরীক্ষা শেষ হইল।

এই পুরাণ-প্রসঙ্গ হইতে আমরা কি বিশেষ তত্ত্ব প্রাপ্ত হইলাম একণে সংক্ষেপে তাহারই একটু আলোচনা করিব। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগ শাস্ত্রে বলিয়াছেন। "কেহ যদি হস্তিদেহ সংযম করে তাহা হইলে তাহার দেহে হস্তির স্থায় বল হয়।" এখানেও শিষ্য গুরুদেবের ভাবনা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাওয়ায় মহর্ষি পতঞ্জলির মতে গুরুভাব শিষ্যে স্ফুরিত হইল। আরও দৃষ্ট হয় যে, যখন হীন জাতি জ্ঞানে, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতে অস্বীকার করিয়া ছিলেন তখন সেই যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু, শিক্ষার্থী একলব্য নির্জ্জনারণ্যে দ্রোণাচার্য্যের মৃণ্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাতে সংযম শক্তি প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার সমস্ত বিদ্যা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরও দেখুন এক খণ্ড কাষ্ঠকে অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিলে প্রথমে যেমন তাহার জলীয়ভাগ অগ্নি-তাপে বাষ্পাকারে দূরীভূত হইয়া নিরস হইয়া গেলে, উহা ক্রমে ক্রমে অগ্নির আকার ধারণ করে। সেইরূপ গুরুরূপ অগ্নিতে পাপবারী-সিক্ত শিষ্যেরও ঐ দশা ঘটিল। প্রথম সংভাবের সংযোগে, সংসঙ্গের গুণে তাহার চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইল পরে তাহার শুদ্ধচিত্তে গুরুরূপ জ্ঞান-তত্ত্বের বিকাশ হইল। এক মহাপুরুষ তাহার কোন প্রিয় শিষ্যের পরীক্ষার জন্য তাহাকে একটী পাখী প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন "বৎস! এই পাখীটীকে, যেস্থানে কাহারও দৃষ্টি যায়না এমন নির্জ্জন স্থানে হত্যা করিয়া ইহার শোণিত আনয়ন কর। সাবধান! কেহ যেন দেখিতে পায়না।" শিষ্য গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া গুরুদেবের বাক্যরক্ষার চেষ্টা করিতেছে এই সময় হটাৎ সেই গুরুভাবমগ্ন শিষ্যের মনে হইল, হায় হায়। আমি করিতেছি কি! আমার যে ভয়ানক ভ্রম, নিশ্চয়ই শ্রীভগবান আমাকে পরীক্ষার জন্য এ খেলা খেলিতেছে। জগতে নির্জ্জন স্থানতো একেবারে বিরল, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-সত্বায় এই বিশ্ব নিমজ্জিত, সুতরাং অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তো আমার সেই পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের চৈতন্ত জ্যোতিতে বিভাষিত। আমি নির্জ্জন খুঁজিতেছি কোথায়! এইরূপ ভাবে ভাবিতে ভাবিতে বিহ্বল প্রাণে শিষ্য গুরুর নিকট উপস্থিত

হইয়া বলিলেন, "গুরো ! আর ছলনা করিবেন না, আমি এ জগতে নির্জ্জন স্থান'ত কোথাও পাইলাম না; সর্ব্বত্রই আপনার আনন্দময় সত্তা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছি। সুতরাং নির্জ্জন স্থান আমার লাভ হয় নাই।" শুকদেব তখন শিষ্যের পরীক্ষা শেষ হইল বুঝিয়া প্রেমালিঙ্গনে সন্তুষ্ট করিয়া শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন। "বৎস। তুমিই ধন্য, আমিও তোমার ন্যায় গুরুভক্ত শিষ্যকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার মঙ্গল হউক

প্রকৃত পক্ষে যদি ঐ সকল অমূল্য সত্য সাধকের নিজ নিজ জীবনে সংক্রামিত না হয় তবে কেবল মাত্র শাস্ত্র পাঠে বা কেবল মাত্র উপদেশ লাভে প্রকৃত ফল হয় বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ভাব ও উদ্ভাবে ভাবিত থাকাই সাধকের একটী প্রধান লক্ষণ। আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান, সাধককে যত পরিমাণে প্রকাশ করিতে থাকে তাহার নিকট সেই পরিমাণেই সংসারের অনিত্যতা প্রকাশ পায়। এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে নিজ মুখে বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"

অর্থাৎ যাহা অসৎ তাহার প্রকৃত কোনও সত্তা নাই আর যাহা সৎ তাহারও সত্তার কোন অভাব হয়না, এই গীতোক্ত বাক্যটী যদি আমরা স্থির চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের অনিত্য আসক্তি দূর হইয়া জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে তখন দেখিতে পাইব যে, জগতের যাবতীয় পদার্থই অনিত্য। যে বীর্য্য একদিন দেবতাদিগকেও দাসত্বে আবদ্ধ করিয়াছিল, সেই বীর্য্যশালী বীর চূড়ামণি লঙ্কেশ্বর রাবণ আজ কোথায়, যে বাহুবল একদিন সকল রাজন্যবর্গকে পশুর ন্যায় যজ্ঞে বলি দিতে উদ্যত হইয়া আবদ্ধ রাখিয়াছিল, সেই মহাতেজা জরাসিন্ধু এখন কোথায়, যে পরাক্রমের নিকট ক্ষত্রিয় কুলান্তকারী পরশুরাম পর্য্যন্ত পরাস্ত হইয়াছিল সেই চিরকুমার, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, মহাজ্ঞানী ভীষ্ম আজ কোথায়, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই দেবভীতিহারী অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ এখন কোথায়, এই সংসার ক্ষেত্রে ধন মান সৌর্য্য বীর্য্য যাহা কিছু দেখিতেছ ইহার কিছুই নিত্য নয় সকলই অনিত্য একদিন না একদিন সকলই কালের অতল জলে নিমজ্জিত হইবে, পরিশেষে সেই নিত্য স্বরূপ আত্মাই বিদ্যমান থাকিবে। এই অনিত্য জ্ঞান গুরু কৃপায় যাহার যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহার সেই পরিমাণেই অধ্যাত্ম জ্ঞানের

বিকাশ হইতে থাকে আর তৎসহ ক্রমে ক্রমে গুরু ভক্তি ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সাধক প্রত্যেক পদার্থেই নিজ ইষ্ট মূর্ত্তির দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। তাই চরিতামৃত কার বলিয়াছেন প্রকৃত সাধক সেই যাহার সর্ব্বত্র ইষ্টস্ফূর্ত্তি পায়। শ্রীচরিতামৃতেই উক্ত হইয়াছে,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রই হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

তখন সেই সাধক এইরূপ অনুভব করিতে থাকেন যে, তাঁহার গুরুরূপী বাসুদেব, দেবতা হইতে কীটানুকীট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকই প্রকৃত গুরুভক্তি লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, নতুবা আমার ন্যায় কেবল মুখে গুরু ভক্তি দেখাইতে গেলে ভক্তিলাভতো হয়ই না ক্রমে অভক্তিই আসিয়া পড়ে। তাই বলি বন্ধুগণ। আসুন আমরা সকলে এক প্রাণে এক মনে সেই পরাৎপর পরম কারুণীক অধমতারণ শ্রীগুরুদেবের জয় দিয়া হৃদয়ের পাপতাপ জ্বালা যন্ত্রার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করতঃ পরমানন্দ লাভে ধন্য—কৃতার্থ হইয়া যাই। জয় শ্রীগুরু।

দীন—শ্রী—

ভাগবত-তত্ত্ব-সুধা।

(লেখক—শ্রীযুক্ত হারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

এমন সময় গিয়াছে যখন "শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব" এই কথা কয়টি শ্রবণ মাত্র অনেকে লাফাইয়া উঠিত, তাহাদের স্থূল বুদ্ধিতে সূক্ষ্ম তত্ত্বের ধারণাই হইত না, ইহা কেবল সাধক শ্রেণীভুক্ত অল্প লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন দেশ, কাল ও পাত্র অন্যরূপ হইয়াছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জড় বিজ্ঞানের মুখ্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া অসম্ভবকেও সম্ভব করিতেছেন দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিও মার্জ্জিত হইতেছে, কিন্তু আমরা হিন্দু, ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় ভাবের ভিত্তি, আমাদের মার্জ্জিত বুদ্ধি

চৈতন্ত বিজ্ঞান বা ধর্ম্ম-তত্ত্বের সূক্ষ্ম ভাব ধারণা করিবার উপযোগী হইতেছে। বহুদিনের দাসত্ব জনিত জীবন সংগ্রামে আমাদের বুদ্ধি স্থূলেরদিকে চালিত হইয়াছিল। কেননা মুসলমানের অধীনে আমরা স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মালোচনা করিতে পারি নাই, কিরূপে ধর্ম্ম রক্ষা হইবে এই চিন্তায় বিব্রত হইয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানের বেড়া দিয়া কোনরূপে ধর্ম্মকে বজায় রাখিয়াছিলেন মাত্র, দস্যুর নিকট হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা যে সম্পত্তি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার করিয়া যাইবার অবকাশ না থাকায় আমরাও সে সম্বন্ধে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ক্রমে আমাদের মন স্থূলাভিমুখীন্ হইয়া এত সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল যে, কেহ মনে করাইয়া দিলেও তাহা বিশ্বাস হইত না। একজন বদ্ধ কালাকে নাচগানের আসরে লইয়া গেলে সে যেমন নাচই দেখিবে, গান শুনিতে পাইবে না, গান হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে সহস্র বার বুঝাইয়া দিলেও সে বিশ্বাস করিবে না, সেইরূপ যাহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টির আভাস মাত্র নাই, তাহারা সূক্ষ্ম তত্ত্বের ধারণা করিবে কিরূপে? কিন্তু শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এখন আর সে দিন নাই। দেশ, কাল ও পাত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখন অনেক কালারও শ্রবণ শক্তির উন্মেষ হইতেছে। দক্ষিণেশ্বরে ৺পরমহংসদেবের হৃদয় নির্ঝর হইতে যে আধ্যাত্মিক ভাবের স্রোত বহিয়াছিল তাহা ক্রমে দেশব্যাপী হইয়াছে, গোঁড়ামি ও পরধর্ম্ম বিদ্বেষ নাই বলিলেও চলে, ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম এক—দেশ ভেদে, ভাব ভেদে কেবল বিভিন্ন মত ও পথের বিভিন্নতা থাকিলেও গম্যাস্থান এক। গানের আসরে বহুযন্ত্র বহুভাবে বাজিতেছে কিন্তু সুরলয় এক, ইহা বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে, আরও বুঝিয়াছে যে, মনকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উন্নীত না করিলে সাধন রহস্য অবগত হওয়া যায় না, এবং প্রকৃত সাধন পথে অগ্রসর না হইলে কারণ বা মায়ার গণ্ডী পার হইয়া মহাকারণ স্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করা অসম্ভব, অতএব এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা তত্ত্বের দ্বার উন্মোচনের চেষ্টা করা অসাময়িক হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাই আমাদের এই আয়োজন।

লীলা-তত্ত্বের সূক্ষ্মভাব আলোচনা করা হইতেছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, অবতার লীলার স্থূল ভাব কেবল রূপক মাত্র, লীলা—নিত্যভাবেরই স্থূল বিকাশ, এই বিকাশ না হইলে সাধকগণ সূক্ষ্ম তত্ত্বের

ধারণা করিয়া নিত্য ভাবের পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইত না, অতি সূক্ষ্ম বীজ হইতে বিশাল বৃক্ষ জন্মিতে না দেখিলে কে বিশ্বাস করিত যে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু সাধারণতঃ ইহা জানা থাকিলেও কোন বীজের আকার কিরূপ, এবং তাহা হইতে কিরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, ইহা উদ্ভিদ্ তত্ত্বজ্ঞ ভিন্ন যেমন অপর কেহ বলিতে পারেনা, সেইরূপ লীলার ভাব দেখিয়া কোন্ ভাবে কিরূপ সাধন তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা জ্ঞানী ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারেনা, যাহারা অজ্ঞান ভূমিতে বিচরণ করিতেছে, "ভূ ভু'ব স্ব" এই তিন স্তরের মধ্যে যাহাদের মনের গতি আবদ্ধ, সেই সকল কাম্যকর্ম্মীগণ লীলার স্থূল ভাব নিহিত উপদেশ গুলি পালন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমে তাহাদের মন স্থূলের সীমা পার হইয়া সূক্ষ্ম স্তরের নিম্ন ভূমিতে উপস্থিত হয়, এই সময় বহিপূ'জা অপেক্ষা স্তুতি ও জপে সাধকের মন অধিক আনন্দ পায়, পরে ঐ স্তরের যত উচ্চে আরোহণ করিতে থাকে জ্ঞানের রশ্মিতে ততই তাহার হৃদয় আলোকিত হইতে থাকে ও মানস পূজা বা ধ্যান ধারণাদিতে তাহার মন সংযুক্ত হয়, এই সময়ে লীলার অন্তর্নিহিত ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় সাধনের দ্বারা তাহা আয়ত্ত করিলে সাধকের প্রত্যেক কর্ম্ম সেইভাবে অনুরঞ্জিত হয়, কর্ম্ম নিত্য ভাবযুক্ত হওয়ায় আলোকের নিকট অন্ধকারের ন্যায় অনিত্যে আসক্তির ভাব নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অহং মালিন্য শূন্য সাধক বন্ধন মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম সদ্ভাব লাভ করতঃ নিত্যানন্দ উপভোগ করেন। এ বিষয় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে একস্থানে বলিতেছেন—

উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃ পূজাঽধমা ধমা॥

ক্রমশঃ।

"ভাগবত-তত্ত্ব-সুধা" লেখক মহাশয় প্রথমবারে সূচনা লিখিয়াই বহুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন, সে কারণ এ মাসে বেশী লেখা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। শ্রীভগবান তাঁহাকে শীঘ্রই নিরাময় করিয়া পাঠকগণের আনন্দ বর্দ্ধনে পরিচালিত করুন ইহাই একান্ত প্রার্থনীয় (ভক্তি কার্য্যধ্যক্ষ।)

পথের কাঙ্গাল।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।)

১৩—তোমায় যেন ভুলিনা।

——:০:——

দীনবন্ধো! দীনদয়াল! পতিতপাবন গুরো! যেন তোমার সে প্রেমময়, ভাবময় মধুর জ্যোতির বিমল কিরণ আজ সেবকের জীবন-পথ আলোকিত করে। আহা, কত লোকে কত ভাবে তোমায় কাঁদিয়াছে, কত লোকে কত সাধে তোমায় সাধিয়াছে, তবু তাহাদের সাধ মেটে নাই, তবু তাহাদের প্রাণের পিপাসা মেটে নাই। শ্বাপদ সঙ্কুল ঘোর অন্ধকারময় পিচ্ছিল পথে বিচরণ করিতে করিতে যখন বারম্বার পতন বেদনায় অস্থির হইয়া তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, তখন দয়ালগুরো! তুমি দয়া করিয়া তাহাদের নয়নের মলিন আবরণ উন্মোচন করিয়া যে অপূর্ব্ব আলোকময় পথ দেখাইয়া দিয়াছিলে, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ব্রাহ্মণ, আদর্শ গুরুরূপে যে মহান্ আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছিলে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, মুগ্ধ নর-নারীকে যে জ্ঞান, যে শিক্ষা, যে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলে তাহা কি কেহ কখনও ভুলিতে পারে? এবং তাহা কি কখনও ভুলিতে পারা যায়? আর তাহা ভুলিলেও কি মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে? অথবা—হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে ক্ষণেকের তরেও কি শান্তির বিমল ছায়া পতিত হয়? হয় না বলিয়াই তো তাহাদের আশা মেটে নাই, পিপাসার শান্তি হয় নাই। পাছে তোমায় ভুলিলে, তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিলে তোমার মধুরসঙ্গীত শ্রবণে বঞ্চিত হইলে আবার সংসারের মোহময় আবরণে আবরিত হইতে হয় আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট পথহারা পথিকের ন্যায় অন্ধকারে বিচরণ করিতে হয়, সেই জন্য যাহারা তোমার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তোমার দর্শন লালসায় ছুটিয়া আসিত তাহারাই এখন তোমার পার্থিব মূর্ত্তির অদর্শনে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া দিব্য-লোকস্থিত তোমার দিব্য মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে বলিতেছে;—

"দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর।
আঁধার পরাণে বড় ব্যাথা পাই, দেখা দিয়ে জুড়াও অন্তর॥

"নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,
অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি,
অন্তরে বাহিরে যেন নিরখি তবরূপ মনোহর॥"

দয়াময় গুরুদেব। যে মধুর মূর্ত্তির আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া, কত নর-নারীর প্রাণে মধুর ভাবের উন্মেষ হইত তাহা কি ভুলিতে পারা যায়? তোমার অহৈতুকী করুণায় যাহার প্রাণে একবার সে মধুর ভাব জাগিয়াছিল, সে কি কখনও সে ভাবচ্যুত হইয়া স্থির থাকিতে পারিবে? আবার যে মুহূর্ত্তে তাহাদের প্রাণে সে ভাবের উদয় হইবে তখনইতো তুমি তোমার ভুবন ভুলান জ্যোতির্ম্ময় রূপে তাহাদের হৃদয়াকাশ আলোকিত করিবে। যদিও তুমি এখন জড় জগতের স্থূল আবরণে আবৃত নও, যদিও তোমার সেবকেরা তাহাদের স্থূল নয়নে তোমায় বাহিরে দেখিতে পায় না, তা বলিয়াতো তুমি তাহাদের মানস চক্ষের বহির্ভূত হও নাই, বরং আগে যাহারা তোমাকে স্থূল ভাবে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইত এখন তাহারা সেই ব্যগ্রতা একেবারে তোমার চিন্তায় ঢালিয়া দিলে, প্রাণ খুলিয়া তোমার চিন্তা করিলে, তাহাদের আশে পাশে, সদাসর্ব্বদা তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিতে পাইবে, তখন কি সে বিগলিত নয়নে গদগদ বাক্যে না বলিয়া থাকিতে পারে যে,—

"নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমায় পায় না জানিতে রয়েছ হৃদয়ে গোপনে॥"
বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশে পাগলের মত
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে॥"

প্রভো। যে ভাবের খেলা খেলিয়া ভাব তরঙ্গের আন্দোলনে কত শত ভাগ্যবান নর-নারীর হৃদয় আন্দোলিত করিয়া দিয়াছ, যে মন মাতানো প্রাণ গলানো স্বরূপ জাগানো—সুমধুর সুরে "রাধে, গোবিন্দ গোপীনাথ গোপীজন বল্লভ" বলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে অতি অধমের প্রাণেও ক্ষণেকের তরে পবিত্র ভাবের সমাবেশ করিয়া দিয়াছ তাহা কি কখনও ভুলিতে পারা যায়? তোমার সে ভাবময় কীর্ত্তনের সুমধুর সুর একবার যার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে

সেহতো ভাবিয়াছে—এ যে প্রাণের আহ্বান, এ যে অব্যর্থ সন্ধান। এ যে "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিলরে, আকুল করিল মোর প্রাণ।" তারপর আবার যে একবার তোমার সে ভাবাবিষ্ট ভাবে প্রেম পুলকিত কলেবরে মনোহর নৃত্য দেখিয়াছে সে যে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে সে যে মন্ত্র মুগ্ধ ফণীর ন্যায় একেবারে তোমাগত প্রাণ হইয়াছে, তোমার প্রতি পদক্ষেপে যে সে নাচিয়া নাচিয়া জীবন মন প্রাণ একেবারে তোমার পদে ঢালিয়া দিয়াছে। সর্ব্ব-শক্তিময়ের শক্তি কণা তোমার হৃদয় ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়াছিল তাঁহার শাস্তোজ্জ্বল তেজোবিক্ষেপ যাহাদের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে তাহারা আজ আপনা-দিগকে কৃত কৃতার্থ জ্ঞানে কৃতাঞ্জলি পুটে তোমার উদ্দেশে বলিতেছে—

"তোমার রাগিনী জীবন কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমার আসন হৃদয় পদ্মে, রাজে যেন সদা রাজে গো॥"

দয়াল গুরো! তুমি কলি-কলুষিত, বিপথগামী, পশু ভাবাপন্ন, মোহ-নিদ্রায়, নিদ্রিত মানব-মণ্ডলীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া যে মধুময় উপদেশ প্রদান করিয়াছ, তাহা কি কখনও ভুলিতে পারা যায়? আর সে উপদেশও কি কখন নিষ্ফল হয়? তাইতো এখনও যখন প্রভাতে প্রথম নয়ন উন্মীলন করি, তখন যেন তোমার অপরিসীম কৃপা শক্তি আসিয়া ধীরে ধীরে কাণে কাণে বলিয়া দেয়—

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্ণঃ—
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥

আবার যখন অধ্যয়ন করিতে বসি তখনই যেন নয়নাগ্রে তোমার সেই প্রেম ঢল ঢল মধুর মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয় আর যেন শুনিতে পাই তুমি সহাস্য বদনে বলিতেছ—

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং
তীর্থাস্পদং শিব বিরিঞ্চি নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষতে চরণারবিন্দম্॥"

ক্রমশঃ।

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

ওহে করুণা-নিদান! ও পূত চরণ তল
ছাড়িয়া আমরা সবে আসিয়াছি ধরাতল।
হইয়াছে গত নাথ! কত যুগ যুগান্তর,
লভিয়াছি কর্ম্ম ফলে কত জন্ম জন্মান্তর।
ভুলিয়া গিয়াছি মোরা সুধাময় সে চরণ,
শিথিল হ'তেছে ক্রমে সেই প্রেম আকর্ষণ।
এ সংসার যবনিকা আবরিয়া সেই স্মৃতি—
রাখিয়াছে, হে গৌরাঙ্গ! হ'য়ে আছি ভ্রান্ত মতি।
ঘুরিতেছি অবিরত, এ সংসার ঘূর্ণিপাকে,
হ'তেছি নিয়ত চূর্ণ যাতনা লাঞ্ছনা শোকে।
বল বল প্রেমময়! কত কাল এই ভাবে,
সকাম বাসনা লয়ে যাতায়াত হবে ভবে?
কর্ম্মের বন্ধন প্রভু বিমুক্ত হইবে কবে?
নিষ্কাম সাধনা ল'য়ে থাকিব তোমার ভবে।
সে মহা মধুর স্মৃতি হৃদয়ে উঠিবে জাগি,
জপিয়া সে সুধা নাম সে চরণ ল'ব মাগি।
কর হে করুণা হরি! তুমি দীন দয়াময়,
জাগাও সে মহাস্মৃতি হৃদে ভক্তি সুধাময়।
আমরা ভুলেছি ব'লে তুমিত ভোলনি' প্রভু,
বিস্মৃত হইলে তুমি জগৎ কি থাকে কভু?
তাই বলি হে গৌরাঙ্গ! ডাকিয়া লও হে কাছে,
কর সুধা বরিষণ যে সুধায় মৃত বাঁচে।

সাধু-সঙ্গে একদিন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

—:০:—

মহা।—বৎস, তোমার অনুসন্ধান প্রবৃত্তি দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি করুণাময় শ্রীভগবান তোমার মঙ্গল বিধান করুন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। তুমি যে উপাসনাতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই উপাসনা তত্ত্বের সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয় এই তিনটীর মধ্যে সংক্ষেপে—এক কথায় বলিতে গেলে একমাত্র প্রেমময় শ্রীভগবানই জীবের সম্বন্ধের পাত্র। যাবতীয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের আকর হইলেন শ্রীভগবান, ইনিই পরমাত্মারূপে জীবের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া জীব জগতের নানাপ্রকার সুন্দর নয়নরঞ্জন দৃশ্য দর্শন করিয়া, নানাপ্রকার সুশ্রাব্য সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। যখনই জীবের দেহে এই পরমাত্মার সত্ত্বার অভাব ঘটে তখন সেই চক্ষু কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিতেও জীব কোন কিছুরই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং যাঁহার সত্ত্বায় জীবের সত্ত্বা, যাঁহার অভাবে সকল থাকিয়াও কিছুই থাকে না এমন যে শ্রীভগবান তাঁহাতে প্রীতি জন্মানই জীবের একান্ত প্রয়োজন। আর শাস্ত্রকারগণ সাধন ভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

নলিনী।—প্রভো। সাধন ভক্তি কি?

মহা।—রসিকশেখর প্রেমময় শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ করিবার এবং প্রেম ভক্তি লাভ করিবার যে উপায় তাহাই সাধন ভক্তি এই সাধন ভক্তি বহু প্রকারের আছে।

নলিনী।—প্রভো! আমার মনে একেবারে কতকগুলি প্রশ্ন উঠিতেছে, ভয় হয় শেষে সে গুলি জিজ্ঞাসা করা না হয়, তাই ক্রম ভঙ্গ করিয়াও দুই একটী কথা বলিব, আপনি এক্ষণে সংক্ষেপে আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন পরে সুযোগ মত আপনার কৃপা হইলে বিস্তারিত ভাবে শুনিব।

মহা।—বৎস। তোমার মনের ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াছি যখন যে ভাবের প্রশ্ন তোমার মনে উঠিবে তুমি তাহাই নিঃসঙ্কোচে আমায় বলিবে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যাহা জানি তোমাকে বলিব।

নলিনী।—আপনার সুমধুর আশ্বাস বাক্যে নির্ভয় হইলাম, এক্ষণে দয়া করিয়া বলুন, প্রেম কি?

মহা।—বৎস! প্রেম যে কি তা[illegible] শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা বলিতে হয় তবে এই বিষয় লইয়াই বহু সময় বলিতে হয়, কোন ভাবুক কবি বলিয়াছিলেন—

প্রেম প্রেম সবে বলে প্রেম জানে বা কে।
আপনারে ভুলেছে যে প্রেম জেনেছে সে॥

প্রেম মহাশক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ নিত্য আনন্দময় স্বভাব। এই প্রেম—পরতত্ত্ব একবার উপলব্ধি হইলে তাহার আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, প্রেম এমনই সুধা-মধুর যে, জীব যদি বহু পুণ্য ফলে সৎ-গুরুর কৃপায় একবার ইহার আস্বাদ পায় তাহা হইলে জাগতিক সমুদায় পদার্থই তাহার নিকট এক নূতন ভাবে প্রতিফলিত হয়। তখন স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা সমস্তই সেই প্রেমময়ের মধুর ভাব জাগাইয়া দেয়; তাই শাস্ত্রকারগণ প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন. প্রেমের সুমধুর নিত্য-উৎস দায়িনী রসময়ি অন্তরঙ্গা শক্তিতে তারতম্যানুসারে গোলক হইতে মায়া সাধিত এই ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত বিমোহিত এমন কোন স্থান বা এমন কোন বস্তু নাই যাহা এই প্রেমের বিধানান্তর্গত নহে। আর এই মহাশক্তি সম্পন্ন শুদ্ধ সত্ত্বময় প্রেমের আকরও একমাত্র শ্রীভগবান ভিন্ন আর কেহ নয়।

কীট পতঙ্গ হইতে জীব শ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত সকলেই এই প্রেমের জন্য লালায়িত, জাগতিক ব্যাপারেও আমরা দেখিতে পাই, কৃপণ ধন ভালবাসে, কামুক তদুপযোগি কার্য্য ভালবাসে; কেন ভালবাসে তাহা যদি অনুসন্ধান কর বুঝিতে পারিবে ঐ ধন ভালবাসিয়া বা কামনা চরিতার্থ করিয়া কৃপণ বা কামুক যে জাতীয় সুখ পায় তাহাও ঐ আনন্দেরই অন্তর্গত। তবে এ আনন্দ খণ্ড আর সে আনন্দ পূর্ণ এ আনন্দে নিজ সুখ বাঞ্ছা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান আর সে আনন্দ ভগবৎ প্রীত্যর্থে। এই আনন্দের তারতম্য অবগতির জন্যই সদ্‌গুরুর আশ্রয় আবশ্যক। শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

নলিনী।—প্রভো! এই যে প্রেমের কথা বলিতেছেন, আমাদিগের ন্যায় কামনা কলুষিত চিত্তে এই প্রেমের বিকাশ হওয়া কি সম্ভব? আর যদিও হয় তাহার উপায়ই বা কি? দয়া করিয়া বলুন।

মহা।—বৎস! প্রেম স্বতঃ প্রকাশক। জোর করিয়া প্রেম জন্মান যায় না। শ্রীচরিতামৃতেই উক্ত হইয়াছে,—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

চিত্ত শুদ্ধ হইলে, হৃদয়ের মলিনতা দূর হইলে প্রেম আপনিই প্রকাশ হয়, এই কলিযুগের কলুষিত জীবের জন্য পরম কারুণিক শ্রীভগবান অতি সুন্দর ভাবে প্রেম প্রকাশের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবের দুঃখে কাতর হইয়া, যাগ যজ্ঞ ধ্যান ধারণাদি কঠোর সাধনায় অক্ষম জানিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চিত্তশুদ্ধি এবং প্রেম লাভের উপায় বলিয়াছেন—

"নাম সাধ নাম চিন্ত নাম কর সার।
নামেই পাইবে প্রেম যাইবে বিকার॥"

ভক্ত হরিদাসও নামের মহিমা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়"

এখন বুঝিলেত যে, এই ঘোর কলিকালে একমাত্র অকপট নাম সাধনার দ্বারাই প্রেম লাভ হইয়া থাকে। এই তত্ত্ব জীবের অগোচর ছিল, তাই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ প্রেমময়ী রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া নদীয়ায় গৌরাঙ্গ হইয়াছেন। বৈষ্ণব কবি নরহরি অতি সুন্দর একটী পদে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই বলিয়া মহাপুরুষ তাঁহার বীনাবিনিন্দিত প্রেম-কণ্ঠে সুর করিয়া গাহিতে লাগিলেন।—

"যদি গৌরাঙ্গ না হ'তো কি মেনে হইতো
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ ভব সাগরে এমন দয়াল
না দেখিয়ে একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া
কেমনে ধরিনু দে।
নরহরি হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে॥"

এইখানে আবার একটী অপূর্ব্ব সমাবেশ হইল পাঠকগণকে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা হইল না তাই সে আনন্দ সংবাদ পরিবেশনের জন্য কিছু সময় উভয়ের কথোপকথন বন্ধ রাখিতে হইল।

মহাপুরুষ যখন প্রেম গদগদ কণ্ঠে উপরোক্ত পদাবলীটী গাহিতে ছিলেন সেই সময় কোথা হইতে একটী ভেকধারী বৈষ্ণব সেথানে উপস্থিত হইলেন, মহাপুরুষ যেমন কীর্ত্তন বন্ধ করিলেন অমনি বাবাজী মহাশয় মধুর সুরে করতালি বাজাইয়া গাহিলেন—

"এ মন! শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম বলি নাম অতি অদ্ভুত শ্রুত হৈত কার কাণে॥
শ্রীকৃষ্ণ নামের স্বগুণ মহিমা কেবা জানাইত আর।
বৃন্দা বিপিনের মহা মধুরিমা প্রবেশ হইত কার॥
কেবা জানাইত রাধার মাধুর্য্য রস যশ চমৎকার।
তার অনুভব সাত্বিক বিকার গোচর ছিল বা কার॥
ব্রজে যে বিলাস রাস মহারাস প্রেম পরকিয়া তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা ব্যভিচারী সীমা কার অবগতি ছিল এত॥
ধন্য কলি ধন্য নিতাই চৈতন্য পরম করুণা করি।
বিধি অগোচর যে প্রেম বিকার প্রকাশে জগত ভরি॥
উত্তম অধম কিছু না বাছিল যাঁচিয়া দিলেন কোল।
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গ অন্তরে ধরিয়া বোল॥"

কীর্ত্তন শেষ হইলে বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে মহাপুরুষকে বলিলেন,—"প্রভো! গৌরাঙ্গ গুণ যদি কোটী কোটি জন্ম গাহিয়াবেড়াই তথাপিও সাধ মিটে না। এক্ষণে আপনি কিছু বলুন" মহাপুরুষ দেখিলেন নলিনী কান্তের মত শ্রোতা আরও একটী জুটিল, তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত বলিলেন—

বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার॥"

এই বলিয়া নলিনীকান্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বৎস। প্রেমের কথা বলিতে গেলেই আমার প্রেমময় ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের কথা আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে; এ কথা শেষ হইবার নয়, যত বলিবে ততই বলিবার স্পৃহা জাগরুক হইবে আমি যত দূর তোমাকে বলিলাম তাহার মধ্যে তোমার কিছু ব্যক্তব্য আছে কি?

নলিনী।—প্রভো! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এই যে আপনি শুদ্ধ সত্ত্বময় নিরুপাধি প্রেমের কথা বলিলেন ইহার দ্বারাই কি শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থির হয়?

মহা।—না, এই নিরুপাধি প্রেম ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতে পারে না। কেননা, সম্বন্ধ বুদ্ধি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বিবর্জ্জিত, যেখানে সম্বন্ধ আছে সেখানে অনন্ত ঐশ্বর্য্য থাকিলেও পরস্পর মাধুর্য্যেরই প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রেম কখনও ঐশ্বর্য্য আস্বাদন করিতে জানে না, মাধুর্য্যই একমাত্র প্রেমের দ্বারা আস্বাদিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করে। অতএব যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, যিনি অসমোর্দ্ধ মাধুরি সম্পন্ন হইয়া অনন্ত কোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন তিনি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বিবর্জ্জিত শুদ্ধ সত্ত্ব ভক্তের একমাত্র উপাস্য এবং সেব্য। এ সকল কথা বুঝিতে বোধ হয় তোমার কষ্ট হইতেছে, তুমি যদি কিছুদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা কর তাহা হইলে এ সব বিষয় সহজেই বুঝিতে পারিবে।

নলিনী।—প্রভো! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, আমি তাহাই করিব, তবে আপনার দর্শন আবার কখন কোথায় পাওয়া যাইবে দয়া করিয়া বলিয়া দিন।

মহা।—বৎস! আমার দেখা কোথায় পাইবে তাহার মোটেই ঠিক নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় তোমার প্রয়োজন মত উপদেষ্টা জুটিয়া যাইবে, তুমি কিছু দিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র আলোচনা ব্যপদেশে শ্রীগ্রন্থ নিচয় আলোচনা কর,

তারপর একবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাভূমি শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীপুরীধামে যাইবে, ঐ দুই স্থানের কোথাও না কোথাও আবার তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইবার বাসনা রহিল।

নলিনীকান্ত ও বাবাজী মহাশয় রাত্র অধিক হইয়াছে দেখিয়া আর কিছু না বলিয়া মহাপুরুষকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি ক্রমে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন।

বলাবাহুল্য সেই দিন হইতেই নলিনীকান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিহ্নিত সেবক হইয়াছিলেন। এবং নিষ্ঠা পরায়ণ চিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। নলিনীকান্তের শেষে কি ভাব হইয়াছিল তাহা সময়ান্তরে প্রকাশের বাসনা রহিল।

পথের কাঙ্গাল।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।)

(১৩—তোমায় যেন ভুলি না। অবশিষ্টাংশ।)

—:•:—

এইরূপে জীবনে যখনই যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই মনে হয় যেন তুমি সর্ব্বত্র বিরাজমান, মনে হয় যেন তুমি গুরু রূপে পরিচালক রূপে, শিক্ষক রূপে নয়নে নয়নে প্রত্যক্ষ রহিয়াছ। যখন পথে চলি তখন মনে হয় যেন তুমি সহাস্য বদনে সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছ—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" যখন সংসর্গ দোষে নিজেকে ভুলিয়া—অবনতির দিকে যাইতে থাকি তখন মনে হয় তুমি যেন ঊর্দ্ধলোক হইতে উচ্চৈস্বরে বলিতেছ—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানং অবসাদয়েৎ।" যখন সামান্য মাত্র বাহ্যিক আনন্দের মোহে মোহিত হই তখন যেন তুমি গম্ভীর স্বরে বলিতেছ—"ভাবে থাক ভাব না ছুটিবে" আবার সামান্য কারণে ম্রিয়মান হইলে তুমি যেন কাণে কাণে বলিতে থাক—"ভাবে থাক ভাবনা ঘুচিবে।" যখন চিত্ত চঞ্চল হয়, মন অস্থির হয়, সংসার মধ্যে পড়িয়া চারিদিক

অন্ধকার দেখি তখন যেন তুমিই তোমার ভাবে বিভোর করিয়া বলিবার শক্তি দাও, তখন যেন তোমার ভাবে বিভোর হইয়াই বলিতে থাকি—

"দাও অন্তর অভয় দাতা তুমি গুরু তুমি ত্রাতা
তুমি বন্ধু তুমিই সহায়।"

দয়াল প্রভো! তোমার এত করুণা এও কি ভোলা যায়? তবু অঘটন ঘটন পটিয়সি মায়ার ভয়ে ভীত হইয়া বলিতেছি, প্রভো! দেখো যেন তোমার এক মুহূর্ত্ত ও ভুলিয়া থাকিনা।

১৪—অবহেলে।

পথের কাঙ্গাল ব'লে, আমায় তারা অবহেলা ক'রে;—যারা বড় লোক, যারা দেহটাকে কেবল পয়সা উপায়ের কল বলে মনে ক'রে,—তারা! তারা আমায় অবহেলা ক'রে;—যারা কেবল আপনাদের প্রাণ, আপনাদের শরীর, আপনাদের অভাব-অভিযোগ—এ ছাড়া জগতে আর কেহ আছে কি না, আর কারো কিছু আছে কি না—এ কথা ভাব্‌তে পারে না—বুঝেও বুঝেনা—জেনেও জানে না—তারা আমায় অবহেলা করে। তাতো করবেই—তাই তো কবি বলেছেন:—

"চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যে জ্বালা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশী বিষে দংশেনি যারে॥
যত দিন ভবে না হবে না হবে
তোমার অবস্থা আমার মত।
দেখে না দেখিবে, জেনে না জানিবে
শুনে না শুনিবে অভাব ক'ত॥"

তাই তারা আমায় অবহেলা করে। তা করুক্ তাতে দুঃখ নাই—কিন্তু বলি এই যে, আমায় অবহেলা ক'রে যদি তোমাদের সুখ হয়, আমায় অবজ্ঞা ক'রে

যদি তোমাদের আনন্দ হয়, আমায় অপমান করে যদি তোমাদের শান্তি আসে —তা আসুক—আমি নতশিরে আজীবন তোমাদের সকল বিরাগ বহন করিব।

কিন্তু তা হয় কই ?—শুধু কাঙ্গাল নিরীহকে নিপীড়িত করে তোমাদের তো সুখ হয় না—তোমাদের প্রাণের জ্বালা তো নেভে না—আকাঙ্ক্ষা তো মেটে না—। ওগো ধনী, ওগো বড় লোক, ওগো নরাকারে জীব বিশেষ—তোমাদের সকলকে বাসনা যে বেড়ে চলেছে—বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ বছরের ভিতর যে তোমার দৌড় ফুরিয়ে যেতে পারে—সে কথা যে একেবারে ভুলে গিয়েছ। তাই না—জাঁকের উপর জাঁক—হাঁকের উপর হাঁক—ডাকের উপর ডাক বাড়িয়ে দিয়ে—ফাঁকতালে আসর জমাবার চেষ্টায় আছ। ভাবছো তুমি বড় সেয়ানা— "তোমরা মাফিক্ জোড়া—কোহি না মিলে।"

আর এদিকে যে নাটক নিত্য অভিনীত হচ্ছে—যবনিকা অন্তরালে যে দৃশ্য জলজলে হয়ে রয়েছে—তার কি ? কত অসহায়া রমণীর বুক-বেঁধা দীর্ঘশ্বাস— কত অনাথের কাতর চোখের, গরম গরম, ফোঁটা ফোঁটা জলধারা, কত দরিদ্র, নিঃস্ব—কাঙ্গালের মর্ম্মবেদনা ও হা হুতাশ, এ সবের কি হবে ? ওগো ধনী! তোমার বৈঠকে হা-হা-হি-হি—অট্টহাসে এসব কি থেমে যাবে ? তোমার ক্ষুদ্র প্রভুত্ব প্রভাবকে এরা বড় বলে ঠাওরাবে ? এরা যে আকাশের দিকে চেয়ে আছে—সে অনন্ত আকাশ যে অনেক উচু—অসীম। আর তুমি যে সাড়ে তিন হাত মাত্র—নশ্বর।

পথের পাশে, কাঙ্গালের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে এমনি একটা ভাব যেন দার্শনিকের মনে জেগে ওঠে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে—যেন এই ভাবও সে হৃদয়কে অভিভূত করে যে, "আমায় কাঙ্গাল ক'রে দাও হে প্রভু! কাঙ্গাল করে দাও।" আমি বিশ্বের মাঝে সবার চোখে নিঃস্ব ব'লে পরিচিত হই— সকলে আমায় অবহেলা করুক্—আমার কেহ নাই—কিছু নাই বলে লোকে আমায় পায়ে ঠেলুক—আর যেন আমি কেবল ঐ আকাশের পানে চেয়ে—ঐ অনন্তের দিকে লক্ষ্য করে বলতে পারি—

"যার কেহ নাই—আছো তুমি তার।"

থাকি—আমি এই ভাবেই থাকি—পথের পাশে প'ড়ে, অবজ্ঞা অবহেলার পাত্র হ'য়ে আমি এই ভাবেই প'ড়ে থাকি।—আমায় দেখে যদি কারো কোন দিন

মনে পড়ে যায় যে তাহারা যাকে অবহেলা ক'রে এসেছে—সেতো তাহাদের মত অশ্রদ্ধা নিয়ে বসে নাই—। যদি তাদের কোন দিন মনে পড়ে যায়, তারা যাকে অবজ্ঞা ক'রে, তারা যাকে ডাকে না— সে যে সদা তাহাদের পাছে পাছে র'য়েছে। যদি কোন রকমে তারা একবার বুঝ্‌তে পারে যে, তাদের প্রভুত্ব অপেক্ষা এমন শক্তি আছে—যাতে ক'রে কাঙ্গালকেও সান্ত্বনা দিতে পারে। তাই বলি, "আমায় কাঙ্গাল ক'রে রাখ প্রভু। কাঙ্গাল ক'রে রাখ।"

শুধু আমার জন্য নয়, সারা জগতের জন্য আমায় কাঙ্গাল ক'রে রাখ প্রভু, কাঙ্গাল ক'রে রাখ। যারা নিঃস্ব—তারা স্বস্ব ভাবে ভাবিত হউক—যারা বিত্তমান—তারা চিত্তবান্ হউক। কাঙ্গাল অবহেলা পাইয়া—দুঃখ পাইয়া—কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাঙ্গা গলায় প্রার্থনা করুক ;—আর ধনী, নিপীড়িত করিয়া, প্রভুত্ব চালাইয়া,—যথেচ্ছাচার করিয়াও—শান্তির অভাবে অশান্তির জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে নিভৃতে, নির্জ্জন-কক্ষে মুদিত চক্ষে নীরবে নয়ন ধারায় দেহ সিক্ত করিয়া, আকুল প্রাণে গুমরিয়া উঠুক :—

"চির আদরের বিনিময়ে সখা
চির অবহেলা পেয়েছ।"

হায়! হায়!—কাঙ্গাল ভাব্‌ছে—"হায়। হায়। ঠাকুর তুমি এমনি ক'রে এদেহ গড়েছ, এমনি করে এদেহে এসেছো যে—

"চির আদরের বিনিময়ে সখা
চির অবহেলা পেয়েছ।"

আর, ধনী ভাব্‌ছে যে "হায়। হায়! আমার প্রভুত্ব তো শেষ হ'য়ে এলো। কত কি করেছি কত কি ব্যাথা দিয়েছি—এত যথেচ্ছাচারেও তো শান্তি পেলাম না। কিন্তু ঐ পথের কাঙ্গালতো আমার চেয়ে ভাল, শীত নাই গ্রীষ্ম নাই—মান-অভিমান নাই—সকল অবস্থায় সমান ভাবে র'য়েছে—। সাধ হয়, একবার যদি ছুটে যেতে পারি, তবে ওর কাণে কাণে গিয়া বলি—

"চির আদরের বিনিময়ে সখা
চির অবহেলা পেয়েছ।"

আসে, এমন এক দিন আসে, যখন দুই দিক্ দিয়া দুই জন একই ভাবে ভাবিত হইয়া—তদ্‌গত তন্ময় হইয়া উঠে ;—মর্ম্ম বেদনায় তাড়নে যেন কিসের

অঙ্গ, কোন্ অদৃশ্য চৈতন্য শক্তির জন্য কাতর হইয়া উঠে। তখন সেই কাতরতার, সেই আকুলি ব্যাকুলির মাঝে কেমন করিয়া কি জানি কোন্ অলক্ষ্য সূত্র অবলম্বনে—তাদের হৃদয়ে পরশ-মণির—পরশ হইয়া যায়। ধন্য তাহারা যাহারা এ ভাবের বশে আসে, সার্থক তাদের জীবন, যারা এ ভাবের ভোরে থাকে ; আশ্রিত তাহারা যাহারা এ ভাবে শরণাগত হইতে পারে।

এম্নি করে, কাঙ্গাল যখন পরম ধনে ধনী হয়—আর পার্থিব ধনী যখন আপনাকে কাঙ্গাল অপেক্ষা নিঃস্ব মনে করে—তখন যে প্রার্থনার মৃদু ঝঙ্কার আপনা-আপনি উত্থিত হয়—প্রতিদিন, প্রভাতের নব-রবি রাগ সঞ্চারের ন্যায় তাহা যেন প্রাণে প্রাণে অনুপ্রাণিত হয়—জগতের নর-নারী যেন নিত্য সে স্বর-লহরীর তালে তালে প্রতিধ্বনি করিতে থাকে :—

"আমিতো তোমারে চাহিনি জীবনে
　　তুমি অভাগারে চেয়েছো—
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে
　　নিজে এসে দেখা দিয়েছো ॥
চির আদরের বিনিময়ে সখা
　　চির অবহেলা পেয়েছো
আমি দূরে চলে যেতে দু'হাত পসারি
　　ধরে টেনে কোলে নিয়েছো ॥
ও পথে যেওনা ফিরে এসো বলে
　　কাণে কাণে কত বলেছো।
আমি তবু চলে গেছি ফিরায়ে আনিতে
　　পাছে পাছে ছুটে গিয়েছো ॥
চির অপরাধী পাতকীর বোঝা
　　হাসি মুখে তুমি বয়েছো।
আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে
　　বুকে ক'রে নিয়ে রয়েছো ॥"

"সুদামা রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন।"

(লেখক—শ্রীযুক্ত সত্য চরণ চন্দ্র, উকীল।)

—:০:—

ভাগবতবৃন্দ। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম পাঠ করিয়াছেন। এই অষ্টোত্তর শত নামের মধ্যে "সুদামা রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন" এই চরণটি দৃষ্ট হয় এবং ইহা ভক্ত পরিবারে সততই প্রবচন স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অদ্য আমরা এই সুদামা ও তাঁহার দারিদ্র্য-ভঞ্জনের আখ্যায়িকাটি সংক্ষেপে পাঠকগণকে উপহার দিব। ইহা পাঠ করিলে দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে একাগ্র ভক্তি রাখিলে অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। এই প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতেরদশম স্কন্ধের অশীতিতম অধ্যায়ে ও শ্রীভক্তমাল' গ্রন্থের চতুর্থ মালায় অল্পস্বল্প রূপান্তরিত ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উজ্জয়িনীর অন্তঃপাতী অবন্তি নগরে শ্রীদাম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সচরাচর লোকে ইহাকে সুদামা বলিয়াই আহ্বান করিত। তদনুযায়ী আমরাও ইঁহাকে সুদামা নামেই অভিহিত করিব। ইঁহার আর্থিক অবস্থা অতিশয় মন্দ ছিল। বাল্যকালে ইনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত উক্ত অবন্তি নগরস্থিত সান্দীপনী মুনির পাঠশালায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। অধ্যয়ন কাল হইতেই ইনি সংসারে বৈরাগ্য প্রদর্শন এবং বিবাহ করিবেন না এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। পরন্তু বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধান অনুসারে পাঠ সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণের বিবাহ হইয়াছিল।

বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণ সংসারী হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জন আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সারাদিনের পর ক্ষেত্র হইতে শাক তুলিয়া আনিতেন এবং সেই শাক সিদ্ধ করিয়া তাহাই শ্রীগোবিন্দকে নিবেদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সন্তুষ্ট চিত্তে প্রসাদ পাইতেন। শাকে লবণ জুটিত না। অলবণ শাকই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতেন এবং সেই অলবণ শাক প্রসাদই উভয়ে সেবা করিয়া পরমানন্দে দিনপাত করিতেন।

সুদামা দরিদ্র হইলে কি হয়, শ্রীগুরুকৃপায় শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। বেদ বেদান্ত দর্শন ন্যায়াদি কিছুই তাঁহার অবিদিত ছিল না। ফলে শ্রীভগবানের উপর তাঁহার একান্ত নির্ভর ছিল। এতাদৃশ সাংসারিক কষ্ট থাকা সত্বেও তিনি কদাপি কাহারও দ্বারস্থ হইয়া উদর ভরণের জন্য যাচ্ঞা করিতেন না। একান্ত মনে শ্রীহরির শ্রীচরণ পঙ্কজের দিকেই চাহিয়া থাকিতেন। "তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক তাহাতে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কি?"—ইহাই তাঁহার মনোবৃত্তি ছিল।

অশন সম্বন্ধে যাঁহাদের এরূপ দুরবস্থা, বসন সম্বন্ধে যে তাঁহাদের সচ্ছলতা থাকিতেই পারে না তাহা আর বলিতে হয় না। বসনের মধ্যে তাঁহাদের গৃহে সর্ব্বসমেত তিন খণ্ড মাত্র চেল ছিল। এক খণ্ড ব্রাহ্মণ পরিতেন ও এক খণ্ড ব্রাহ্মণী পরিতেন, আর এক খণ্ড ব্রাহ্মণী বক্ষে আচ্ছাদন দিতেন।

এইরূপে দিন যায়। এক দিন ব্রাহ্মণী আপন স্বামীকে বলিলেন "শুনিয়াছি তোমার অধ্যয়ন-সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাকি দ্বারকায় বাস করেন? একবার তাঁহার নিকটে যাও না? তাহা হইলে আমাদের দুঃখের অবসান হইবে। আর যদি সেখানে যাইয়াও কিছু ধন না পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিব যে, আমাদের কপালের লিখন আর কিছুতেই খণ্ডিত হইবার নহে।"

সুদামা এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন "ভাল বলেছ, আমার এ কথা আদৌ স্মরণই ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ গুরু গৃহে আমাকে সখা বলিয়া ডাকিতেন বটে। তিনি এখন দ্বারকার রাজা। আমি নিশ্চয়ই তথায় যাইব। ধন না পাই—নাই পাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনত লাভ হইবে? কিন্তু প্রিয়ে! এত দিনের পরে সখার নিকটে যাইব, কিছু মিষ্ট দ্রব্য লইয়া যাওয়া উচিত নয় কি? রিক্ত হস্তে কিরূপে যাই বল?"

পতির গমনেচ্ছা শ্রবণে ব্রাহ্মণীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি বলিলেন "আচ্ছা আমি কিঞ্চিৎ ভোজ্যোপহার সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি তুমি তাই লইয়া যাও।" বলিয়া ব্রাহ্মণী ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। প্রথম যে বাড়ীতে গেলেন সেই গৃহস্থের সে দিন গৃহে কিছুই ছিল না। অনেক অন্বেষণ পূর্ব্বক এক মুষ্টি চিড়ার ক্ষুদ আনিয়া ব্রাহ্মণীকে ভিক্ষা দিলেন। আর দুইটী বাড়ীতে ব্রাহ্মণী গিয়াছিলেন তথায়ও আর দুই মুষ্টি ঐরূপ চিপীটকের ক্ষুদ পাইলেন।

এই তিন মুষ্টি চিপীটক-কণা লইয়াই ব্রাহ্মণী গৃহে ফিরিলেন। এবং ব্রাহ্মণকে সেই তিন মুষ্টি ক্ষুদ দিলেন। কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যান এমন আর কোন বস্ত্র খণ্ড গৃহে নাই; সুতরাং সুদামা বিপদে পড়িলেন। নিজের পরিধেয় চেল খণ্ডের এক কোণে বন্ধন করার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে গ্রন্থি দিতে কুলাইল না। কাজেই পুনরায় ব্রাহ্মণীকে জানাইতে হইল। ব্রাহ্মণী নিজের বক্ষাবরণটী খুলিয়া দিলেন, বলিলেন "ইহাতেই বাঁধিয়া লইয়া যাও।" সুদামা তাহাই করিলেন।

কক্ষদেশে ক্ষুদের পুঁটুলীটী রাখিয়া তদুপরি চেল খণ্ড আচ্ছাদন দিয়া শ্রীহরি-স্মরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারকা যাত্রা করিলেন। পথে যান আর ভাবেন "ভাইত! বহু দিন পরে যাইতেছি। আমি কাঙ্গাল, আর তিনি রাজা;—যা সেই গুরু গৃহের আলাপ! তিনি কি এখন আর আমাকে চিনিতে পারিবেন।" "তিনি কি আমায় কৃপা করিবেন?" এই কথা বারংবার তোলাপাড়া করিতে করিতে চিন্তিত অন্তঃকরণে সুদামা পথ চলিতে লাগিলেন। আবার ভাবিতেছেন "সখার পুরী কোন্‌টী তাহাত চিনি না। এত পরিশ্রম করিয়া আসিলাম, ধন না পাই ক্ষতি নাই, কিন্তু একবার দর্শনটীও যদি পাই তবেই শ্রম সফল হয়।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে "কৃষ্ণ হে।" "কৃষ্ণ হে।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। ক্রমে সুদামা দ্বারকা নগরে উপনীত।

এদিকে অন্তর্য্যামী ভক্ত-বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই জানিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন "আমি বহির্দ্বারে দাঁড়াই গিয়া, নচেৎ অন্বেষণে সখার বড়ই ক্লেশ হইবে।" যে সঙ্কল্প সেই কাজ। দরিদ্র বাল্য সখা সুদামার জন্য আজ স্বয়ং শ্রীভগবান সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান। আহা! কি আশাপ্রদ ভক্ত-বৎসলতা!

দ্বারকা, শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। তাহার বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিয়া দীনহীন সুদামার অন্তরে আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। "হায়! হায়! এখানে আমার কথায় কে কর্ণপাত করিবে? কে আমায় বলিয়া দিবে সখার প্রাসাদ কোন্‌টী!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রতি অট্টালিকার তোরণ-দ্বার পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে সুদামা যাইতেছেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ বাল্য-সখাকে দেখিবা মাত্র সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মহিষী রুক্মিণীকে সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে বারি আনয়ন করিতে আদেশ

দিলেন। আজ্ঞাকারিণী শ্রীরুক্মিণীদেবী বারি আনয়ন করিতে গেলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ পুরাতন সখাকে লইয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন।

সুদামা বসিলেন। শ্রীভগবান ভূমিষ্ঠ হইয়া ব্রাহ্মণের পদতলে প্রণিপাত করিলেন। এমন সময়ে শ্রীরুক্মিণীদেবী বারি আনিলেন। ভগবান বলিলেন "প্রিয়ে! তুমি জল ঢালিয়া দেও আর আমি সখার দুটী পাদপদ্ম প্রক্ষালন করি।" এইরূপে স্বহস্তে সুদামার পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রীহরি স্বীয় পীতাম্বর দ্বারা তাহা মুছাইয়া দিলেন। পরে সেই পাদোদক আপন মস্তকে ধারণ করিলেন, রুক্মিণীর মস্তকে দিলেন এবং প্রাসাদের অভ্যন্তরে সেই পাদোদকের ছিটা দিলেন।

পাদ্য প্রদান শেষ হইলে অর্ঘ্য, অগুরুচন্দন সখার অঙ্গে লেপন পূর্ব্বক সস্ত্রীক তাঁহার পদ সেবা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীরুক্মিণী দেবীকে আদেশ করিলেন "সখার শ্রমাপনোদন জন্য চামরের বাতাস দেও।" তদনুসারে শ্রীরুক্মিণীদেবী চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ নানা মিষ্ট রস চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্ব্বিধ খাদ্য আনাইয়া সখাকে সেবা করিতে বলিলেন। সুদামা পরম সুখে আহার করিলেন। আহারান্তে শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁহাকে তাম্বুল আনিয়া দিলেন এবং পালঙ্ক উপরে শয়ন করাইলেন। গৃহে ধূপ দীপ জ্বালিয়া দিলেন ও সখার অঙ্গে কুঙ্কুম চন্দন লেপন করিলেন। অতঃপর শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁহার পদ সেবা করিলেন এবং শ্রীরুক্মিণীদেবী চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরুক্মিণীদেবী সেই ব্রাহ্মণের দীন দুঃখীর বেশ দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আপন প্রভুকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে কোন উত্তর না দিয়া আপন সখাকে গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আরও প্রশ্ন করিলেন "সখা গুরু গৃহে যখন উভয়ে একত্রে পড়িতাম তখন তুমি বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে; এক্ষণে বিবাহ করিয়াছ কি না বল?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "হাঁ, বিবাহ করিয়াছি।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "উত্তম করিয়াছ, প্রিয়া পতিব্রতা ত? কেমন সেবা আদি করেন?" সুদামা বলিলেন "হাঁ, উত্তম সেবা করেন।"

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "সখে! গুরু-গৃহের কথা মনে আছে কি? সেই এক দিন আমাদের গুরু পত্নী কাষ্ঠ আহরণ করিতে বলায় আমারা বনে

গিয়া ইন্ধন সংগ্রহ করি কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় গৃহে ফিরিতে পারি নাই। সন্ধ্যায় গুরুদেব গৃহে আসিয়া ঐ সংবাদ শ্রবণে আপন ভার্য্যাকে ভৎ'সনা করেন। পর দিন প্রত্যূষে গুরুদেব আমাদের অন্বেষণ করিতে আসিতেছেন, এমন সময়ে আমরাও কাঠ লইয়া গৃহে ফিরিতেছি পথে দেখা হয়। তাহাতে গুরুদেব অনেক ক্রন্দন পূর্ব্বক শেষে বলেন "তোমাদের আর পড়াশুনা করিতে হইবে না। আমার আশীর্ব্বাদে সকল শাস্ত্রই তোমাদের আয়ত্ত হইবে। আজ হইতে তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন কর।"

তখন সুদামা কান্দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "হাঁ সখা, সকলই মনে আছে। আজি আমার জন্ম সফল হইল, তোমার দর্শন পাইলাম!" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "সখে! এতদিন পরে আসিলে, আমার জন্য কি আনিয়াছ বল।" সুদামা মনে মনে বড়ই চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন "ইনি দ্বারকার অধিপতি আমি কেমন করিয়া ইঁহাকে চৌড়ার ক্ষুদ প্রদান করি। দেওয়া দূরে থাক্, ইঁহাকে তাহা দেখাইতেও পারিব না।"

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া শ্রীভগবান বলিলেন "ঐ যে তোমার কক্ষদেশে কি রহিয়াছে?" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামা ইতস্ততঃ করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীভগবান তাহা কাড়িয়া লইয়া এক মুষ্টি চিপিটকের ক্ষুদ ভোজন করিলেন, এবং বলিলেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" গীতা ৯ম ২৬।

বলিতে বলিতে এক মুষ্টি শ্রীরুক্মিণীদেবীকে দিলেন। পুনর্ব্বার এক মুষ্টি লইতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় উত্তমাঙ্গে রাখিয়া বলিলেন,—

"মোর দিব্য যদি সখা পুন আর খাও।"

ব্রাহ্মণ সেই রাত্রটী তথায় পরমানন্দে যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে স্বভবনে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে শ্রীভগবানের মধুর ব্যবহার নিচয়ের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের মুখ বুক প্রেমাশ্রু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তিনি বিচার করিলেন "শ্রীভগবান বিবেকী। তিনি ধনীদিগের গর্ব্ব-জন্য নিপাত দর্শন করিয়া অবিবেকী ভক্তকে বিবিধ সম্পত্তি, রাজ্য ও বিভূতি দান করেন না।" এইরূপ বিচার পূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, পাছে আমি ধন পাইয়া শ্রীভগবৎ স্মরণে বিরত হই এই ভাবিয়াই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ধন দেন নাই। তিনি মঙ্গলালয় আমার মঙ্গলার্থই আমাকে নিঃস্ব করিয়া রাখিয়াছেন; মানুষ ভগবদনুরাগ লাভ করিয়া বিপুল বিত্তৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাঙ্গাল সাজে।—আর তিনিত আমাকে চির কাঙ্গাল সাজাইয়াই রাখিয়াছেন। ইহাতো আমার পরম সৌভাগ্যই বলিতে হইবে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ স্বগৃহ সমীপে উপনীত হইয়া দেখেন যে, তদীয় সেই জীর্ণ—পর্ণ কুটীরখানি সুরম্য হর্ম্ম্যে পরিণত হইয়াছে। তাহার চারিপাশে সুন্দর সরোবর ও উপবন, নানাবিধ জলচর বিহঙ্গ ও ফুলে ফলে শোভমান হইয়া বিরাজ করিতেছে।

ব্রাহ্মণ পত্নী মহানন্দে আপ্লুত হইয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। অকস্মাৎ গবাক্ষ দ্বার দিয়া তাঁহার জীবিতনাথকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বহির্দ্দিশে আগমন করিলেন। এবং প্রাণবল্লভের প্রতি শ্রীহরির এতাদৃশ কৃপা দর্শনেও সেই কৃপার মধ্যে প্রাণেশ্বরকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান হইয়া অবিরল প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবৎ সঙ্গ ও স্মৃতি প্রভাবে ব্রাহ্মণের হৃদয় পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। তিনি অল্পে অল্পে ত্যাগ অভ্যাস করতঃ অতি অনাসক্ত হইয়া নিজ পত্নীর সহিত সকল বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। এবং জনার্দ্দনে অতীব ভক্তিযোগ সহকারে সকল প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ভগবৎ প্রেমে নিমগ্ন হইলেন ও পরমানন্দে জীবন নাট্যের চরমাঙ্ক অভিনয় করিয়া স্বধামে গমন করিলেন।

আমার স্বপ্ন।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর।)

——:•:——

আমি যে সময়ে দেশ ভ্রমণে বাহির হই তখন পারস্য সাগরোপকূলে এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই। উপসাগরের উপকণ্ঠে একটী বৃহৎ জনপদ, নাম শুনিলাম "ভঞ্জপুর," ভজনপুরের অধুনা বাদ কাটছাট পড়িয়া ঐ "ভঞ্জপুরে" পরিণত হইয়াছে। গ্রামটীর বিচিত্রতা এই, কতকগুলি অধিবাসী দেখিলাম খুব প্রকাণ্ড ধনী, তাহাদের উচ্চ হর্ম্ম্যশ্রেণী মেঘ মণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, আবার ঠিক্ তাহার আশ পাশে বিস্তর জীর্ণ ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর অতি দুঃস্থ হতভাগ্য অধিবাসীর পরিচয় দিতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম গ্রামটীর অধিবাসিগণ সকলেই ধীবর জাতীয় এবং মূলে এক জনেরই বংশধর। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেথো পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা এক জনের সন্তান, অথচ কতকগুলি খুব ধনী আর কতকগুলি এতাদৃশ গরীব, ইহার কারণ কি? অথচ সকলেই দেখিতেছি সমব্যবসায়ী।

আমার কথা শুনিয়া পাণ্ডাজি মহারাজ হাসিয়া বলিলেন "ইহার মধ্যে অতি গুপ্ত রহস্য আছে। বৃত্তি এক হইলেও তাহার মধ্যে তারতম্য আছে।" * যদি ইহার ভেদ্ বুঝিতে চাও ঐ উপসাগরের তীরে চলো।" সেখানে যাইয়া দেখিলাম, ঠিক্ কথাই বটে, সকলেই সাগর জুড়িয়া জাল ফেলিতেছে, দড়াদড়ি টানিতেছে, অতল জলে ডুবিতেছে, ভাসিতেছে সাঁতার কাটিতেছে। পরিশ্রম সকলেই প্রায় সমান করিতেছে কিন্তু ফল ভয়ানক বিসদৃশ। কেহ কেহ বা দু'দিনেই লক্ষপতি হইতেছে আর কাহাদের বা পেটে অন্ন পরিধানে জীর্ণবাসও জুটিতেছে না। আর একটু ভিতরে যাইয়া দেখি যাহারা পুরুষানুক্রমিক প্রাচীন মাছ ধরা ব্যবসাই চালাইতেছে তাহাদেরই এই দৈন্যদশা,

---

* কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

আর তাহাদের মধ্যে যাহারা ভাগ্য ক্রমে জগদ্‌গুরুর কৃপায় মুক্তার আকরের সন্ধান পাইয়া সেই রত্ন লাভের জন্ত অসাধ্য সাধন করিতেছে তাহারাই দেখিতে দেখিতে আশাতীত মহামূল্য রত্ন লাভ করিয়া মহা ধনী হইতেছে। আমার বিস্ময় দেখিয়া পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন "অল্প দিন হইল ইহাদের মধ্যে এক অলোক সামান্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনিই এই দুর্লভ রত্নরাজি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন শুধু কেবল প্রকাশ নহে কিরূপে ঐ রত্ন লাভ করা যাইবে তাহারও কৌশল নিজে আচরণ করিয়া শিখাইয়া গিয়াছেন ইহাদের মধ্যে যাহারা সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধি সম্পন্ন কেবল তাহারাই তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিতেছে হাতে হাতে ফলও পাইতেছে।"

আমি।—এত নিকটে থাকিয়াও এই হতভাগ্যগুলা তাঁহার অনুবর্ত্তী না হইয়া এরূপে জীবন ব্যর্থ করিতেছে কি জন্য ?

পাণ্ডা।—উহাদের যে মহাজন-বাক্যে বিশ্বাস নাই, চোখে দেখিয়াও নির্ভর করিতে পারে না। এ কার্য্যে একজন কর্ম্মকুশল সুবিজ্ঞ কারিকরকে গুরু করিয়া তাঁহার উপর ষোলআনা আত্মসমর্পণ করিতে হইবে তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এবং হাত পা ছাড়িয়া সটান হইয়া তাঁহার চরণে পড়িলে তিনি তখন সঙ্গে থাকিয়া সব তন্ত্র মন্ত্র ভেদ রহস্য শিখাইয়া দিয়া থাকেন।

আমিও তাই দেখিলাম বটে, কতকগুলি যুবক তাহাদের গুরুদেবের চরণ ধূলি লইয়া এক এক ঝুড়ি সহিত লাফাইয়া পড়িল, অমনি অতলস্পর্শী সেই সমুদ্র-তলে যাইয়া পৌঁছিল, এবং গুরুদেবের উপদেশমত কৌশলে স্বল্পক্ষণ মধ্যে ঝুড়ি ভরিয়া শুক্তি তুলিতেছে, সঙ্কেত মাত্রই গুরুদেব উঠাইতেছেন। যাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন অনায়াসে তাহার শুক্তি মধ্যে মুক্তা লাভ হইয়া যাইতেছে আর যাহার কর্ম্ম বৈগুণ্য আছে তাহাকে অনেক বার ডুবা উঠা করিতে হইতেছে তবে কেহই একেবারে বিফল শ্রম হইতেছে না। যে শুক্তি লাভ হইতেছে তাহাতেও কিছু না কিছু লভ্য হইতেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে যাহারা সদ্‌গুরু আশ্রয় করিতে পারে-নাই, অনভিজ্ঞ ব্যবসাদারের হাতে পড়িয়াছে সে বেচারিরা বড়ই ভুগিতেছে বটে কিন্তু কাহার ভাগ্যে শুক্তিও মিলিতেছে না। কেবল জীবনান্ত খাটুনি হইতেছে, দেহ বক্র হইতেছে বা মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতেছে কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেরূপ

দুর্দ্দশাও বড় বেশীক্ষণ তাহাদের থাকিতেছে না সেই সকল হতভাগ্যগণের কষ্ট দেখিয়া কোথা হইতে অন্য * সদ্‌গুরু আসিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে। আমি চিরকাল পুরুষকারবাদী ছিলাম, অদৃষ্ট বড় একটা মানিতাম না, আজ এই ঘটনায় ভাগ্যকে অর্থাৎ ভগবদ্ করুণাকে মানিতে হইল। বুঝিলাম সাধু শাস্ত্র গুরুর উপদেশ অনুসারে প্রাণপণে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে ভগবদ্ কৃপা আপনি নামিয়া আসিয়া সাধককে কৃতার্থ করেন।

আমি হতবুদ্ধি হইয়া এই বিচিত্র নাট্যলীলা দেখিতেছি হঠাৎ পট পরিবর্ত্তিত হইল। তখন দেখি আমি শ্রীবৃন্দাবনে, কালীয়দমনের ঘাটে দাঁড়াইয়া। আর পূর্ব্ব কথিত পাণ্ডাজী আর কেহ নহেন আমাদের কালীদহের পরম ভজনানন্দী শ্রীল জগদীশ বাবাজী মহারাজ। তিনি উর্দ্ধবাহু হইয়া বলিলেন "বাপু হে। বিস্মিত হইও না, যাহা দেখিলে উহা এই প্রাকৃত জগতের উদ্ভ্রান্ত মানবের চিত্র। হতভাগ্য কলিহত জীবের প্রতি করুণা করিয়া স্বয়ং, ভগবান্ ব্রজেন্দ্র নন্দন অতি সুদুর্লভ স্ব-ভক্তি-রত্ন বিলাইবার জন্য শচী গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, নিজে আচরণ করিয়া সেই অপার্থিব প্রেম রত্ন লাভের কৌশল শিখাইয়াছেন অজস্র বাঞ্ছিত অমূল্য প্রেমধনে কত দীনহীনকে মহাধনী করিয়াছেন তবুও অবোধ মায়ামুগ্ধ জীব বুঝিয়াও বুঝিল না, তাঁহার সুনির্ম্মল ভক্তিযোগ আশ্রয় করিল না ঐ শুন অদূরে ঐ সমাজ বেদিকা হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের অপার কৃপালব্ধ মহা প্রবীন জ্ঞান-বৃদ্ধ প্রবোধানন্দ সরস্বতী জীবের এই দুর্গতি দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
সুপ্রকাশিত রত্নৌঘে যো দীনো দীন এবসঃ॥

ক্রমশঃ।

---

* গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্ত জনে॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

পাব কিনা চরণ তোমার।

তুমিহে আমার জীবন ধন তুমিহে আমার গতি।
আঁধার ঘরের মাণিক তুমি তুমিহে জগৎপতি॥

*   *   *   *

হৃদয় নিকুঞ্জ মাঝে ভুবন মোহন সাজে
এস নাথ। রাখিয়াছি পাতি সিংহাসন।
পাদ্য অর্ঘ্য তব তরে রাখিয়াছি যত্ন ক'রে
লহ দেব। দীন-দত্ত এই অশ্রু কণ॥
তন্ত্র মন্ত্র স্তব স্তুতি নাহি মোর ভাব ভক্তি
পুজিবারে তোমাধনে নাহি কিছু আর।
এক বিন্দু অশ্রুনীর লইয়া ক'রেছি স্থির
দিব ঢালি রাঙ্গাপায়ে এই উপহার॥
যাগ যজ্ঞ কিছু আর নাহি নিষ্ঠা উপাচার
করিবারে ওহে হরি তোমার সন্ধান।
কেবল দিবার সাধ্য জীবনে, আমার যোগ্য
নিরজনে "কৃষ্ণ" বলি আকুল আহ্বান॥
পথ ভ্রান্ত হ'য়ে আমি এসেছি হৃদয়-স্বামী
ল'য়ে শুধু অশ্রুকণা সম্বল এবার।
এ দীনের উপহার লবে কিনা লবে, আর
ভাবি শুধু "পাব কিনা চরণ তোমার॥"

আমার স্বপ্ন।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:•:—

গৌড় শৈলে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র উদিত হওয়ায় প্রেমের সাগর উদ্বেলিত হইয়া দিগ্ দিগন্ত ডুবাইয়া দিয়াছে এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তিরত্ন, বিভাব অনুভাবাদি ভাবরত্ন এবং হরেকৃষ্ণ নামাদি অমূল্য বস্তুরাজি যাহা এতদিন গুপ্ত ছিল তাহা সুপ্রকাশিত হইয়াছে তবু যাহারা সেই রত্ন পাইয়াও গ্রহণ করিতেছে না তাহারা প্রকৃতই—প্রকৃষ্টরূপে দীন।

প্রশান্ত মূর্ত্তি বাবাজী মহারাজ আবার বলিলেন "বৎস। ঐ শুন শ্রীশ্রীমদন-মোহনের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে যে সমাজ-বেদিকা রহিয়াছে তাহা হইতে মহাভাগবত, নিখিল শাস্ত্র নিষ্ণাত ভজনবৃদ্ধ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥

জ্ঞানমার্গে, কর্ম্মমার্গে ও যোগমার্গে কৃষ্ণ মিলিয়া থাকে কিন্তু তাহা বহুল ক্লেশ সাধন সাপেক্ষ আর তাহাতে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্যাদি লাভ হয় বটে কিন্তু ভক্তিযোগ সকলের চেয়ে সহজ সাধন অথচ প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশী।—

ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

অনুরাগীর প্রেম বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণই ভক্তের পিছু পিছু বেড়ান", বাবাজী মহারাজ আবার বলিলেন "বৎস, ঐ দেখ অদূরে শ্রীগোকুলানন্দের মঞ্চ হইতে পরম রসজ্ঞ পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন—

যানাশ্রায নরোরাজন ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নির্ম্মাল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্নপতেদিহ॥

হে রাজন্, মনুষ্য এই ভক্তি-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কখনই প্রমাদ গ্রস্থ হয় না, অধিকন্তু উহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে চোখ বুজিয়া ছুটিলেও পদস্খলন বা পতনের কোন সম্ভাবনা থাকে না।"

হটাং বায়সের কলকণ্ঠে চমকিয়া উঠিলাম, দেখিলাম আমি কুঞ্জঘাটার মণিকুঞ্জে শয়নে, আর বিশ্বম্ভর দাদা প্রভাতি সুরে গাহিতে গাহিতে গঙ্গা স্নানে চলিয়াছেন—

"রাধে জয় রাধে জয় বলিয়ে শারী নিধুবন ভরি আওয়াজে।
শারী বলে শুক তোমারে কহ কপোতে কিশোরী ভুবন জয়ী
কানু মনহরা রাধিকা সুন্দরী পরাভব রসরাজে॥
নীল ওড়নী ঘমটা টালনী কপোতে কিশোরী ভুবন জিনি
চরণে নুপুর বাজে সুমধুর রুনু ঝুনু ঝুনু বাজে।
আবির কুঙ্কুম পাশা জলকেলী, সেসব সমরে তব বনমালী
জিনিবারে নারে রাত পদ ধরে হারিয়াছে সখী মাঝে॥
নিধুবনে রাজা যে দিনে কিশোরী কেটাালিয়া কর্ম্ম ক'রেছিল হরি
দোহাই রাজার ব'লে বারেবার নিয়োজিত ছিল কাজে।
যে দিনে কিশোরী করেছিল মান দাসখৎ লিখে দিয়েছিল শ্যাম
তাহার সাক্ষী আছে জাননাকি নিধুবনে পিকরাজে॥
বৃন্দাবনের যত তরু পক্ষী লতা নিজ সমরূপ ক'রেছিল রাধা
তোমার নাগর হইয়া ফাঁপর লুকাইল সখী মাঝে।
শুক বলে শারী না কর দ্বন্দ্ব, দুই সমরূপ কে বলে মন্দ
জগদানন্দ সরস বিরাজে, রসবতী রসরাজে॥"

ঘুম ভাঙ্গিল, বিশ্বম্ভর দাদার প্রভাতি কীর্ত্তনকাণে গেল, উঠিয়া বসিয়া তখনও আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, ব্যাপার কি। মনে মনে স্বপ্নের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম, মনে করিলাম, রত্ন যেখানে আছে সেখানে ডুব্ দিলেইতো রত্ন লাভ হবে, এ আবার কি দেখিলাল, হটাং মহানুভব কিশোর দাসের একটী সঙ্গীত মনে পড়িল, তখন পরমানন্দে আমার ভাঙ্গা গলায় সেইটী গাহিতে গাহিতে বাহিরে গেলাম, গীতটী পাঠকগণকে উপহার না দিয়া পারিলাম না গীতটী হইতেছে এই—

শুধু ডুব্ দিলে কি রত্ন মিলে। (ডুবের মর্ম্ম না জেনে)
সে ভাগ্য যার নাই কপালে॥ (সাধু গুরু বৈষ্ণবের দয়া)
কেউবা ডোবে সাগর জলে রতন মাণিক পাবে ব'লে,
কারু ভাগ্যে শামুকগুগ্‌লি কেউ যায় কুম্ভিরের গালে,
ধনের আশায় প্রাণের আশা কেউ বিসর্জ্জন দেয় সাগর জলে।
(আবার) কারু ভাগ্যে পরেশ মেলে পথে ব'সে ধুলা খেলে॥
যেমন কর্ম্ম তেমন ফল এতো ত্রিজগতে সবাই বলে।
কিশোর কয় ডুব্‌রী হ'লে কর্ম্মকে বামপদে ঠেলে॥

পথের কাঙ্গাল।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।)

১৫—বিশ্বাসের বলে।

—:০:—

ঠাকুর মহাশয় ভাবোন্মত্ত হইয়া গাহিতেন—

"দাও অচল অটল বিশ্বাস ভকতি রতি মতি রাজা-চরণে।
আমার চঞ্চল চিত, কর প্রশমিত করুণা বারি সিঞ্চনে।

* * *

আমায় দেখায়ে প্রেমের আলো
তুমি করে ধ'রে নিয়ে চলো,
যেন চলি তব পথে, না পড়ি ভ্রমেতে, গহন সংসার কাননে।

* * *

নাথ! এই নিবেদন তব কাছে
আমার যে ক'টা দিন বাকী আছে,
যেন মন-প্রাণ খুলে, "হরি হরি" ব'লে কাটাই আনন্দ জীবনে।

গীত শেষ হইলে ঠাকুর মহাশয় বলিতেন আর কিছু পারিস্ আর না-ই পারিস তোরা প্রত্যহ নিদ্রা যাইবার আগে অন্ততঃ একবার করিয়া সংযত চিত্তে করযোড়ে প্রার্থনা করিস্—

"দাও অচল অটল বিশ্বাস ভকতি—
রতি মতি রাঙ্গা চরণে।"

তিনি আরও বলিতেন—"দেখ্, বিশ্বাস সকল জ্ঞানের মূল। "মেই মেই" বল্লে যে সাপের বিষ থাকেনা বলিয়া একটা প্রবাদ আছে সেটা খুব ঠিক্। বিশ্বাস থাকিলে, মানুষের শোক-তাপ দূর হয়, বিশ্বাস থাকিলে মানুষের জীবন মরণের ভয় থাকেনা, বিশ্বাস থাকিলে মানুষের কোন অভাব বোধ হয় না—সে যখন যা চায় তখনই হাত্ বাড়াইলে তা পায়—এমন কি ইচ্ছে কর্লে শ্রীভগবানকেও সে অনায়াসে দেখ্তে পারে।"

এ সব কথা খুব ভক্তিভরে শুনতেম। মধ্য জীবনে এই শোনা কথার একটা চাক্ষুষ প্রমাণও পেলাম। সে প্রমাণ পরিচয় কেমন ক'রে সংগ্রহ কর্বো। কারণ যার দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দিব সে এখন পরপারে। তাই যতটুকু মনে কর্‌তে পারি, যতটুকু ভাষায় ফুটে বল্‌তে পারি—কেবল ততটুকুই বল্‌বো।—

একদিন বাটী ফিরিতে রাত্রি দুই ঘটিকা অতিত হইয়া গেল। বাড়ীতে ঢুকিতেই গৃহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি, এত রাত্তির অবধি কোথায় থাকা হ'য়েছিল?" প্রশ্ন শুনিয়া আমি অন্য কোন কথা না বলিয়া সহজ ভাবে উত্তর দিলাম—আজ "প্রেতচক্রে" গিয়াছিলাম।

প্রেতের নাম শুনিয়া পত্নীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল; বিশেষতঃ রাত্রিকাল। সুতরাং আমার সন্নিকটে আসিয়া ছোট ছোট করিয়া বলিলেন—দেখ, তুমি পণ্ডিতদের কাছে যাও, ধর্ম্মসভায় যাও—তাতে রাত্রি দশটা বাজুক, বারোটা বাজুক—কোন আপত্তি নাই · কিন্তু একি, সে সব ধর্ম্মচিন্তা ছেড়ে, ভূত-প্রেত নিয়ে—এ আবার কি খেয়াল হ'লো? আমার কথা শুন, এ খেয়াল ছেড়ে দাও। এই দেখ, না খেয়ে রাত্রি দুটা অবধি কাটিয়ে এলে, হয়তো কাল অসুখ কর্‌বে। তাই বলি আমার দিব্যি, এ খেয়াল ছেড়ে দাও।"

একথা শুনিয়া আমি গম্ভীর গলায় বলিলাম—"যা ভাব্‌ছো তা নয়, এ শ্মশান জাগানো, কি পিশাচ সিদ্ধির ব্যাপার নয়। এ বড় মজার ব্যাপার; একজন

পরিব্রাজক এসেছিলেন, তিনি আজ প্রেত চক্র করে, পরলোক হ'তে মৃত ব্যক্তিদের আত্মাকে চক্রস্থ কোন ব্যক্তির দেহে আবিষ্ট ক'রেছিলেন। কত আত্মা এলেন, তাঁরা পরলোকের কত অভিনব বর্ণনা ক'রে গেলেন—তা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়।"

তখন গৃহিণী বলিলেন—বল কিগো? মরা মানুষ আবার ফিরে এলো? আচ্ছা, মানুষ ম'লে তো সব ফুরিয়ে যায়। আর ম'লেই তো তার আবার জন্ম হয়। ম'রে গেলে তার সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে কি?"

"কে বলিল মরিলে সব ফুরায়?' 'এই বলিয়া আমি তখন দ্বিগুণ উৎসাহে দেহান্তর হইলে মানুষের কি গতি হয়, মৃত্যুর পর আত্মা যে পরলোকে বিচরণ করে, যে যেমন কর্ম্ম করে সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, পারলৌকিক জীবন যে ইহলৌকিক জীবনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মৃত্যুর পর পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি যে আত্মায় সংবদ্ধ হইয়া থাকে ও তাহার বলে পরলোকে পরিজনদিগের সহিত পরিচয় করিতে পারা যায়, এবং ইচ্ছা করিলে যে ইহলোকে বসিয়া আমরা পরলোকবাসীদের সহিত কথোপকথন করিতে পারি—ইত্যাদি অতি বিস্তার পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিলাম। তারপর উপনিষদ হইতে "যম ও নাচিকেতার" বিবরণের কিয়দংশও পাঠ করিয়া শুনাইলাম।

আমার উপদেশ শুনিয়া তখন স্ত্রীর মতিগতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন—তবে মরিতে তো কোন কষ্ট নাই। কষ্ট কেবল স্বামী পুত্র ছাড়িয়া যাইবার জন্য, তা যদি সেখানে গেলে সকলের সহিত আবার দেখা হয় বা দেখা হইবার আশা থাকে তবে এ সংসার ছাড়িতে আর কষ্ট কি? কিন্তু এও বলি যে, এ সংসার-জীবনটা সমভাবে চালনা করিলে, পরজীবনে বেশ আনন্দে থাকা যায়।" শেষে বলিলেন, "বল দেখি, আমার পরিণামে কি গতি হবে?"

"তোমার খুব সদ্গতিই হবে তার জন্য কোন চিন্তা নাই"—হাসিতে হাসিতে আমি একথা বলিয়া ফেলিলাম।

"অত ঠাট্টা কর কেন? তোমার আগে আমাকে যেতে হবে কি না, তাই তোমায় এত কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি"—এই বলিয়া পত্নী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

করিলেন। হায়! তখন যে এই রহস্য আলাপের মধ্যে সত্য অস্ফুটভাবে আসিয়া আত্মগোপন করিয়াছিল—তাহা কোনমতে ভাবিতেই পারি নাই।

"বলি, তোমায় যে আগে যেতে হবে তার মানে কি? আমিও তো আগে যেতে পারি।

"ছিঃ, ও কথা মুখে ও এন না; দেখ, আমার মা, দিদি, এঁরা সব সধবা অবস্থায় নোয়া, সিঁদুর, আলতা প'রে হাস্‌তে হাস্‌তে স্বামীর পায়ে মাথা রেখে স্বর্গে গেছেন, আর আমিও সেই পথ অনুসরণ করবো। আমার হাতে মায়ের হাতের নোয়া আছে, আমার কথা কদাচ মিথ্যা হবে না। আর তুমি থাকবে, তোমায় থাকতে হবে—নহিলে আমার সদ্গতি করিবে কে?"

তখন প্রায় প্রভাত হইয়াছে। স্ত্রীর কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে গৃহের বাহিরে আসিলাম। মনে করিলাম, এমন কথা স্ত্রীলোকে বলিয়া থাকে। হায়! তখনও বুঝি নাই যে পরলোকের ধারণা স্ত্রীর মনে দৃঢ়ভিত্তি লাভ করিয়াছিল, আর তাহারই বলে মরণকে তার অতি *প্রিয়সুহৃদ* বলিয়া ধারণা হইয়াছিল।

যাহা হউক, স্ত্রীকে পরলোক সম্বন্ধে দুই একখানি পুস্তক পড়িতে দিয়াছিলাম। "আনন্দবাজারে" যে সকল পারলৌকিক প্রসঙ্গ বাহির হইত তাহাও পড়িতে দিতাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল, বৎসর চলিয়া গেল—আমিও স্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী ভুলিয়া গেলাম। ইহার পর আরও ছয়মাস অতিবাহিত হইল, সপ্তম মাসের প্রথম দিনে, অফিস্ হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখি স্ত্রীর জ্বর হইয়াছে। কবিরাজ ডাকিলাম, তিনি বলিলেন, "এ জ্বরের গতি ভাল নয়—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ইহাকে বিষম জ্বর বলে।"

তিন দিনের মধ্যে স্ত্রীর দেহ শুখাইয়া যেন কঙ্কালসার হইল। মনে একটু উদ্বেগের সঞ্চার হইল, কারণ বাটীতে সেবা করিবার কেহ নাই; সুতরাং চতুর্থ দিবসে তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে লইয়া গেলাম। পথে যাইতে যাইতে কেবল একবার সহাস্যবদনে স্ত্রী বলিলেন—"বিনা আমন্ত্রণে পিত্রালয়ে যাইয়া "সতীর" কি গতি হইয়াছিল জানত? আমারও বা তাই হয়।"

কথাটা শুনিয়া আমার একটু রাগ হইল। বলিলাম "দেখ তোমার অসুখ, সেখানে সেবা করিবার লোক আছে, কেবল এই জন্যই লইয়া যাইতেছি।

সেখানে চিকিৎসা ও সেবার গুণে তুমি শীঘ্র আরাম হইবে। তা ওসব কথা মিছামিছি মনে স্থান দিতেছ কেন? এরূপ অবস্থায় নিমন্ত্রণ অনিমন্ত্রণ বিচার আদৌ করা চলে না।"

উত্তরে স্ত্রী কেবল বলিলেন,—"রাগ কর কেন? কথাটা মনে এল, তাই বলিলাম। তা, তোমায় বল্‌বো না তো আর কাকে বল্‌বো?"

ইহার পর প্রায় একমাস অতীত হইয়া গেল। মধ্যে মধ্যে স্ত্রীকে দেখিয়া আসি। রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শেষে বিকার অচৈতন্য, দেহ স্পন্দনহীন হইল। সে দিন কৃষ্ণা নবমী, আমি যাইয়া অবস্থা দেখিয়া ভাবিলাম ইহাই শেষ অবস্থা। কবিরাজ আসিয়া নাড়ী টিপিয়া বলিলেন—"এ রাত্রে কিছুই হইবে না, কাল বেলা নয়টা দশটা নাগাদ প্রাণ দেহচ্যুত হইবে।" এদিকে শেষ রাত্রে পূর্ব্বগগণে কৃষ্ণ নবমীর ক্ষীণ চন্দ্র দেখা দিলেন—আর গৃহের ভিতর শশীকলার ন্যায় ক্ষীণ দেহলতা ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইতে লাগিল।

প্রভাতে রোগিনী যেন রোগমুক্ত—এমনি ভাব প্রকাশ পাইল। আমার পানে চাহিয়া বলিলেন—"হায়! আর শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া হইল না। কি করিব, যেমন ভাগ্য! তা এখন এক কাজ কর, আমার দেহটাকে শুদ্ধ করিয়া দাও।" আর তাঁহার রোরুদ্যমানা আত্মীয়াদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তোমরা প্রাণ ভরে ঠাকুরদের নাম কর।"

আমি যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দিলাম, নারায়ণের চরণামৃত রোগিনীর দেহে ও বদনে দিলাম। রোগিনীর পরম আনন্দ হইল সে আনন্দ দেখিয়া আমারও বিশেষ আনন্দ হইল। তখন স্ত্রী আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। আমি মহানন্দে "গৌর হরিবোল" বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। স্ত্রী স্থিরভাবে, পলকবিহীন নেত্রে, এক মনে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আমার মনে সন্দেহ হইল, বুঝি স্ত্রীর কর্ণে নাম প্রবেশ করিতেছে না। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি নাম শুনছো আর বলছো তো?" উত্তরে জানাইলেন যে, তিনি মনে মনে করিতেছেন। আমি সাগ্রহে বলিলাম একবার মুখ ফুটিয়া নাম উচ্চারণ কর শুনি?" তখন ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে ধীরে ধীরে প্রতিধ্বনিত হইল—"হরিবোল হরিবোল—হরিবোল।"

বাঃ কি আনন্দ! আমি তখন আত্মহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ ভরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছি জানি না, সহসা তুমুল ক্রন্দনরোলে আমার চৈতন্য হইল—তখনও মুখে আপনা আপনি "হরিনাম" উচ্চারিত হইতেছে। চাহিয়া দেখি, স্ত্রী স্থিরনেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন, তখনও যেন তাহার কর্ণ নামশ্রবণে উৎগ্রীব হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু দেহে প্রাণ নাই—সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গিয়াছে। আর আত্মীয় স্বজন সকলে চতুঃপার্শ্বে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন।

কিন্তু নামের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। নামের গুণে আমার প্রাণে শোক নাই—তৎপরিবর্ত্তে ভূমানন্দ, চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু নাই—বরং অধম প্রাণে ঈষৎ আনন্দের বিকাশ পরিলক্ষিত হইল। হায়! নামের এত তেজ! হায়! এতদিন জানিতে পারি নাই। এই অবস্থায় নামগান করিতে করিতে সেই দশমীর দিন কনক প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম। অন্তে গঙ্গা স্নান করিয়া আবার হরিনাম করিতে করিতে বাটী ফিরিলাম।

সন্ধ্যার সময় যথারীতি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিলিত হইয়া অন্যদিনের মত সহজ ভাবে কথা কহিতে লাগিলাম। তাঁহারা যেন আমার চরিত্রটা নিতান্ত অস্বাভাবিক মনে করিলেন। কিন্তু নামের মহিমা তাঁহারা বুঝিবেন কি করিয়া? প্রাণ ভরিয়া তো কেহ কখন নাম করেন নাই। তাই সকলে পার্থিব শোক, পার্থিব অভাবের কথা তুলিয়া আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। আমার তাহা মোটেই ভাল লাগিল না।

ইহার একদিন পরে, যিনি আমার চিরসংসারে আমার জীবনের আদর্শ স্থানীয়, তাঁহার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি পাঠ করিয়া পরম আনন্দ হইল। কারণ ইহাতে আমার অন্তরের কথাগুলি যেন লিপি বদ্ধ রহিয়াছে। সেই পত্রখানির অংশ বিশেষ এইরূপ:—

"যাঁহাদের শ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যাঁহারা তাঁহাকে নিজজন বলিয়া জানেন, যাঁহাদের পরবাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়। তাঁহারা কখনই ইহা মনে ধারণা করিতে পারেন না যে, যিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করিয়াছেন, তিনি একটী অতি প্রিয়বস্তু দিয়া, তাহার সহিত

চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটাইবেন, এরূপ নিষ্ঠুর তিনি কখনই হইতে পারেন না। তোমার স্ত্রী সেখানে যাইয়া ঘর গৃহস্থালী গোছাইয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিবেন। মিলনের পর বিচ্ছেদ যেমন কষ্টদায়ক, আবার বিচ্ছেদের পর মিলন ততোধিক আনন্দদায়ক। বিশেষতঃ বিচ্ছেদ না হইলে মিলনে যে কত সুখ তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায় না। এই বিচ্ছেদের পর যে মিলন হইবে, তাহাতে আর বিচ্ছেদ ঘটিবে না, ইহা মনে হইলেই শান্তি পাইবে। সেই আনন্দ ধামে যেমন বিচ্ছেদ নাই, তেমনি শোক-দুঃখ নাই,—আর নাই পার্থিব সম্বন্ধ। সেখানে আহার নিদ্রা নাই, হা হুতাশ নাই,—আছে কেবল আনন্দ। সেখানে দুই জনে একত্র হইয়া শ্রীশ্রীগৌর ভগবানের ভজন করিবে। তাঁহাদের মধুর লীলা সকল আস্বাদন করিবে। তবে এখন যে কয়েক দিন এই মর্ত্তধামে থাকিতে হইবে, সেই কয়দিন আনন্দধামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে মাত্র। এখানে যিনি যতদূর ভজন সাধন করিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি সেই স্থানের ততদূর উপযোগী হইবেন।"

"আর একটি কথা। শোকের মত আমাদের উপকারী বন্ধু আর নাই। ইহাতে মনের সমস্ত ময়লা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। তখন এজগতে থাকিয়াও আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হয়। আর শ্রীভগবান যে কতদূর নিজজন কতদূর ভালবাসার ও প্রেমের বস্তু, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।"

এই পত্রপাঠে মনে যেমন আনন্দ হইল, তেমনি হৃদয়ের বদ্ধমূল ধারণা আরও দৃঢ় হইল। ভাবিলাম "আবার দেখা হবে ?" অন্তরের অন্তস্থল হইতে প্রতিধ্বনিও হইল—"আবার দেখা হবে।"

ইহার তিন চারিদিন পরে, বাটীতে একটা অলঙ্কার খুজিয়া না পাওয়ায় মনে নানারূপ সন্দেহ হইল। রাত্রে শয়ন করিয়া আছি, শেষ রাত্রে স্ত্রীকে স্বপ্নে দর্শন পাইলাম। সে মূর্ত্তি যেন আরও জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়াছে—সর্ব্বাঙ্গ কুসুম-মাল্য সুশোভিত। সেই ছায়ামূর্ত্তি আসিয়া আমায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমার মন অত অশুদ্ধ কেন ? পরের উপর বৃথা সন্দেহ করিতে আছে কি ? তুমি যেখানে শুইয়া আছ—সেই বিছানার নীচে, অলঙ্কারটি আছে—আর তথায় একখানি পত্রও আছে। সেখানি পিত্রালয়ে যাইবার পূর্ব্বে লিখিয়া রাখিয়াছি।

আসিবার সময় কিছু বলিতে পারি নাই। পত্রখানি পড়িও।" এই বলিয়া সেই ছায়া মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান হইল।

তখন রজনী প্রভাতাপ্রায়। শয্যা ত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান অন্বেষণ করিবামাত্র অলঙ্কার পাইলাম, এবং পত্রখানিও পাইলাম। উহাতে সাংসারিক নানা কথা লেখা আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলিও রহিয়াছে :—

"শেষ পত্র।"

"তোমাকে এই শেষ পত্র লিখিতেছি। এ পাপ পৃথিবীতে আমাদের স্থান নয়। তুমি বলিয়াছ মরিবার পর আবার সকলের সহিত দেখা হয়। সেখানে রাগ হিংসা দ্বেষ কিছুই নাই। তবে আমাদের আবার সেই স্থানে দেখা হবে। যাহার কাছে আমি যা অপরাধ করিয়াছি, সকলে যেন ক্ষমা করে। * * * তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিও, সকলকে আমার প্রণাম জানাইও।"

কি গভীর বিশ্বাস, কি সরলতা, কি অকপট অভিব্যক্তি।—"সেখানে আবার দেখা হবে" এই অটল বিশ্বাসে তাহার আত্মা তৃপ্ত হইয়া মরণকে আলিঙ্গন করিয়াছে। আর আমিও এ জগতে এই বিশ্বাসবলে পরম শান্তিলাভ করিতেছি। আমার চক্ষে জল নাই—মুখে হা হুতাশ নাই—প্রাণে যেন কি এক অভিনব আনন্দের আকর্ষণ অনুভূত হইতেছে।

এ ঘটনার কয়েক দিন পরে আমার কোন পরিচিত ছাত্র আসিয়া যে সংবাদ দিয়া গেল, তাহাতে এ বিশ্বাস, ধারণা, আরও দৃঢ় করিয়া দিল। ছাত্রটি আমার আবাসস্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করে। আমার স্ত্রীকে সে কখনও দেখে নাই। কিন্তু সেদিন আসিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল— "মাষ্টার মশাই! আমি কখনও আপনার স্ত্রীকে দেখি নাই, কিন্তু আজ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আসিয়া আমায় বলিতেছেন—ওরে। তোদের মাষ্টারকে ভাব্‌তে বারণ করিস্—"আবার দেখা হবে।"

"আবার দেখা হবে" এই আশ্বাসে আমার জীবন এখন সংযত হইয়াছে। শোক—পীড়িতের ন্যায় উদাসীনের ভাব আমার চরিত্রে স্থান পায় নাই। আমি কর্ত্তব্যের পথে যথারীতি বিচরণ করিবার সাহস ও বল পাইয়াছি। তবে আমার নিত্য প্রার্থনার সময় বৃদ্ধি হইয়াছে,—মন্ত্রেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

এখন নিত্য প্রার্থনান্তে মুদিত নয়নে জ্যোতির্ম্ময়ীর ধ্যানে নিরত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে প্রেমাশ্রুসিঞ্চন করিতে করিতে বাষ্প গদগদ কণ্ঠে বলিতে হয়—

"আমায় দেখায়ে প্রেমের আলো, তুমি করে ধ'রে নিয়ে চলো।"

১৬—শান্তির সোপান।

সে দিন পথের ধারে একটি ভদ্র লোক একটি বালিকার হাত্ ধ'রে ধীরে ধীরে আস্‌ছেন—মেয়েটি তার সরল ভাবে আধ আধ স্বরে তার পিতাকে, সম্বোধন ক'রে, সেই ধপ্‌ধপে সাদা চোখ দুটি উপরে তুলে কেমন প্রাণ গলানো ছন্দে বল্‌তে লাগ্‌লো—"বাবা! আমায় কোলে কর।"

সে কচি কথাগুলি, তার পিতার কণে কি ভাবে বেজেছিল তা জানিনা, কিন্তু দেখিলাম—আমার অন্তরের অন্তস্থল হ'তে যেন এক করুণ রাগিনী—স্মৃতির দুয়ার ঠেলে ঝঙ্কার করে উঠ্‌লো—সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন উদ্ভ্রান্ত আত্মহারা হ'য়ে, ছুটে গিয়ে, সেই চিন্ময়ী শক্তির জড়ীয় বিকাশকে সাগ্রহে কোলে নিয়ে, আনন্দে বলে ফেল্‌লাম—

"দীন তারিণি! ত্রিনয়নি! একবার দীনের প্রতি ফিরে চাও।

(আমায়) তোমার ভাবে বিভোর ক'রে আপনি নাচো, (আর) আমায় নাচাও।"

খানিক পরে, মেয়ের বাপের কোলে যখন মেয়েটিকে ফিরাইয়া দিলাম, তখন বড় গলায় বলিলাম—"যাও মা, যার মেয়ে তার কোলে যাও, মা।"

ভদ্র লোকটি, প্রথমে যেন কেমন কেমন বোধ করিতে লাগিলেন পরে বলিলেন—"মহাশয়ের কি ছেলে মেয়ে?" আমি সে কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—"থাক্ সে কথা।—আনন্দময়ী মূর্ত্তির ভাব ব্যঞ্জক কিছু দেখ্‌লেই যে আনন্দে অধীর হইতে হয়—তাই অমন্ ক'রেছিলেম।" কিন্তু ভদ্র লোকটি ছাড়িলেন না, কাছে আসিয়া বসিলেন ও বারম্বার নানা কথা জিজ্ঞাসা করায়, সত্য সত্যই যে একদিন আমার "আনন্দময়ী" আমায় কোলে কর বলিয়া হাত বাড়াইত, ও সেই—আনন্দময়ীকে আনন্দের আধারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া,

আমি আজ শান্তির সোপানে দাঁড়াইয়া আছি—অতীত স্মৃতির এই অধ্যায়টি বিবৃত করিলাম ঃ—

"আমায় এ-পারে রেখে সে যখন ও-পারে চলে গেল, 'তারপর আবার দেখা হবে" এ আশ্বাস পেলাম। সে আশ্বাসে প্রাণে বড় আশা হ'ল কৌতূহল হ'ল এ পার ওপারে পার্থক্য ভুলে গেলাম। স্বপনে তার দেখা পাই, মনে হয় এই তো সে এত কাছে। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখি, তারই স্মৃতি মাখানো সব মধুর ভাবে ভরা, পরিজনদিগের মুখে তারই কত কথা শুনি, সে সব যেন সজাগ কথা। তখন মনে হল যাহা অতিদূরে, বলিয়া ভ্রমহয়,—তাহা অতি নিকটেও পাইতে পারা যায়।

বাহিরে যখন চাহিয়া দেখি—তখনই ঐ শশাঙ্ক ঐ উদার আকাশ, ঐ হাল্কা হাওয়া ঐ শিশির স্নাত কুসুম—এর মধ্যেও যেন তার কত মূর্ত্তি, কত কাহিনী ফুটিয়া উঠে। আর তখনই মনে হইত—

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে র'য়েছ নয়নে নয়নে।''

এ ছাড়া এ পারে তার আর একটি চাক্ষুষ স্মৃতি ছিল। দুর্বল মনের গতি যখন চঞ্চল হইত, যখন উদাস নয়নে চাহিয়া গৃহকোণে নীরবে বসিয়াও জড়জগতের বাহিরে মনকে ছুটাইয়া দিতাম, তখন এই সজীব স্মৃতিটি,—এই আনন্দময়ী মূর্ত্তিটী আসিয়া, দুটি সুন্দর সুকোমল বাহু বিস্তার করিয়া, আধ আধ সুধা মাখা স্বরে হাসিয়া হাসিয়া বলিত—'বাবা। আমায় কোলে কর।''

সে স্বরলহরী কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া, সে সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম-নিন্দিত সুকোমল শিশু কান্তি দেখিয়া, তাহাকে সাদরে কোলে তুলিয়া—যেন, পরশ মণির স্পর্শ হইত, যেন হারানিধি ফিরিয়া আসিত, যেন আবার অতি দূর অতি নিকটে আসিয়াছে মনে হইত। আর তখনি ভাবিতাম—আহা।

''তোমার রাগিনী জীবন কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমার আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো।''

মেয়েটি নামে আনন্দময়ী হইয়াও, এই ভাবে প্রকৃত আনন্দময়ী হইয়া উঠিল। যে তাহাকে দেখিত সেই তাহাকে আনন্দময়ী বলিয়া পরিচয় করিত। শরতে আনন্দ ও আনন্দময়ীর আগমন কালে, আমার এ আনন্দময়ীর আবির্ভাব হইয়াছিল। যখন আমার সংসারের আনন্দ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন

এই আনন্দময়ী সে ভাঙ্গা-সংসারের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। ইহা আবার আশাভরা কণ্ঠে, আবেগপূর্ণ স্বরে গাহিলাম—

"মা যার আনন্দময়ী। নিরানন্দ কিবা তার"—

তখন কে জানিত যে এই আনন্দময়ী আবার নিরানন্দে ভাসাইতে পারে! যে শরতে আনন্দময়ীর আবির্ভাব হয়—সেই শরতেই যে সে দেবী প্রতিমার নিরঞ্জন নির্ণয় হইয়া থাকে, হায়! একথা তখন ভাবি নাই কেন?

পূর্ব্বে না ভাবিলেও এ বৎসর শরতে আমার ভাবান্তর হইল! এবার যখন শারদীয়া কনকপ্রতিমার বোধন বসিল, যখন আনন্দময়ী মায়ের পূজায় বঙ্গনারী নিযুক্ত হইলেন, তখন আমার গৃহের আনন্দময়ীর সোণার অঙ্গ মলিন হইতে আরম্ভ হইল। আবার আমার প্রাণে নিরানন্দের ছায়া দেখা দিল। এত সাধের মেয়েটি শয্যাশায়িনী হইল। তখন আনন্দের অভাবে প্রাণ যেন আবার কেমন হু হু করিয়া উঠিল, আর অন্তরের অন্তস্তল হইতে এই অব্যক্ত মর্ম্ম-গাথা প্রতিধ্বনিত হইল :—

"যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি তারা ত চাহে না আমারে;
তারা আসে তারা চলে যায় ফেলে যায় মরু মাঝারে।
দু'দিনের হাসি দু'দিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে;
কে রহে তখন মুছা'তে নয়ন কেঁদে কেঁদে ডাকি কাহারে?"

এ মর্ম্ম গাথা তখনও অব্যক্ত। স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে সাহস পাই নাই। কারণ তখনও পূজা বাড়ীর মঙ্গল আরতির ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইলে মেয়েটি কাতর নয়নে আমার পানে চাহিয়া, ক্ষীণকণ্ঠে বলিত—'বাবা! আমায় কোলে ক'রে নিয়ে চল।

তখনি তাহাকে বুকে করিয়া দেবী প্রতিমার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আর মেয়েটি সেই প্রতিমাপানে চাহিয়া, কম্পিত হাত দুখানি সংযুক্ত করিয়া বলিত—"মা, ঠাকুর, ভাল ক'রে দাও মা!"

পূজা ফুরাইল। পূজাবকাশের শেষ ভাগে কোন পরিজনের বাটীর নিকট দিয়া বৈকাল বেলা যাইতে যাইতে, ভিতর হইতে যেন ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইলাম। সচকিত হইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। গিয়া দেখি পরিজনের একটি দশম বর্ষীয়া বালিকা, আমার কন্যার নাম ধরিয়া অবিশ্রান্ত

গড়িতে কাঁদিতেছে। আমার মেয়েটিকে এই বালিকা বড়ই স্নেহ করিত। তাহার হঠাৎ এ অবস্থা হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসায়, তাহার জননী বলিলেন—"এই আমি তোমায় ডাকিতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। তোমার মেয়ের জন্য আজ সারাদিন কাঁদিতেছে।" ইহা শুনিয়া আমি বালিকাকে নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিলাম। কিয়ৎকাল পরে, সে প্রকৃতিস্থ হইলে তাহাকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—"ওগো কাল রাত্রে আমি তোমার মেয়ের জননীকে স্বপনে দেখিয়াছি। যেন আমাদের বাগানে ফুল তুলিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমায় দেখিয়া বলিলেন—দেখ। খুকীকে তুমি যত্ন কর, তা তোমার কাছে রাখিব ভাবিয়াছিলাম। তা—থাক্‌গে—এখন আর নয়, আমার কাছেই নিয়া যাই।"

বালিকা এই ভাবের জড়ানো—এলো মেলো কথা বলিল। যাহা হউক, তাহাকে আমি সান্ত্বনা দিয়া ও কন্যার জন্য কোন চিন্তা নাই বলিয়া চলিয়া আসিলাম। তাহাকে নিরস্ত করিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু বাটীতে ফিরিয়া আমার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইল। কারণ, রাত্রে কন্যার রোগ বৃদ্ধি পাইল। সারারাত্র ঘুমাইতে না পাওয়ায় ভোরের সময় চক্ষে একটু তন্দ্রা আসিল। সে তন্দ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমার পরলোকগত সহধর্ম্মিণী আসিয়া, ধীরে ধীরে আমার আনন্দময়ীর পাণ্ডুবর্ণ দেহের আবরণ উন্মোচন করিতেছে। তখনই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সচকিতভাবে চাহিয়া দেখিলাম আমি শু'য়ে।

তখন প্রভাত হইয়াছে। ঘরের জানালা খুলিয়া, কন্যাটিকে কোলে তুলিয়া লইলাম। সে চক্ষু মেলিয়া আমার প্রতি চাহিল ও সেই শুষ্ক অধরে একবার তরল হাসির কুঞ্চিত রেখা বিকশিত হইল। আর দেওয়ালে অন্নপূর্ণার প্রতি-মূর্ত্তির পানে, অঙ্গুলি সঞ্চারিত করিয়া বলিল—'ঐ মা, ঐ ঠাকুর, ঐ ভাত খাব'। ঐ মা যাবো, মা আমায় কোলে কর।'

ক্ষীণ শিশু-কণ্ঠের সেই বিশুষ্ক বদনের কাতরভাব দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। যে শিশু এমন করিয়া মাকে চিনিয়াছে যে, পটের ছবি দেখিয়া "মা যাবো" বলিয়া বিহ্বল হয়, তাকে আর ধরিয়া রাখি কি প্রকারে? সুতরাং তখন উর্দ্ধপানে চাহিয়া—

"জয় গৌরগোবিন্দ ব'লে অভয় পদে সব সপিলাম"—

এই পদটি আবৃত্তি করিলাম। আর তদ্দণ্ডে যেন অবিরামগতিতে আমার মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল—

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"

এ মন্ত্র কতক্ষণ উচ্চারণ করিয়াছি ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু যখন কন্যার প্রতি দৃষ্টি পড়িল তখন দেখি সে ঘুমাইয়া আছে। সারা দিবসে আর সে নিদ্রা ভাঙ্গিল না। রাত্রিশেষে দেখি, সে নিদ্রা চিরনিদ্রায় পরিণত হইয়াছে। তাহার জননী, তাহাকে এবার সত্য সত্যই কোলে তুলিয়া লইয়াছে। তখন আবার গৃহের বাহিরে আসিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে উদ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া যুক্ত করে বলিলাম—

"তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ করুণাময় স্বামী,
দাও দুঃখ, দাও তাপ সকলি সহিব আমি।"

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে আজ এত সাধের শিশুর শবদেহ শ্মশান-ভূমিতে আনীত হইল। যাহাকে যত্নে বুকে করিয়াও, তাহার জ্বালা নিবারণ করিতে পারি নাই, আজ শ্মশানে তাহার সকল জ্বালার বিরাম হইল। সে দৃশ্য দেখিয়া যেন নূতন ভাবে নূতন অর্থে, সেই অতি পুরাতন গীতটি কর্ণ-কুহরে প্রতিধ্বনিত হইল :—

"শ্মশানে কেন মা গিরি-কুমারী কেন মা তোমারি এমন বেশ।"

শ্মশানের কার্য্য শেষ হইল, শেষ চাক্ষুষ স্মৃতিটুকু ঢাকা পড়িল, চক্ষে দর দর ধারে অশ্রু যেন স্বতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই জলভরা চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখি, শ্মশানের প্রতি তৃণমূলে যেন কত মর্ম্ম-গ্রন্থি বিজড়িত রহিয়াছে। কত মায়ের অঞ্চলের নিধি, কত পিতার নয়ন-মণি শ্মশান-ভূমির তৃণ-মূল মৃত্তিকার ধূলি কণায় পরিবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে। তখন, চক্ষের জল মুছিয়া আবার গাহিলাম—

"শ্মশান ভাল বাসিস্ বলে শশ্মান করেছি হৃদি,
শ্মশান বাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি বলে নিরবধি॥"

গঙ্গাস্নানান্তে গ্রামে ফিরিলাম। তখন রজনীর অন্ধকার দূর হইয়াছে, নব-রবির নব আলোকে যেন নবীন জগতে প্রবেশ করিলাম। তবু দেখি পথের পাশে সেই জনতা, কর্ম্মক্ষেত্রের সেই ব্যস্ততা, জীবন সংগ্রামের সেই যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা-কলরব। এ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া আবার ভাবান্তর, আবার কল্পনা কল্পনা, আবার চিন্তা আবার যুক্তি বিচার :—

"মান্ধাতারি আমল্ থেকে চ'লে আস্‌ছে এম্‌নি রকম।
(আর) আমারি কি এমন ভাগ্য বাঁচিয়ে যাব সকল অধম।"

মনেরে তাই কই যে—

"ভাল মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।

দিনের বেলায় এই প্রবোধ-বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করি বটে কিন্তু গভীর রাত্রে, যখন জীবগণ প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম করে, তখন আমার বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষের পলক পড়ে না। মনে হয়, কর্ণে যেন সেই ক্ষীণ শিশুর কাতর-কণ্ঠ-ধ্বনি বাজিতেছে :—"আমায় কোলে কর।"

অম্‌নি মনের মাঝে ওপারের সাড়া আসে, আর উদ্বেগ পূর্ণ প্রাণে এ-পারের, স্মৃতি ওপারে পাঠাইবার জন্য আগ্রহ জাগে। কিন্তু মধ্যে যে এখন মহা ব্যবধান! তার উপায় কি? তাই, যিনি পারাপারের কণ্ডারী তাঁহার উদ্দেশে, আবেগ বিহ্বলিত কণ্ঠে, ভাবুক কবির সুরে সুর মিলাইয়া বলি :—

যদি, মরমে লুকায়ে রবে, হৃদয় শুকায়ে যাবে,
তবে কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো?
চরণ-শরণ তরে, এত ব্যাকুলতা ভরে,
কেন ধাই, যদি নাহি মিলে গো?
পাপী তাপী কেন সবে তোমারে ডাকিয়া ক'বে
যদি মনোব্যথা তুমি না শুনিবে গো?
মধুর সান্ত্বনা ভরে, যদি না মুছাবে করে,
কেন ভাসি নয়ন সলিলে গো?
আনন্দে অনন্ত প্রাণ করিছে বন্দনা গান,
অবিশ্রান্ত অবিরাম অনন্ত নিখিলে গো?
সকলি কি অর্থহীন, শূন্যে শূন্য হবে লীন,
তবে কেন এ গীত সৃজিলে গো?
এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো।
যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন ত্রিভুবন-পতি
পতিতপাবন নাম ধরিলে গো?

———

গত ২৭শে মাঘ ১৩২৫ সালের "মেদিনীপুর হিতৈষী" তে "পুরীধামে পাণ্ডা ও মহাপ্রসাদের সঙ্কট অবস্থা" শীর্ষক একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, প্রবন্ধটী পাঠে আমরা বিশেষ দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এ বিষয় যাহাতে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান হইয়া সাধারণের ভ্রমাপনোদনের জন্য প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ হয় তজ্জন্য আমাদেরও বিশেষ অনুরোধ। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য "হিতৈষী" হইতে উক্ত প্রবন্ধটী অবিকল মুদ্রিত করিলাম, আশা করি এ বিষয় কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে আমাদিগকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

(ভক্তি কার্য্যাধ্যক্ষ)

"পুরীধামে পাণ্ডা ও মহাপ্রসাদের সঙ্কট অবস্থা।"

——:•:——

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গদেবের অসাধারণিক ভক্তি, প্রীতি ও অনুরাগে শ্রীশ্রীনীলাচল-নাথ জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ হিন্দু মাত্রেরই দুর্লভ পদার্থরূপে পরিণত হয়েন। এবং তদবধি হিন্দু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আপনাদের ভেদাভেদ ভুলিয়া আত্যন্তিক অনুরাগে একত্রে পরস্পর কাড়াকাড়ি করিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ইহা যে শ্রীচৈতন্যদেবের অসীম ভক্তি ও দেবভাবের প্রেরণা তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সেই প্রেরণায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাক প্রভৃতি জাতি, জাতীয় ভাব, আচার, নিয়ম ও সংযম দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাগ্রহে অতি নীচ শূদ্রাদির সহিতও মহাপ্রসাদ ভোজন করিতেছেন। শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদের সমস্যায় কেহই বিকৃত-মস্তিষ্ক নহেন। সেখানে উচ্ছিষ্ট বা সকড়ি বলিয়া কোন কথা নাই। কোন কোন মহাত্মা অন্নপ্রসাদকে অষ্টাঙ্গে মাখিয়া প্রেমে আপ্লুত হয়েন। তাহা এমনই পবিত্র, এমনই ভক্তি প্রেম সম্প্রাতক। কিন্তু সেই মহাপ্রসাদের কি ভয়ঙ্কর পরিণতি তাহা শুনিলে হিন্দু মাত্রেই চমকিয়া উঠিবেন। সেই পুরীধাম শ্রীক্ষেত্র এখন যেন পিশাচের লীলাভূমি হইয়াছে। সেই মহাপ্রসাদের শুদ্ধিতা এখন বিষ-

প্রবাহে পরিণত হইয়াছে। এখন আর পাণ্ডা এবং তাহাদিগের অনুচরগণের মধ্যে প্রেম, ভক্তি, প্রীতি ও অনুরাগ নাই! এখন তাহাদের অধিকাংশই প্রমেহ ও পারা সংক্রান্ত অতি সংক্রামক দুষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত। পয়সা এবং রিপু-চরিতার্থতাই তাহাদের অধিকাংশের প্রকৃষ্ট ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়াছে। পয়সার জন্য তাহারা ধর্ম্ম ও বিসর্জ্জন দিয়াছে। ভারতের অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রও এ দোষে দূষিত বটে কিন্তু এমন অন্নক্ষেত্র—অন্নছত্রের ব্যবস্থা অন্যত্র নাই। ভারতের কত বিদেশ হইতে কত ভক্ত, ভক্তি প্রীতি লইয়া শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন কিন্তু উক্ত দূষিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের হস্ত মর্দ্দিত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের, ভক্তি প্রীতির পরিবর্দ্ধন দূরে যাউক, তাঁহারা নানা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। শুনিয়াছি বংশানুক্রমিক সেবা বা রন্ধন কার্য্যের বাধ্য থাকায় বহু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকেও প্রভুর ভোগ রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। কিন্তু একথায় বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ বাহ্যতঃ ঐ প্রকার অতি দুষ্ট রোগ দর্শন করিয়াও কি পুরীধামের পরিচালকবর্গ তাহাদিগকে জগন্নাথদেবের পবিত্র ভোগ রন্ধনের ত্রিসীমায় যাইতে দিতে পারেন? যেখানে চামড়ার মণিব্যাগটী পর্য্যন্ত প্রভুর পুরীর বহির্দ্বারেও যাইতে পারে না, যেখানে প্রভুর মন্দিরে কেহ বিড়ি খাইয়া উচ্ছিষ্টাংশ ফেলিলে প্রভুর পুনঃ অভিষেকের প্রয়োজন হয়, সেখানে এমন একটা গুরুতর কাণ্ড সংঘটিত হইতে থাকিবে ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি? তবে বিশ্বাস করিতে হয় এই জন্য যে, পাণ্ডাদিগের আর সে প্রেমভক্তি নাই, আর সে বাসুদেব সার্ব্বভৌম, সে কাশীমিশ্র বা প্রতাপরুদ্র নাই! আর সেই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গও সশরীরে নাই। এখন অর্থের প্রেমে পাণ্ডাদিগের অধিকাংশই ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া কালা পাহাড় হইয়াছেন। জগন্নাথদেবকে বদ্ধ করিয়া পয়সা বাহির করিতেও তাহাদের কুণ্ঠা নাই। মিথ্যাচারই এখন তাহাদের ব্যবসায়ের প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। অধিকাংশ পাণ্ডাই ঐপ্রকার ব্যবহার করিতেছেন সত্য কিন্তু প্রভুর সেবা পরিচালন জন্য যে পরিচালকবর্গ আছেন, তাঁহারা এ সমুদায় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া বিধি ব্যবস্থাও পবিত্রতা রক্ষায় মনোযোগী আছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাহা হইলেও আমরা তাহাদিগকে এ সমুদায় ব্যাপারের সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া জনসমাজের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য আহ্বান করি। তাঁহারা কাল বিলম্ব না করিয়া পুরীধামের পবিত্রতা রক্ষায়

বিশেষ সতর্ক হউন। যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভক্তি রাখা দায় হইয়া উঠিয়াছে।

জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বে এক জন না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইতেছে তথাপি একজন পাণ্ডা বা তাহাদের অনুচরবর্গকে তাহার ভোজনের জন্য এক মুঠা অন্ন দিতেও দয়ার্দ্রচিত্ত দেখি নাই। তথায় শুধু কেবল ফেল কড়ি মাখ তেল। পাণ্ডা বা তাহাদের অনুচরবর্গ অন্ন লইয়া বিক্রয়ের ফন্দীতে ঘুরিতেছে। যদি অন্নক্ষেত্রে একজন ক্ষুধার্ত্ত, না খাইয়া মরিতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে এখন দয়া ধর্ম্ম কিরূপ তাহা একবার অনুমান করুন।

ঐরূপ নানাপ্রকার দুষ্ট ব্যাধির পরিচয় পাইয়া হিন্দু জনসাধারণ এখন যাহার তাহার হাতে খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে। কালে ইহা এত সংক্রামক হইয়া উঠিবে যে, আর কেহ দেব দর্শনান্তর প্রসাদ মস্তকে স্পর্শ ব্যতীত, গ্রহণ করিবে না। আমরা জানি, বৈদেশিক লবণে প্রভুর ভোগ রাঁধা হয় বলিয়া একবার শ্রীশ্রীমাতাজী মহারাণী মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া ছিলেন। A little incident shows man's character সামান্য ঘটনা হইতেই বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি কেহ উহাকে সামান্য ঘটনা বলিয়াও বলেন তাহা হইলেও উহা হইতেই কি পাণ্ডা বা পরিচালকবর্গের রুচি ও ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার পবিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায় না? ইহা যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয় নাই তাহারই বা প্রমাণ কি?

আটিকা বন্ধন।

তাহার পর পয়সা উপায়ের যত প্রকার পন্থা আছে তাহার ত ক্রটি নাই-ই, আবার আর একটা মস্ত সুযোগ আছে আটিকা বন্ধন। পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের ভোগ হইবে বলিয়া যাত্রীবৃন্দের নিকট হইতে আটিকা বন্ধনের প্রলোভন দেখাইয়া মোটা মোটা টাকা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করেন। যেখানে তেমন টাকা আদায়ের সুবিধা নাই, সেখানে যে যাত্রীর নিকট যাহা পাওয়া যায়, এমন কি আট টাকাও কিস্তিবন্দী হিসাবে আদায় করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রথমে প্রলোভন দেখান যে, রাজবাড়ীর রসীদ দেওয়া যাইবে। অনন্তর "বৈকুণ্ঠধামে" যাত্রীবৃন্দকে লইয়া গিয়া তালপত্রে নামধাম লেখাইয়া লইয়া বিষ্ণুর নিকট ত্রিসত্য করাইয়া লয়েন। তাহার পর যাত্রীরা টাকার রসীদ চাহিলে বা তাহাদের বিশ্বাস-

সূচক কোন লিখন চিহ্ন চাহিলে, বলেন, পুরীধাম পঞ্চায়েতের রসীদ দিব। তাহার পর নানা কথায় গোলমালে তাহা সারিয়া লইবার চেষ্টা করেন। আমরা পুরীধামের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি ইহা অবগত আছেন কি না? বা আটিকা বন্ধন বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে কি না? যদি থাকে, তবে তাহার নিয়মই বা কি? তাহা জনসাধারণের গোচরীভূত করা কর্ত্তব্য। প্রভুর ভোগ হইবে বলিয়া পাণ্ডাগণ যদি প্রভুকে ফাঁকি দিয়া অর্থ আত্মসাৎ করে তবে তাহার কি কোন প্রতিকার নাই?

আমরা আশা করি পুরীর সংবাদপত্র রত্নাকর এবিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া বিরাট হিন্দু সমাজের আশঙ্কা, উদ্বেগ, অত্যাচার ও ধর্ম্মের অন্তরায় দূরীভূত করিতে সচেষ্ট হইবেন। রত্নাকরে এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে জনসাধারণ, সাধারণ নিয়ম জানিয়া পরিতুষ্ট এবং প্রতিকারের আশা করিতে পারে। (মেদিনীপুর হিতৈষী ২৭শে মাঘ ১৩২৫।")

ন'দের চাঁদ গোরা রায়।

——:•:——

ওগো, পাপীর সখা, প্রেমের রাজা, শচীর নিমু, ন'দের গোরা,
বিশ্ব প্রেমিক প্রেম বিলাতে আপনি হলে গোলোক ছাড়া;
আর্ত্তজনের আর্ত্তরবে, রহতে নারি সিংহাসনে,
নামি এলে মর্ত্ত্যধামে, দুখ্ ভুলাতে, প্রেমের গানে।
বৃন্দাবনে গোপীর লীলা, কালিন্দীতে সাঁতার কাটা,
বাঁশীর স্বরে প্রাণ মাতান, নিত্য নূতন প্রেমের ঘটা,
সে সব ব্যর্থ ক'রেছিল, পাপী তাপীর আর্ত্তরব,
তুমি যে গো ভক্তপ্রিয়, ভক্ত তোমার প্রাণের সব।
তাই গুরুরূপে নাম বিলাতে, শিক্ষা দিতে প্রেমের ধারা,
রাধার প্রেম গুরু ক'রে, পথে বেড়াও কাঙ্গাল পারা,
ভক্ত সখা, ভক্ত প্রেমিক, ভক্তি নিয়ে মারামারি
প্রেমের ভ'রে মাতুকেরে ধ'রেছিলে বক্ষোপরি!

হরিনামের অমর সুধা, পান করাতে তৃষাতুরে,
মাতার স্নেহ, প্রিয়ার প্রেম, অবহেলে তুচ্ছ ক'রে,
বাঁশী ছেড়ে দণ্ড ধ'রে,—পাপী তাপীর ঘরে গিয়া,
বিশ্ব প্রেমের আকুল গীতি, গেয়ে কর্‌লে শান্ত হিয়া।
রাখাল রাজা রাধার প্রেমিক রাধার প্রেমের অগাধ ঋণী,
শোধ করিতে কালরূপে, ধর্‌লে কান্তিস্বর্ণ জিনি,
পথে, ঘাটে, গোঠে মাঠে, রাধা রাধা রাধা ক'রে
চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, কাদ্‌লে জীবের দ্বারে দ্বারে!
কলির হরি প্রেমিক পাগল, ন'দের দণ্ডী গোরা চাঁদ,
জগৎজনে বুঝিয়ে দিলে, রাধার প্রেমের মোহন ফাঁদ।
চিন্‌তে নারি বুঝ্‌তে নারি, কালা তোমার জটিল লীলা
প্রেমের রাজা প্রেম শোধিতে, হ'য়েছিলে গোলোক ছাড়া!
(দয়াল) সেবার যেমন এসেছিলে আবার তেমন এস গোরা।
আশার আশায় আছি বসে (এবার) কর্‌বো তোমায় নয়ন তারা॥

হরিদাসের নির্য্যাণ।

—:•:—

আমাদের প্রভুর এখন নিয়ত বিরহ বিকারের দশা। স্বরূপ ও রামানন্দ সতত প্রভুর সন্তর্পণে ব্যস্ত ও যত্নশীল। গোবিন্দ প্রভুর পাচক ও পরিচারক। একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া হরিদাসের বাসায় গেলেন। হরিদাসকে দিবেন। ঠাকুর হরিদাস শয়নে থাকিয়া মন্দ মন্দ সংখ্যা নাম জপিতেছেন। গোবিন্দ হরিদাসকে উঠিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। হরিদাসের সংখ্যা সঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ হয় নাই, তাই হরিদাস লঙ্ঘন করিবেন, কিন্তু মহা প্রসাদইবা কেমনে উপেক্ষা করা যায়।—এই ভাবিয়া ঠাকুর হরিদাস মহা-প্রসাদকে প্রণাম করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উহার এক রঞ্চ (কণা) মাত্র মুখে দিলেন। এই দিনের কথা এই পর্য্যন্তই।

অন্যদিন প্রভু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস, শরীর সুস্থতো?" হরিদাস প্রভুকে অভিবাদন জানাইয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভো! আমার দেহ ভালই আছে, কিন্তু মন ও বুদ্ধি অসুস্থ।" প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাধি কি সাব্যস্ত হইয়াছে?" হরিদাস কহিলেন, 'সংখ্যা সঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ করিতে পারিনা,—এইতো ব্যাধি প্রভু।" প্রভু কহিলেন, "এখন বুড়া হইয়াছ, সংখ্যা অল্প করাই সঙ্গত। বিশেষতঃ তোমার এ সিদ্ধ দেহ, ইহাতে আর সাধন কি? জীব নিস্তারিতে তোমার অবতার; নাম মহিমা প্রচার অনেক করিয়াছ। এখন সংখ্যা কম করা আমার মত।" হরিদাস কহিলেন, "প্রভো, হীনকুলে জাত এই নিন্দিত দেহ আমার, সতত হীনকর্ম্মে লিপ্ত—আমার মত অধম পামর জগতে আর আছে কি? তোমার কৃপার বলিহারি। তুমি এই অদৃশ্য অস্পৃশ্য পাষণ্ডকেও অঙ্গীকার করিলে, ঘোর রৌরব হইতে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। যারে যেমনে নাচাও, সে তেমনে নাচে। এ অধমকেও অনেক নাচাইয়াছ প্রসাদ করিয়াছ—আমি ম্লেচ্ছ, আমাকে বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্রও খাওয়াইয়াছ। যাহা বাঞ্ছা করি নাই, তাহাও দিয়াছ। কেবল তোমার প্রসাদামৃত সিন্ধুতেই ডুবাইয়া রাখিয়াছ।—আজ আমার বহুদিনের এক বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে, তোমার শ্রীচরণে এই এক ভিক্ষা।"

'প্রভুগো, আমার মনে লয় তুমি শীঘ্রই লীলা সংগোপন করিবে। তা প্রভু, আমার এইবার যেন তোমার সেই মর্ম্ম ঘাতিনী লীলা দর্শন করিতে না হয়। আমি দেখিয়া সহ্য করিতে পারিবনা। সর্ব্বলোক প্রাণনাথ, আমার এই কর যেন তোমার সাক্ষাতে দেহ রাখিতে পারি। যেভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সাধ তাহা তোমাকে বলি,—"তোমার কোমল চরণ যখন আমার হৃদয়ে তুলিয়া ধরিব, তোমার চাঁদবদনে নয়ন দিয়া থাকিব, জিহ্বায় অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে থাকিব সেই শুভযোগে যেন আমার প্রাণ এ দেহ ত্যাগ করে। তোমার প্রসাদে ইহা আমার দুরাশা বলিয়া মনে হয়না। তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, অনাথের নাথ, তাই বড় ভরসা মনে।"

করুণারসমুদ্র প্রভু স্নেহরসে উদ্বেলিত হইয়া কহিলেন, "হরিদাস, কৃষ্ণ ভক্তাধীন; তুমি যাহা মাগিবে, তিনি অবশ্য তাহা তোমাকে দিবেন। তোমার তো চিত্তসাধ পূর্ণ হইবে, কিন্তু আমার? আমার সুখ সম্পদ আনন্দ কেবল

তোমাদেরে নিয়া সুতরাং হরিদাস, তোমরা চলিয়া গেলে আমি কোন্ সুখে বা কাহাদের নিয়া এ আনন্দের হাটে বসিব, খেলিব? কাহাদের মুখ পানেই বা তাকাইয়া প্রাণ জুড়াইব? আমারে দুঃখে ভাসাইয়া তোমার যাওয়া কি সঙ্গত?" হরিদাস চরণ ধরিয়া কাতরে কহিলেন, "প্রাণসর্ব্বস্ব প্রভু আমার, এ সব মায়ার ছলা পরিত্যাগ করিয়া পতিত আমাকে দয়া কর, আমার বাঞ্ছা পুরাও, বঞ্চিত করিওনা। তোমার লীলা সহায় কোটি কোটি ভক্ত তোমার সহচর, নিজ জন; তাঁহারা আমার মাথার মণি, মহামহিমময় এ সব লোকবন্দ্য কোটি ভক্ত বিদ্যমান থাকিতে, আমি একটা কীট মরিয়া গেলে, প্রভু, তোমার এই মধুর লীলার কি হানি হইবে? একটা পিপীলিকা মরিয়া গেলে এই পৃথিবীর কি আসে যায়? তুমি ভক্ত বৎসল, আমিতো ভক্ত নহি। তোমার ভক্তবাৎসল্যে আমার দাবী নাই। তবে এক ভরসা তুমি দয়াময় দীনবৎসল। হে কাঙ্গালশরণ, এ দীন কাঙ্গালের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কৃপণ হইওনা।" প্রভু নীরবে হরিদাসকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভু সর্ব্ব-ভক্ত সঙ্গে লইয়া হরিদাসকে দেখিতে আসিলেন। প্রভুর চিত্তে আজ কি ভাব। তিনি অদ্য সকল ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া আসিলেন কেন? বাঞ্ছাকল্প বৃক্ষ গৌরমণি কি অদ্য সত্য সত্যই হরিদাসের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আসিলেন। ভক্তবাঞ্ছারও কি এত শক্তি এত মহিমা?—ভক্তের বাঞ্ছা কি অপূর্ণ থাকিতে পারেনা? ভক্তির বাতাস লাগিলেই বুঝি কল্পপাদপের ফল পড়িয়া যায়? প্রভু অচিন্ত্য চিন্তামণি অনন্তভাব-স্বর্ণ-প্রসূ। উহা হইতে অদ্য কোন্ গুপ্ত সোণা ফলিবে তাহা আগে কে বলিতে পারে? আসুন্ সবে, একটু প্রতীক্ষা করি, প্রভু কি করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের যে আনন্দমধুমূর্ত্তির দর্শন পিপাসায় আমরা প্রাঙ্গনে মাথা কুটি, চিন্তানিবেশে কি স্বপ্নাবেশে ভাগ্যবশে কচিৎ আভাস মূর্ত্তি দর্শন করি বা ভাগ্য দোষে দর্শনাশায় একবারে বঞ্চিত—সেই মধুঘন গৌরমূর্ত্তি স্বয়ং ভক্ত পরিবার নিয়া নীলাচলে লোকলোচন সমক্ষে বিচরণ করিতেছেন। শ্রীগৌরচরণ বন্দনা করিয়া হরিদাস বৈষ্ণবগণের পাদ বন্দনা করিলেন। অতঃপর ইঙ্গিতে আলাপ।

প্রভু কহে হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে প্রভু যে আজ্ঞা তোমার। শ্রীচৈঃ চঃ।

চাঁদমুকুট নক্ষত্র লোকে এক সাড়া পড়িয়া গেল!—প্রভুর ইঙ্গিতে অঙ্গণ মাঝে স্বরূপাদি প্রভুগণ হরিদাসকে বেড়িয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভঙ্গীমধুর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মৃদঙ্গ করতাল ও গীত সমস্বরে মধু বর্ষণ করিতে থাকিল। প্রভু রামানন্দ সার্ব্বভৌমাদির সম্মুখে হরিদাসের গুণাবলী বর্ণন করিতে করিতে যেন বিহ্বল হইলেন, মহাসুখে ভাসিতে থাকিলেন। হরিদাসের গুণ গাহিতে প্রভুর পঞ্চমুখ। একমুখে যেন কুলায় না। ভগবান্ ভক্তকে বাড়াইয়া থাকেন সত্য; কিন্তু প্রভুর গণের গুণাবলী তাঁহার বাড়েনা, স্বরূপ বর্ণনা মাত্র। তবে প্রভু মুখে ভক্ত-গণ-গাথা বড়ই মধুর লাগে এবং মহিমার চমৎকারিত্ব ঘটায়। প্রভু ভক্তের গুণ গাহেন, ইহা শুনিতে কি ভাবিতেই জীব বড় বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া ভগবচ্চরণে স্বতঃই নত হয়।

শ্রীমুখে হরিদাসের গুণ কীর্ত্তন শুনিয়া তন্মহিমাকৃষ্ট ভক্তবৃন্দ বিপুলানন্দে, উৎফুল্ল হইলেন এবং চরণ রজঃ ধারণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন। হরিদাস প্রভুকে সিন্নাগ্রে বসাইলেন এবং নিজ নেত্রভৃঙ্গদ্বয় প্রভুর শ্রীমুখপদ্মে স্থাপন করিলেন ও প্রভুর শ্রীচরণ শতদল স্ববক্ষে তুলিয়া ধারণ করিলেন। সর্ব্বভক্তগণের পদরেণু তাঁহার মস্তকের ভূষণ হইল। বদনে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" ধ্বনি ঘন সমুচ্চারিত হইতে থাকিল। নেত্রভৃঙ্গ প্রভুর রূপমাধুরী পান করিয়া হরিদাসের চিত্তে চ[illegible] নির্ম্মাণ করিতে থাকিল। আহা বক্ষে শ্রীপাদ কমল নেত্রধারায় উৎপ্রক্ষালন; বদনে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" রসনাম অবিরাম।—হেনই সময় অচিন্ত্য সৌভাগ্যযোগে, অহো ভাগ্য কি হইল!—হায় হায় আমাদের হরিদাস, জগবন্দ্য, প্রাতঃস্মৃত্য ভক্ত হরিদাস—যাহাকে ব্রহ্ম-হরিদাস বল—যাঁহাকে প্রহ্লাদ হরিদাস বল—"বদনে না ছাড়িমু হরিনাম"—মুলুকপতির পরীক্ষা-কালানল বিজয়ী সত্যসন্ধ হরিদাস।—সেই মরা-বাঁচা হরিদাস—বেশ্যারও সর্ব্বআরাধ্য সিদ্ধিদাতা গুরু হরিদাস—যে হরিদাস "ধাঙ্গাঙী হ'য়ে লুট বিলা'ল সহরে"—"হরিদাসের নৌকা করি নিতাই সাজিল। দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল।"—আমাদের কলি-জীবের উদ্ধার পথ সেই দাঁড়ী হরিদাস—সেই নামপথচারী হরিদাস—আর কি করিলেন॥ তাঁহার কি হইল!—যাহা কাহারও হয় নাই, হবে না, তাহাই হইল! অদ্ভুত হরিদাসের প্রাণ মহোৎসবে উৎক্রমণ করিল! হরিদাসের

লীলা—ভুবনপাবনী লীলা—সাঙ্গ হইল। হরিদাস আর ইহ-জগতে নাই। নীলাচলে লীলা সাঙ্গের এই প্রথম সূচনা।—চাঁদের হাটের এক বড় দোকান ভাঙ্গিল। আমাদের প্রভু আজ তর্জ্জনীটি বিদায় দিলেন।

আজ প্রভুর গম্ভীর হৃদয় সমুদ্রে যে কি ভাবের তরঙ্গান্দোলন চলিতেছে, তাঁহার তিনিই একমাত্র অনুভবিতা। শ্রীনবদ্বীপ ভূমি বক্ষের হরিদাসকে আর বক্ষে তুলিতে পাইলেন না। গৌড় গগনে লক্ষ চাঁদের উদয় ও সমাবেশ হইয়াছিল। এ যে গোলক-ক্ষীরোদের মথিতোত্থিত চাঁদের মেলা!—চাঁদের রাজা মন্ত্রী গৌরনিতাই আজি হরিদাস হারা। হরিদাস অনেক আছেন বটে কিন্তু এ হরিদাসের মত হরিদাস ত্রিলোকে মিলে কি? ধরণী আজ এমন সুপুত্র হারাইলেন, যাঁহার স্মৃতি ধরণী মাতার কণ্ঠে নিত্য দোদুল্যমান মাণিক্য ভূষণ। হরিদাসের মা নাই কাঁদিবে কে? কিন্তু হরিদাসের মা স্বয়ং ধরিত্রী; কিন্তু তিনি কাঁদিবেন কি, শোকস্তম্ভিতা! জগজ্জীবের মা-বাপ প্রভু ভগবান্ প্রেমানন্দে বিভোর। শোক চূর্ণ হইয়া প্রেমরসে মিশিয়াছে। হরিদাসের মৃত্যু, কেমন মৃত্যু?—"মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।" এই অলৌকিক অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে ভক্তবৃন্দের ভীষ্ম নির্ধাণ-স্মৃতি জাগরিত হইল। এখন আর কি, কেবল "হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ" উচ্চরোল সবারি মুখোদ্গারিত ঢেউ। নাম-কোলাহলে প্রেমানন্দ বিহ্বল প্রভু হরিদাসের তনুখানি কোলে তুলিয়া নিয়া অঙ্গনে উদ্দাম নাচিতে থাকিলেন। প্রভুর আবেশ দর্শনে সর্ব্ব ভক্ত কীর্ত্তনানন্দে, আরো মাতিয়া গেলেন। কতক্ষণে প্রভুর আবেশ ভঙ্গ হইল।

স্বরূপ গোস্বামীর প্রস্তাবে এবং প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তবৃন্দ হরিদাস ঠাকুরের দেহ স্কন্ধে তুলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রতটে নিয়া আসিলেন। মরিলে কেহ স্বর্গে, কেহ বৈকুণ্ঠে, কেহ গোলকে যান—ইহাও সাধারণের অনুমান সিদ্ধ, কিন্তু হরিদাসের পক্ষে ইহা সাক্ষাৎ স্বর্গ, সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ, সাক্ষাৎ গোলক। হরিদাসের শবের আগে আগে প্রভু স্বয়ং এবং তৎপশ্চাৎ পণ্ডিত বক্রেশ্বর নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনের প্রেম-প্রবাহ তাণ্ডব-তরঙ্গ তুলিয়া প্রাকৃত সিন্ধুর লাগলা জন্মাইয়া তদভিমুখে যাইতেছেন।

ভক্তগণ শ্রীনামানুকীর্ত্তনোত্থিত প্রেম-সুধা-রসে সিন্ধু-সলিলরাশিকে অধিক লবণ সুশীতল সুবাসিত করিয়া তাহাতে হরিদাসকে স্নান করাইলেন। সিন্ধুর

হরিদাসের পদরজঃ বক্ষে লইয়া কৃতার্থ। মহা ভাগ্যবান্ সিন্ধুর বক্ষে এক অপূর্ব্ব দিব্য লীলা সংঘটিত হইল। বঙ্গোপসার আজ প্রশান্ত মহাসাগর আটলাণ্টিক মহাসাগর চেয়েও লক্ষ গুণে ধন্য। সিন্ধু বক্ষে বহু বহু হিংসাবিদ্বেষবিগ্রহাদি চতুর্যুগে ঘটিয়াছে, কিন্তু এমন প্রেমের পবিত্র দৃশ্য, গোলোকের ফলিত চিত্র, আর কভু খুলে নাই। তাই সাগর জাতির বংশের ছাওয়াল বঙ্গ-সাগর-কূল পবিত্র করিলেন। বঙ্গসাগরের কূলে সলিলে কলিতে এই অবতারে যে লীলা হইল, কস্মিন যুগে এমন আর হয় নাই। রামাবতারে সমুদ্রের বন্ধন, গৌরাঙ্গাবতারে, মুক্তি তুচ্ছ, প্রেমালিঙ্গন সুখ সম্ভোগ! শ্রীগৌরাঙ্গ বঙ্গ বক্ষে কত আলিঙ্গন দিলেন, কত ক্রিড়া কৌতুক আনন্দোৎসব করিলেন। বঙ্গই গৌরাঙ্গের রঙ্গ নিকেতন!

তখন ভক্তবৎসল প্রভু আনন্দকল্লোচ্ছ কণ্ঠে কহিলেন,—

"—সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা।" শ্রীচৈঃ চঃ।

সাধুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে সমুদ্র মহাতীর্থ হইলেন।

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥ (১।১৩।১ শ্রীমদ্ভাগবতম্)

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

স্বয়ং ভগবান্ অবগাহনক্রমে সমুদ্রকে তীর্থীকৃত করিয়াও ভক্তের স্পর্শ মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ প্রকাশমান থাকেন। সুতরাং পরোক্ষভাবে সমুদ্র তীর্থীকৃত, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ যে সাক্ষাদ্ভাবে অবগাহন করিলেন, সে কথা প্রভু গোপন করিলেন।

ক্রমশঃ।

মূর্ত্তি উপাসনা।

(লেখক—শ্রীযুক্ত জহর লাল সিংহ।)

—:০:—

এই কথা সর্ব্ববাদি সম্মত যে, এই বিশ্বের অর্থাৎ সৃষ্ট জগতের মূল কারণ এক অনাদি অনন্ত পূর্ণ শক্তি সমষ্টি। এই শক্তি হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই শক্তির সত্তা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে অপ্রতিহত। ইঁহাতে সকলই সম্ভব, এবং ঈশ্বরবাদী আস্তিকগণ ইঁহাকেই পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন। প্রায় সকল আস্তিকগণের মতেই এই "মূল কারণ" (পরমেশ্বরঃ) সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বজ্ঞ। কেবল চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ "সর্ব্বজ্ঞ" না বলিয়া "জড়শক্তি" বলিয়া থাকেন। এ প্রবন্ধে নাস্তিকগণের জড়শক্তি বিচারের আবশ্যক নাই এবং করিবও না। ইহ জগতে মনুষ্যের উপাস্য কি? নিগুর্ণ এবং সগুণ ভেদে ব্রহ্মই যে একমাত্র উপাস্য এতৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় ইচ্ছা আছে।

শিষ্য।—গুরো! আমরা উপাসনা করি কাহার?

গুরু।—যিনি এই বিশ্ব সংসারের অধীশ্বর, তাঁহারই।

শিষ্য।—গুরো! উপাসনা করি কেন?

গুরু।—ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য।

শিষ্য।—উপাসনা কত প্রকার এবং কি কি।

শিষ্য।—উপাসনা দুই প্রকার (১) সগুণ (২) নিগুর্ণ।

শিষ্য। নিগুর্ণ উপাসনা করাই ত ভাল। সগুণ উপাসনা করি কেন তাহা বুঝাইয়া দিন।

গুরু।—দেখ, প্রথমে বুঝা প্রয়োজন, যাহাকে জ্ঞানে পাওয়া যায় না, তাহার ধারণা কেমন করিয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমরা স্থূল শরীর আশ্রিত একাদশ—করণ (ইন্দ্রিয়) যুক্ত জীব। যাহা কিছু অসীম, নিরাকার এবং নিগুর্ণ, তাহা আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের অবিষয় ও অতীত। মন, বুদ্ধি, আপনাকেই ভাব

মাত্র বুঝিয়াই নিরস্ত। চিন্ময় বস্তুর গঠিত মূর্ত্তি কোথায় পাইবে? এই চিন্ময় বস্তুর ধারণার জন্যই, রূপ ও মূর্ত্তির কল্পনা। সেই জন্য স্বভাবতঃ সগুণের উপাসনা করিতে বাধ্য হই।

শিষ্য।—সকল সম্প্রদায়ের উপাসকগণ উপাসনা কালে কি বলিয়া উপাসনা করেন? অর্থাৎ মুখে কি বলেন, চক্ষে কি দেখেন, কর্ণে কি শুনেন এবং মনে মনেই বা কি চিন্তা করেন?

গুরু।—উপাসকগণ কেহ বলেন "হে প্রভো! হে পিতঃ! হে বিশ্ব জননী! এ তাপিত সন্তানকে তোমার শীতল ক্রোড়ে স্থান দেও!" খৃষ্টানগণ বলেন যে "হে প্রভু! স্বর্গ রাজ্যে আপনার পাদানীর নিয়ে এ দাসকে একটু স্থান দিন" ইত্যাদি। উক্ত উপাসনা বাক্য দ্বারা কি স্থুল দ্রব্য বুঝাইতেছে না? উপাসক! তুমিই বল দেখি যে, যখন তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া "হে প্রভো! হে পিতঃ! হে জননী বলিয়া ডাক, তখন কি তোমার চক্ষুর সম্মুখে তোমার প্রিয় পিতা মাতার মুখের ছবির মত কোন ছায়া-ছবি ভাসিয়া উঠে না? "হে প্রভো! স্বর্গ রাজ্যে পাদানীর নিচে স্থান দাও" বলিলে কি একটী সমৃদ্ধ রাজ প্রাসাদ, সিংহাসন, পাদানী প্রভৃতির ছায়া-চিত্র মন ও চক্ষুর সাম্‌নে নৃত্য করে না? বাজে তর্ক ও আত্মম্ভরিতা ছাড়িয়া দিয়া নিজ্জর্নে বসিয়া মুদ্রিত চক্ষে এই সকল উপাসনা বাক্য ও স্বর্গ বর্ণনা প্রভৃতি চিন্তা করিয়া করিয়া আপন আপন মনেই দেখ, দেখিতে পাইবে, কতকগুলি ছায়া চিত্র বা কল্পনা লইয়া বসিয়া আছ। এক্ষণে স্থির ও প্রশান্ত অন্তঃকরণে বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখ, দেখিবে যে, যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহারা সকলেই মূর্ত্তির (নাম, রূপ ও গুণের) উপাসক। দেখ, যাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে না বা সন্দেহ হইবে তাহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে যতদুর সাধ্য বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব।

শিষ্য—গুরুদেব সকল সম্প্রদায়ের সহিত হিন্দুর "মূর্ত্তি উপাসনার" প্রভেদ কি?

গুরু।—উপাসনা—প্রণালী বিভাগ করিলে প্রভেদ প্রকাশ পাইবে। পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উপাসনা দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ। এই সগুণ উপাসনায় প্রথমে নাম—শব্দ সঙ্কেত বা মন্ত্র। এই নামের (শব্দের) অর্থের

সহিত সম্বন্ধ আছে। যেমন "গো" একটী পদ, এই "গো"—পদের অর্থ চতুষ্পদ, শৃঙ্গ, পুচ্ছ, শ্বেত, কালইত্যাদি বর্ণ বিশিষ্ট "গোপশু।" এই গো পশুর সহিত "গো"—পদটী ওতপ্রোত ভাবে সম্বন্ধ যুক্ত। "গো" শব্দ উচ্চারণ করিলেই, এই শব্দ সম্মুখের আকাশস্থ বায়ুতে লয় প্রাপ্ত হইলেও, তাহার ভাব অর্থে গিয়া বর্ত্তাইবে—যদি তোমার সম্মুখে ঐ অর্থ ("গো" পশু) বিদ্যমান থাকে। অর্থের—অবিদ্যমানে এই শব্দের ভাব (সত্তা) আমাদের চিত্তবৃত্তিতে বা স্মৃতিতে আরূঢ় যে "গো-পশুর ভাব" আছে, তাহাকে জাগরূক করিবে। সকল পদ ও পদার্থ এইরূপ ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত আছে।

এখন বিবেচনা কর যে, কোন পদার্থ বুঝিতে বা জানিতে হইলে অগ্রে তাহার নাম (শব্দ-সঙ্কেত) করিতে হয়। এই নাম দ্বারা সেই বস্তুর ধারণা বা জ্ঞান হয়। এই "শব্দ ধারণা" ঈশ্বর পক্ষে "নাম" (শব্দ ব্রহ্ম) উপাসনা। এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যের চক্ষুরাদি—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপেরও অবয়বের ধারণা হয়। এই রূপ বা অবয়ব ধারণাই ঈশ্বর সম্বন্ধে "সাকার—উপাসনা।" বস্তুর নাম ও রূপের জ্ঞানের সহিতই তাহার বাহ্য সম্পর্কীয় গুণের জ্ঞান বা ধারণা স্বতঃ আমাদের অন্তরেন্দ্রিয় মনে উদিত হয়। বস্তুর এই মনোগম্য গুণ ঈশ্বর পক্ষে গুণ—উপাসনা। উপাসনা কালীন যাহাতে তাহাতে মন না রাখিয়া সাধকের "ঐশ্বরিক ভাব" ব্যঞ্জক এক মূর্ত্তিতে চিত্ত রাখাই শ্রেয়ঃ এবং তৎ কল্পিত ধ্যান অতি ফলোপধায়ক।

শিষ্য।—একণে এ বিষয় কিছু কিছু বুঝিলাম বটে, কিন্তু কল্পিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর জ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র এবং অসম্ভব বলিয়াইতো মনে হয়।

গুরু।—দেখ, তাহা বলিতে পার না, কারণ তোমার কল্পনা কি ঈশ্বর ছাড়া? না তাঁহার অগোচর? ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা তাঁহার করুণা আকৃষ্ট হইলে, তোমার প্রিয়তম কল্পিত মূর্ত্তিতে তাঁহার সাক্ষাৎকার হওয়া কিছুই অসাধ্য নহে।

শিষ্য।—নিরাকার উপাসকেরা যে উপাসনা করেন তাহা কিরূপ?

গুরু।—তাহা আকাশ-কুসুমের ন্যায়। দেখ স্বীয় স্বীয় উপাসনার সময় নিজ নিজ চিত্তপট খুলিয়া ও খুঁজিয়া দেখ, দেখিবে যে, মনে ঐ সময় কত বাজে চিন্তা আসিতেছে ও যাইতেছে। এবং যে ভগবানের উপাসনা করিতেছ, তাঁহার সম্বন্ধে কোন একটী বিশেষ ভাব না থাকাতে ও মন একাগ্র হয় না। আর "হে

ভগবান। হে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাকার বলিলে মন স্থির হয় কি? সনাতন ধর্ম্মের আচার্য্যগণ উপদেশ করিয়াছেন যে, উপাসনাই মনের একাগ্রতা ও স্থৈর্য্য উৎপাদন করে। মনের এই একাগ্রতা ও স্থৈর্য্য হইতে শান্তি লাভ (অভিষ্ট সিদ্ধি) হয়। এই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আমরা ঈশ্বরোপাসনা করি। মুদ্রিত চক্ষে "হে দয়াময়! হে আমার স্বর্গস্থ পিতঃ!" বলিয়া ডাকিয়া কাহারও মন একাগ্র ও স্থির হইয়াছে কি? সাময়িক হইতে পারে কিন্তু মুদ্রিত চক্ষে ঐরূপ আলম্বন শূন্য উপাসনাতে কাহারও স্থায়ী চিত্তস্থৈর্য্য হওয়া দুষ্কর।

শিষ্য।—মূর্ত্তি উপাসনার ব্যবস্থা কি জন্য হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ করিয়া একণে বুঝাইয়া দিন।

গুরু।—প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ উপাসনাতে চিত্ত স্থিরভাবে নিয়োগ করিয়া শান্তি লাভের নিমিত্তই উহা ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শিষ্য।—কিরূপে চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করা যায়।

গুরু।—মূর্ত্তি উপাসনায় একাধারে নাম, রূপ ও গুণ স্থাপিত আছে বলিয়া শীঘ্রই চিত্ত একাগ্র হয়। চিত্ত একাগ্র হইলেই ধ্যান-ধারণা সহজ সাধ্য হয়। এই ধ্যানের—পরিনামই সমাধি। এই সমাধি হইতে পরম অভীষ্ট শান্তি লাভ হয়।

শিষ্য।—চিত্তস্থৈর্য্য দ্বারা যে অভীষ্ট লাভ হয় তাহার প্রমাণ কি?

গুরু।—দেখ, একে একে পূর্ব্বে সমস্তই তোমায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। তোমার এইরূপ ভ্রান্তি দূর করণার্থে প্রশ্নে আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম প্রকৃত মূর্ত্তি উপাসনার আবশ্যকতা যে কেন তাহা বুঝিয়াছ এবং যখনই সন্দেহ হইবে তখনই ভঞ্জন করাইবে। বৎস! এক পবিত্র যোগীর প্রশান্ত * চিত্র সম্মুখে রাখিয়া খোলা চক্ষে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার গুণগ্রাম (নাম,

* যদি তুমি বৌদ্ধ হও তো ভগবান গৌতম বুদ্ধের মূর্ত্তি ধ্যান কর; যদি তুমি খৃষ্টান হওত প্রভু যীশু খৃষ্টে বা কুমারী মেরীর মূর্ত্তি ধ্যান কর; যদি তুমি শাক্ত হওতো শক্তির, সৌর হওতো সূর্য্যের, বৈষ্ণব হওতো বিষ্ণুর মূর্ত্তিতে মন সংযত কর; দেখিবে যে তোমার চিত্ত একাগ্র ও শান্ত ভাব ধারণ করিতেছে।

রূপ, গুণ) ধ্যান কর, দেখিবে যে, তোমার মন একাগ্র ও শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। এমন কি ঐ চিত্তের প্রশান্ত ভাব তোমার মন অধিকার করিয়াছে। তুমি তদ্ভাবাপন্ন হইয়া অচল স্থানুর ন্যায় হইয়া গিয়াছ। এইরূপে দীর্ঘকাল অভ্যাস করিতে করিতে তোমার চিত্ত প্রসাদ আসিবে, এবং তুমি শান্তির দিকে অগ্রসর হইবে। চিত্তের শান্তিই উপাসনার বা সাধনার চরম ফল।

আর্য্য ঋষিদের উপদিষ্ট মূর্ত্তি ("নাম, রূপ, গুণ") এবং নব্য সম্প্রদায়ের উপদিষ্ট ("হে দয়াময় পিতঃ ইত্যাদি") এই উভয় বিধ উপাসনাই অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যক্ষ কর, কোন্‌টী সুগম ও শান্তি প্রদ। এ সম্বন্ধে আর তর্ক যুক্তি দেখাইবার আবশ্যক নাই। দীর্ঘকালের অভ্যাসই সুফল দেখাইয়া দিবে। এবং প্রথম প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্ববাদি—সম্মত "মূল কারণ"="অনাদি অনন্ত পূর্ণ শক্তি"=(ঈশ্বরবাদীর) "পরমেশ্বর"=(শক্তিবাদীর) "পূর্ণ শক্তি"=(ব্রহ্মবাদী) "পূর্ণব্রহ্ম ও মায়া" বা "পুরুষ-প্রকৃতি," এই বিশ্ব সংসারে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমান বিদ্যমান; এই মূর্ত্তি উপাসনা গৌণভাবে সেই মূল কারণের উপাসনাই হইতেছে।

শিষ্য।—গুরুদেব! একে একে মূর্ত্তি উপাসনার বিষয়তো সমস্ত অবগত হইলাম তবে এক্ষণে শাশ্বত সুখ লাভের উপায় বর্ণনা করিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু।—যাঁহারা শাশ্বতী শান্তি চান, তাঁহাদের ভগবানের প্রকৃত শান্ত স্বরূপেই ভক্তি করা উচিত। আরও জানা উচিত যে হিন্দুর "মূর্ত্তি উপাসনা" প্রস্তর বা পুত্তলিকার উপাসনা নহে। হিন্দুরা ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে জানিলেও, উপাসনার সময় মুদ্রিত নয়নে অন্ধকার দেখিতে দেখিতে উপাসনায় অপেক্ষা কোন ঐশ্বরিক ভাব ব্যঞ্জক মূর্ত্তিতে মন রাখিয়া সহজে হৃদয়-শুদ্ধি ও ভগবৎপ্রেম লাভ করেন।

ভক্ত কবির ভাবোচ্ছ্বাস।

"হরি হরি, কিশেল রহিল মোর বুকে।
কি লাগি রসিকরাজ কাঁদে সংকীর্ত্তন মাঝ
না বুঝিয়া ম'নু মনোদুঃখে।"—

ভক্তকবি বলরাম দাসের এই করুণোচ্ছ্বাস কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের প্রকৃত দুঃখটিকে জাগাইয়া তুলে। আমাদের দুঃখ কি, যদি আমরা একটু নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, উহা আর কিছুই নহে,—মাত্র শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ জনিত সুখের অভাব। সকল মানুষেই জানে যে, তার চেয়ে একজন বড় কেহ আছেন, তিনি সকলের চেয়ে বড়, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং ইচ্ছাময়। তথাপি মানুষ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে এবং স্বাধীনতা বা মায়াধীনতা ত্যাগ করিতে চায় না; আর না চাহিয়াই তাহার যত দুঃখ। কিন্তু এমন কতকগুলি স্থল আছে, মানবের চিত্ত-বৃত্তির এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে উপনীত হইলে এই মানুষই কখন কখন পরাধীনতাও স্বীকার করে। ইহা ব্যবহারিকভাবেও সত্য। মানুষ, তাহাকে ভালবাসে এমন একজনের সহানুভূতি পাইলে, তাহার অধীনতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেনা। কারণ, সে তখন আর তাহাকে পর বলিয়া দেখিতে পায় না। তাহার দুঃখের আঘাতে তাহার সেই 'আপন হওয়া' পরটির হৃদয় তন্ত্রীও সমবেদনায় আহত হয় দেখিয়া, সে তাহারই কোলে দুঃখের বোঝা নামাইয়া একটু সুখানুভব করিতে চায়।

যদি মানুষ তা'র চেয়ে বড়, সর্ব্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময় পরটিকে অর্থাৎ শ্রীভগবানকে মানুষের মত হইয়া আসিয়া, তাহাকে ভালবাসেন, তাহার দুঃখে কাঁদেন এবং কত কাঁদিয়াছেনও, এই কথা বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনে, তাহা হইলে তখনই সে তাঁহাকে নির্ভর করিবার আশ্রয় স্বরূপ জানিয়া নিজ দুঃখের ভার লাঘব করে। আর যদি সেই শ্রীভগবানকে সত্য সত্যই ভাল বাসিতে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আসিতে,—তাহারই দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে, আসিতে দেখে তখন মানুষ আর স্বতন্ত্র থাকিতে পারেনা, তাঁহার শ্রীচরণতলে আপনাকে পতিত করে, এবং সকল দুঃখ-যন্ত্রণার হাত এড়ায়।

ভক্ত কবি সকল মানবের এই অবস্থা আপনার মধ্যে উপলব্ধি করিয়াই যেন করুণার উচ্ছ্বাস তুলিয়া বলিলেন,—

"রূপ কোটী কাম জিনি বিদগধ শিরোমণি
গোলকে বিহার কুতুহলে।

ব্রজরাজ নন্দন গোপীকার প্রাণধন
কি লাগি লোটায় ভূমিতলে॥
হরি হরি, কিশেল রহিল মোর বুকে।
কি লাগি রসিকরাজ কাঁদে সংকীর্ত্তন মাঝ
না বুঝিয়া ম'লু মনোদুঃখে॥"

তাঁহার ত কোন অভাব নাই! যে সকল অভাবে মানুষ বিচলিত হইয়া কাঁদিয়া উঠে, সেই সকলের কোন অভাবই ত তাঁহার নাই! তাঁর রূপ কোটী মন্মথজয়ী, তিনি সুরসিক শ্রেষ্ঠ, আবার তাঁহার বিহারস্থলী শ্রীগোলকধাম, যেখানে সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য এবং বৈদগ্ধাদি পূর্ণরূপে নিত্য প্রকাশিত! তিনি ব্রজরাজের একমাত্র নন্দন পুত্র, ব্রজমণ্ডলের সকল গোপিনীর কাছেই প্রাণের তুল্য প্রিয়জন। কোন অভাবত দেখিনা। তবে কেন আজ তিনি, কিসের জন্য, ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত? সেই রসিকরাজ আজ কোন অভাবে সংকীর্ত্তন মাঝে দাঁড়াইয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতেছেন?

কাব্যরস অনুভব করিতে হইলে, কবিকে বিশ্বাস করিতে হয়। তবেই আমরা তাঁহার রসোচ্ছ্বাস হইতে কিছু সত্য উপলব্ধি করিয়া আনন্দ পাইতে পারি, নতুবা নহে। আমাদের যুক্তি তর্কের অতীত রাজ্য,—আমাদের পরিমিত সামান্য জ্ঞানের গতির ও অপ্রাপ্য রাজ্য,—অচিন্ত্য ভাবের রাজ্য হইতে যে সচ্চিদানন্দ কণা নিয়তই আমাদের এই মায়ার জগতে,—পার্থিব রাজ্যে ইহাকে অমৃতায়মান করিতে আসে, ভক্তকবিগণই তাহা প্রত্যক্ষ করেন; এবং এই দুইটী রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ এমন এক মধ্যবর্ত্তিনী অমৃতময়ী ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কবির হাসিও কান্না উভয়ই অমৃত সিঞ্চিত!

আমাদের ভক্তকবি দেখিতেছেন, শারদোৎফুল্ল মল্লিকাসৌরভামোদিত, জ্যোৎস্নাবিধৌত-মুরলীকাকলী মুখরিত, নৃত্যময়ী যমুনালিঙ্গিত, উৎসবময়ী-বৃন্দারণ্যে আকুলতাবিস্রস্তভূষণাগোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিত বল্লবীশ কিশোর আনন্দ-ময় শ্রীনন্দনন্দন! আবার উহারই সম্মুখে অন্তর্কৃষ্ণ বহির্গৌর আলিঙ্গন দিতে বাহু দু'টী প্রসারিত করিয়া ছল ছল নয়নে অশ্রুপ্লাবিত অঙ্গে দণ্ডধারী সন্ন্যাসী বেশে পাপী তাপী সকলকে আহ্বান করিতেছেন! পাঠক মহাশয়,

এই চিত্র দুইখানী মানসপটে অঙ্কিত করিয়া লইয়া কবির মর্ম্মদুঃখটী বুঝিবার চেষ্টা করুন। কবি বলিতেছেন,—

"কি লাগি রসিকরাজ কাঁদে সংকীর্ত্তন মাঝ
না বুঝিয়া ম'নু মনোদুঃখে॥"

তাঁহার এই আকুল ক্রন্দনের কিছুই কারণ দেখিতেছিনা। অথচ, এই অকারণ ক্রন্দনে বড় মনোবেদনা পাইতেছি।

"সঙ্গে বিলসিত যার রাধা চন্দ্রাবলী আর
কত শত ব্রজ কিশোরী।
এবে পহুঁ 'ভাসে বুক'* না দেখেন নারী মুখ
কি লাগি সন্ন্যাসী দণ্ডধারী॥"

যে প্রভু একদিন শ্রীরাধা শ্রীচন্দ্রাবলী এবং ললিতা বিশাখাদি আরও বহু শত ব্রজকিশোরী সঙ্গে লইয়া কতই না মনোরম লীলাবিলাস করিয়াছেন' ওগো তোমরা কেহ কি বলিয়া দিতে পার, কেন আজ তাঁহার বক্ষ ভাসিতেছে? কেন আজ তিনি দণ্ডধারী সন্ন্যাসী হইয়া নারী মুখ দর্শনে একান্ত বিরত? কেন সেই লীলাবিলাস,—নিত্যসুখময় লীলাবিলাস ছাড়িয়া, কাহার জন্য ছাড়িয়া আজ এই করুণারস বিলাস লীলা করিতেছেন? যদি কেহ বুঝিয়া থাক, আমাকে বুঝাইয়া দাও, আমার মনোবেদনা দূর করিয়া দেও। কেন—

"ছাড়ি নাগরালী বেশ ভ্রমে পঁহু দেশ দেশ
পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে (?)।"—

তিনি যে সেই নাগরালী বেশ কেন ছাড়িলেন তাহাত বুঝিতেছিনা। তবে দেখিতেছি, প্রভু আমার নাগরালী বেশ ছাড়িয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া অঝোরে কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে দেশে, ঘরে ঘরে পতিত খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন, আয় তোরা পাপী, তাপী, পতিত, অধম! তোদের মুখের দিকে কেহ ত চাহে না মানব সমাজ কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা কেহই তোদের পানে চাহে না। তাহারা ঋষিনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রের মর্ম্ম ভুলিয়া বহিরাবরণ ভাষা মাত্র লইয়া অন্তরে নিতান্ত জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছে, বাহিরে

* 'বুকে বুক' পাঠান্তর ও দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোন অর্থে তাহা বুঝা যায় না।

কেবল শুষ্ক অনুষ্ঠান আছে মাত্র। তাহারা জীবে জীবে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান ভুলিয়া গিয়াছে, শুধু যুক্তি তর্কের মধ্যেই ধর্ম্মকে পুত্তলিকার মত বসাইয়া রাখিয়াছে। তাই আমি নিজে আসিয়াছি। ধর্ম্মকে সজীব করিতে আর কাহারও শক্তি নাই বলিয়া আমি নিজে আসিয়াছি। আমি যে ধর্ম্মের শিক্ষা দিতেছি, ইহা মানবধর্ম্ম নহে, শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম, মানবের সামান্য ধর্ম্ম নহে, বিশেষ ধর্ম্ম। ইহা হইতে কেহই পরিত্যক্ত হইবেনা।'

শ্রীভগবান দয়াময়। তাঁহার ধর্ম্মও করুণার ধর্ম্ম। উহা মানব ধর্ম্মকে নষ্ট করে না, অথচ মানবধর্ম্ম হইতে আরও সূক্ষ্মতত্ত্ব সমন্বিত সার্ব্বজনীন ভাবের ধর্ম্মকে উহারই পার্শ্বে বসাইয়া দেয়। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন, পতিত জন শ্রীভগবানের নিকট যাইতে পারেনা। শ্রীভগবান এই মানব ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া নিজ করুণাময়ত্ব উজ্জ্বল করিবার জন্য যে পতিতজন তাঁহার কাছে যাইতে পারেনা, নিজেই তাহাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে আসিলেন। তিনি যে প্রেমময়, তাহার সার্থকতা এইখানে। এতদিন তিনি প্রেমিক মাত্র ছিলেন, প্রেমময় ছিলেন না। জগতের চক্ষে এইবার তিনি প্রেমময়ও হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার প্রেমময়ত্ব এইবার মানুষের নিকট সত্য হইল। এত দিন কৃষ্ণ শুধু প্রেমিক হইয়াই ছিলেন। এখন মানুষ জানিল শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, এই চরাচর বিশ্বের সকলেই তাঁহার প্রেমের পাত্র। রাজা রাজকীয় মর্য্যাদা সমন্বিত হইয়া দরিদ্র প্রজার কুটীরে উপস্থিত হইলে, সেই দরিদ্র প্রজা তাঁহার সহিত সখ্য রূপে মিলিতে পারে না, উভয়ের মধ্যে মর্য্যাদার একটা আবরণ বা বাধা থাকিয়া যায়। জগন্নাথ এবার তাই পতিতজনের সহিত মিলিতে, সত্যরূপে মিলিতে সকল মর্য্যাদা দূরে রাখিয়া অথবা লুকাইয়া রাখিয়া ভিখারীর সাজে আসিয়াছেন!

"চিন্তামণি নিজগুণে উদ্ধারিলা জগজ্জনে
বলরাম দাস রহু দূরে॥"

তিনি আসিলেন, নিজগুণে, নতুবা অসাধনে চিন্তামণি মিলেনা। আসিয়া কি করিলেন? জগজ্জনে অর্থাৎ উচ্চনীচ নির্বিচারে সকলকেই উদ্ধার করিলেন। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র যাহাদিগকে পতিত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং তাহা হইতে উচ্চ কিন্তু শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম হইতে পতিত সামান্য ধর্ম্মীগণকেও শ্রীভগবদ্ধর্ম্মে বা বিশেষ

ধর্ম্মে উত্তোলিত করিলেন। এক কথায়, জগতকে প্রেমময় করিলেন, এবং জগতও দেখিল, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়।

কিন্তু "বলরাম দাস রহুদূরে," অর্থাৎ, প্রভু এতেতেও আমার কিছু হইল না। আমি দূরেই রহিলাম। হায়! তবে আমার দুঃখ আর কিসে ঘুচিবে? আমি নিজে ঘুচাইতে পারিনা, তোমাতেও নির্ভর করিতে পারিনা, পরন্তু তুমি ভার লইতে আসিলে, বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিলে, তবু তোমাতে নির্ভর করিতে পারিলাম না। এই দুঃখই আমার বক্ষে শেল স্বরূপ হইয়া রহিল! চক্ষে সকল ব্যাপারই দেখিলাম, তবু বুঝিলাম না! না বুঝিয়াই দুঃখে মরিতেছি। কিন্তু প্রভু! আমি দূরে পড়িয়া থাকিলে, তোমার দয়াময়, প্রেমময়, বিশেষণ দুইটীর সত্যত্বে একটু কলঙ্ক রেখা পড়িবেতো! তাই চিৎকার করিয়া বলিতেছি, প্রভু আমি এখনও দূরে পড়িয়া আছি! তুমি দয়াময়, তুমি প্রেমময়, তাই তোমাকেই জানাইতেছি, আমি দূরে পড়িয়া রহিয়াছি। এস নাথ! এস হে পতিত বন্ধু! এস দয়াময়, প্রেমময় প্রভু! আমাকে উদ্ধার করিতে এস! তোমার দয়াময় প্রেমময় নামটী আরও উজ্জ্বল করিবে এস!

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীধাম-মাহাত্ম্য।

—:•:—

"আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

*　　•　　*

"আনন্দে যে বিশ্বসৃষ্টি তখনি বুঝিবে।"

(১)

ভক্তি তত্ত্ব দেখাইছ পণ্ডিত-প্রবর!
ও ভবে কম্পিত নয় আমার অন্তর॥
কর্ম্মফল, পাপ যত　　হ'য়ে যায় ভস্মীভূত,
অনন্ত প্রেমের উৎস পরমেশ নামে।
নিরন্তর থাক রত তাঁর গুণ-গানে॥

---

(১) "কর্ম্মাণি নিদ্দহতি কিন্তু চ ভক্তি ভাজাং।"
"ভস্মী ভবন্তি তস্যাশু মহাপাতক কোটয়ঃ॥"

(২)

পাইবে পরম বল দগ্ধ হবে পাপ।
কেন না বিচারি' জীবে দিতেছ সন্তাপ!
কর্ম্মে তার অধিকার এই শিক্ষা শ্রীগীতার,
ফলে কিন্তু কদাচন স্বত্ব তার নাই।
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের সার উক্তি এই॥

(৩)

কে করিছে কর্ম্ম, কারে দাও ফল-ভার?
জীবের কি আছে শক্তি কর্ম্ম করিবার?
দেহ জড়, কি করিবে? আত্মা ক্রিয়া-রত কবে?
সর্ব্ববিধ কর্ম্ম হয় প্রকৃতির গুণে।
আপনাকে বাসে কর্ত্তা জীব অভিমানে॥

(৪)

তবে কি প্রকৃতি কর্ত্তা? কেমনে তা হয়!
প্রকৃতি ত জড়, চিৎ-স্বরূপা ত নয়॥
অগ্নি-যোগে লৌহ যথা দাহ শক্তি পায়, তথা
প্রকৃতি পতির বলে কর্ম্ম শক্তি তাঁর।
জড় অন্ধ, চিৎ তার হয় কর্ণধার॥

(৫)

অহং কর্ত্তা মনে করে যেই মায়ামত্ত।
পুরুষেরে হেরে কর্ত্তা সেই মায়া-মুক্ত॥
অজ্ঞান শিশুর প্রায় কর্ত্তা মানে আপনায়
যে মূঢ়, সে ফল পাবে বল দেখি কিসে?
উন্মত্ত কেন বা মুক্তি পায় হত্যা দোষে?

---

(২) "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

(৩) "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে॥"

(৪) "প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগল স্তন।"

(৬)

মানবের বিচারেতে মুক্তি হয় হেন!
ঈশ্বরের সুবিচারে দণ্ড পাবে কেন?
তাই বলিছেন হরি জগজ্জীবে লক্ষ্য করি'
ফলে কদাচন তব নাই অধিকার।
কেন 'পাপ' 'পাপ' করি কর হাহাকার?

(৭)

জীব যদি কর্ত্তা, তবে শাস্ত্রকারগণ,
কেন তাঁরে বলে 'সর্ব্ব-কারণ-কারণ?'
থাকিয়া হৃদয় মাঝে যারে ল'ন যেই কাজে
সেই তাহা করে যন্ত্র চালিতের মত।
জীব-নিত্য কৃষ্ণদাস, এই সুসঙ্গত॥

(৮)

তবু যদি পাপ, তব পরাণ হইতে,
নাহি যায়, 'খেলা মাত্র' না পার ভাবিতে॥
তবে চাও এক মনে অনন্ত জীবের পানে,
কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ, শূন্য তার কাছে।
অবশ্যই পাবে কৃপা, আগে নয় পাছে॥

(৯)

তবে আর কিসে ভয়? ভাব তাঁর কথা।
ভাবিলেই যাবে যত অন্তরের ব্যথা॥
গঙ্গা গর্ভে যতক্ষণ থাকে জীব নিমগন
ততক্ষণ পাপ নাকি থাকে স্থানান্তরে।
গঙ্গা যাঁর পাদোদক ভাবি' দেখ তাঁরে॥

---

(৬) "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"
(৭) "অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্ব কারণ কারণং।"
"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস॥"
(৮) "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ এবাবশিষ্যতে।"
(৯) "মহাপাতক সংহন্ত্রী সর্ব্ব দুঃখবিনাশিনী।"

(১০)

ভাবিতে ভাবিতে তব মানস-দর্পণ।
স্বচ্ছ হ'য়ে প্রতিবিম্ব করিবে ধারণ॥
কোন মতে একবার তত্ত্ব যদি পাও তাঁর
কোথা রবে পাপ তার কোথা কর্ম্মফল।
আনন্দ বাজারে খেলা হেরিবে সকল॥

(১১)

তখনি জনম ধন্য হইবে তোমার।
তখনি বুঝিবে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অপার॥
তখনি মায়ার পারে যাইবে, হেরিবে তাঁরে
আনন্দে যে বিশ্ব-সৃষ্টি তখনি বুঝিবে
পাপ পুণ্য আদি দ্বন্দ্ব কোথা প'ড়ে রবে॥

(১২)

তাঁর সঙ্গ সত্য, সত্য সেই তীর্থবাস।
সে সঙ্গ না লভি' জীব তীর্থে করে বাস॥
অন্তরে ধরিতে নারে বাহ্য দেহে হেরে তাঁরে
ক্রমে অন্তরের গ্লানি সাধু-সঙ্গে যায়।
হৃদয়ে হেরিয়া তাঁরে প্রেমধন প্রায়॥

---

(১০) "চেতোদর্পণ মার্জ্জণং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং"
* * আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্। * *

(১১) "পুণ্য যে সুখের ধাম, তারও না লইও নাম
পাপ পুণ্য দুই পরিহরি।"
"আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

(১২) "তীর্থ যাত্রা পরিশ্রম, সকলি মনের ভ্রম
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ।"

ক্রমশঃ।

ভক্তি ১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, চৈত্র মাস, ১৩২৫।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট মনের কথা।

(ওহে) হরিদাস-চিত্তচোরা নদীয়ার চাঁদ।
তুয়া সনে কথা কহি মনে বড় সাধ॥
তোঁহার চরণে ধরি, হে গৌরাঙ্গ, গৌরহরি,
মিটাও মনের সাধ, ক্ষম অপরাধ।
নয়ন মনের মোর ঘুচুক বিবাদ॥

মনে মনে তুয়া সনে কত কথা কহি।
কতনা মনের দুঃখ হৃদি মাঝে বহি॥
আর যে মানেনা মন, দুখহারী প্রাণধন
মনে মনে মনাগুন কত আর সহি।
তোঁহার বিরহানলে দিবানিশি দহি॥

কৃপাকরি কথা কহি বল গুণমণি।
দীনহীন এ অধমে জান কিহে তুমি?
জগতের পতি তুঁহি, সংসারের কীট মুঞি,
দুরাশা হৃদয়ে মোর—তুয়া কথা শুনি।
ভালবাসি ব'লে তোমা, মুঞি অভিমানী॥

(তুমি) দেখা দিয়ে কথা ক'য়ে হিয়া জুড়ালে না।
কাছে এসে কোলে ব'সে আদর নিলে না॥
রূপ না দেখা'লে তুমি, না শুনালে মধু-বাণী,
কিসের সে ভালবাসা? সকলি ছলনা।
(গৌর হে) তুমি মোরে ভালবাস? বলনা বলনা॥

একবার কথা ক'য়ে বল দেখি নাথ।
ভালবাসা চাও কিনা? লবে কিনা সাথ॥
কথাটি শুনবো ব'লে, তোঁহার চরণ তলে,
প'ড়ে আছি নিশি দিন ক'রে প্রাণপাত।
বল ওহে প্রাণনাথ! লবে কিনা সাথ॥

কত কথা বলি নাথ! শুনিতে কি পাও?
শুনিলে উত্তর দিতে রাজি কেন নও?
বিরলে বসিয়া ডাকি, আশাপথ চেয়ে থাকি,
লুকায়ে আসিয়ে তুমি দেখা দিয়ে যাও।
হাসি হাসি মুখে দু'টী কথা কয়ে যাও॥

শুনিতে পাবেনা কেহ নিরালা নিজন।
কহ নাথ কহ দু'টি পিরীতি বচন॥
প্রেমময় চিত্তে তব, রূপ হেরি অভিনব,
রূপ-তৃষা মিটিলনা ওহে প্রাণধন!
শুনিতে বাসনা তব মধুর বচন॥

এসে নাথ! কাণে কাণে ব'লে দিয়ে যাও।
অভাগার ভালবাসা চাও কিনা চাও॥
কাহাকেও বলিবনা, আর কেহ শুনিবেনা,
নয়নের সম্মুখেতে আসিয়া দাঁড়াও।
একবার কথা ক'য়ে পরাণ জুড়াও॥

জানি তুমি কথা কও হাসিয়া হাসিয়া।
যে ডাকে তোমারে নাথ! প্রপন্ন হইয়া॥
ডাকিতে শিখাও তুমি, হে গৌরাঙ্গ গুণমণি,
ডাকিব তোমারে ওহে শচী-দুলালিয়া।
আমিতো তোমারি নাথ! দেখ হে আসিয়া॥

হরিদাসের নির্য্যাণ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

--:০:—

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।

ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

স্বয়ং শ্রীগৌর-ভগবান্ অবগাহন ক্রমে সমুদ্রকে তীর্থীকৃত করিয়াও ভক্তের স্পর্শ মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ প্রকাশমান থাকেন। সুতরাং পরোক্ষভাবে সমুদ্র তীর্থীকৃত, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ যে সাক্ষাদ্ভাবে অবগাহন করিলেন, সে কথা প্রভু গোপন করিলেন।

ভক্তগণ হরিদাসকে স্নান করাইয়া অতঃপর ভক্তি পূর্ব্বক গণ্ডূষে তৎপাদোদক পান করিলেন। ভক্তের শব স্পর্শেও জীব পবিত্র ও ধন্য হয়। ভক্ত দেহ ত্যাগ করিলেও তাঁহার সেই ভাগবতী তনুতে পূর্ব্ব চিদ্বিভূতির স্ফুরণ নিভেনা। এমন কি ভক্তের দেহ সমাহিত হইলে সমাধি ভূমিতেও সেই বিভূতির খেলা চলিতে থাকে এবং মানুষ তথায় ভক্তি করিয়া লাভবান্ হয়। এই জন্যই ভক্তের মৃত দেহ দগ্ধ না করিয়া সমাধিতে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। তদ্বারা কেবল ভক্তের প্রতি সম্মান গৌরব প্রদর্শন করা হয় এমন নয়, তাঁহার ভক্তি প্রভাবও বাতাসের ন্যায় অঙ্গে লাগে। প্রাণবায়ু নির্গত হইলেও ভক্তির তেজ দেহে থাকে এবং তাহা নিত্য অবিনাশী বলিয়া অবশেষে সর্ব্বত্র ছাইয়া আকাশে মিলায়। যাহাদের ইচ্ছা মৃত্যু এমন ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে পুনরায় সেই দেহে প্রবেশ করিতেও পারেন।—ইহাকে পুনরুজ্জীবন বলা যায়।

ভক্তবৃন্দ হরিদাসের অঙ্গে প্রসাদ-চন্দন মাখিয়া ডোর্ কড়ার প্রসাদ বস্ত্র পরাইলেন এবং বালুকায় গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে হরিদাসের দেহকে শোয়াই-লেন। বহু ভক্ত গর্ত্ত বেড়িয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। হরিদাস কি এই কীর্ত্তন শুনেন না?—শুনেন, প্রাকৃত দেহের বাহিরে সিদ্ধ দেহে তিনি তথায় এখনও বিদ্যমান।

প্রভুর "হরিবোল হরিবোল" সিংহরব, বক্রেশ্বরের নৃত্য এবং ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তন—এই তিন একত্র হইয়া সিন্ধুতে আনন্দ সিন্ধুর যোগ করিয়া দিল। আনন্দ-কলধ্বনির কোলাহলে দিক্‌মণ্ডল মুখরিত ও অনুনাদমান হইল। আজ ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র রস ও শক্তি হরিদাসের সমাধিতে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হইয়া জমাট বাঁধিয়াছে। হরিদাসের উপর প্রভু স্বহস্তে বালু দিয়া তদুপরি এক বালুর পিণ্ডা বাঁধাইয়া দিলেন। হরিদাসের সমাধি কার্য্য প্রভু শ্রীহস্তে সমাধা করিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু, তিনি যেন পুত্রের কার্য্য করিতেছেন। হরিদাস! প্রভু তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, তুমি একটু নাচ, নাচার মত নাচ,—উঠিয়া নাচ। আমি তোমার সঙ্গে নাচি গাই। তুমি এই উৎকট আনন্দ কেমনে আঁটিয়া রাখিতেছ?

প্রভু ভক্তবৃন্দকে লইয়া সিন্ধু-সলিলে আবার নামিলেন এবং মহারঙ্গে স্নান ও জলকেলী আরম্ভ করিলেন। প্রভুর এই আনন্দের অভিপ্রায় কি?—তিনি কি এই আনন্দ কৌতুক দ্বারা স্বীয় লীলা সংগোপনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন না। আজ প্রভুর এই আনন্দে আমাদের জন্য নিরানন্দ-বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। জলকেলির পর উঠিয়া প্রভু স্বগণসহ হরিদাসকে প্রদক্ষিণ করিয়া জগন্নাথের সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের মধুর তরঙ্গ নগরময় ছাইল।

প্রভু নিজেই হরিদাসের পারলৌকিক মঙ্গল মহোৎসব করিবেন। তিনি পসারিগণের দোকানে দোকানে প্রসাদ ভিক্ষা মাগিতে আঁচল পাতিলেন। হরিদাসের জন্য প্রভু স্বয়ং ভিক্ষায় নামিলেন। প্রভু নিজে আঁচল পাতিয়াছেন, কে ভিক্ষা না দিয়া পারে? প্রভু নিজে আঁচল পাতিয়াছেন, কাহার হাতেই বা অন্ন উঠিবে? প্রভু নিজে অাঁচল পাতিয়াছেন, পসারিগণ সৌভাগ্য মানিয়া নানাউপকরণের ভিক্ষা ভক্তি পূর্ব্বক প্রভুর শ্রীহস্তে প্রদান করিতেছেন। ত্রিলোকের সমগ্র নিধি যাঁহার শ্রীপদ-শাখাগ্রে, তিনি ভিক্ষার জন্য অাঁচল পাতিয়াছেন—দেবগণ চাহিয়া আছেন। অবশেষে শ্রীস্বরূপ প্রসাদ রাশি চারি ভারে বাহক দ্বারা আনাইলেন। বাণীনাথ ও কাশীমিশ্রও বহু প্রসাদ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। প্রভুর আদেশে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ পাইতে সারি সারি বসিয়া গেলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীহস্তে পরিবেশন করিলেন। স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ও শঙ্কর এই চারি জন প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করিতেছেন।

প্রসাদ পাওয়া আর থাকিয়া থাকিয়া "সাধু সাবধান——" ইত্যাদি রসকারিকা ও ভণিতাযুত শ্লোক-পদ-পূর্ণ প্রেমধ্বনির ঊর্দ্ধ-প্রবাহ। অহো, ব্রহ্মাণ্ড ফলটি যেন পক্ক রসাল, টল টল! হরিদাসের ভাগ্য সুধানিধি যেন একেবারে রসে কাটিয়া সুধা বহাইল। একে, মহাপ্রসাদ। তাহাও আবার স্বয়ং মহাপ্রভু নিজ পরশ-তুল্য পদ্মহস্তে প্রচুর পরিমাণে দিতেছেন। যে যে ভক্ত হেন প্রসাদ আস্বাদ করিলেন, তাঁহাদের ভাগ্য-সুখের তুলনা জগতে মিলেনা। সে সুখের কথন কল্পনায় আনিতেই চিত্তে বিমল সুখের এক সুন্দর মধুর তরঙ্গ আস্ফালন করে।

অহো, ইন্দ্রত্ব ভোগী ইন্দ্রের ভাগ্য কিসে গণি, সুধাকর চন্দ্রের ভাগ্য কিসে গণি, যক্ষপতি কুবেরের ভাগ্য কিসে গণি, রাজরাজেশ্বরের ভাগ্য কিসে গণি?— যে ভাগ্য হরিদাসের, সে ভাগ্যের এক কণা পাইলে ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের ধন্য মানি লোটাইত। ভক্ত হওয়ার মত সৌভাগ্য সুখ-সম্পদ্ দ্বিতীয় নাই। হরিদাসও আবার যেমন তেমন ভক্ত নহেন, প্রভু-পরিকর। মহানন্দে প্রসাদ পাইয়া বৈষ্ণবগণ গমন করিলেন। মহাভাগবত হরিদাসের নির্যাণ-কার্য্য স্বয়ং ভগবান এইভাবে সমাপন করিলেন। জয় হরিদাসের জয়।

শ্রীধাম-মাহাত্ম্য।

(লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র, উকীল।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

(১৩)

শ্রীধাম-মহিমা তাই হ'য়েছে প্রচার।
তাঁহারে পাইতে ধাম-সম নাই আর॥
মনে সেই অভিলাষ রাখি, ধামে করে বাস
কিন্তু যদি পূর্ব্বাভ্যাস না পারে ত্যজিতে।
শাস্ত্র-বিধি পাপ তা'তে নাই কোন মতে'॥

(১৩) "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।

(১৪)

তাই হরি দয়াময় করিলা বিচার।
আমা'হেতু পাপ করে; পুণ্য হয় তার॥
আমারে না রাখি' মনে পুণ্য পুঞ্জ জীবগণে
করে যদি; সেই পুণ্য স্বর্ণ-শৃঙ্খল।
বন্ধনের হেতু হয়, নাই তায় ফল॥

(১৫)

তবে যে হেরিছ দুঃখ ব্যথা দেয় নরে
শিক্ষক-শাসন সেই কুশলের তরে॥
দুঃখের জলদ-পাশে সুখ-শশধর হাসে,
'লুকোচুরি' কেলি রসে 'চোর'-শিশু প্রায়।
দুঃখ সহে জীব-শিশু আনন্দ আশায়॥

(১৬)

ভ্রমেও ক'রো না পাপে প্রশ্রয়-প্রদান
হইবে ইহাতে,—কেন? জান কি সন্ধান?
উত্তমের সঙ্গ ফলে কু সু হয় অবহেলে—
বলিলে কি বলা হয় অধম হইতে?
সেইরূপ এই নীতি, ভয় নাই এতে॥

---

(১৪) মন্নিমিত্ত কৃতং পাপং অপি পুণ্যায় কল্পতে,
মামনাদৃত্য যং পুণ্যং তত্তু বন্ধন কারণম্।

(১৫) "'কাঁটাহেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে'
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?"

বৈরাগ্য।

—:০:—

পরিদৃশ্যমান জগতের নশ্বরতা, জাগতিক সর্ব্বপ্রকার সুখের অস্থায়িত্ব ভাব চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। আবার যে সকল মহাত্মা প্রলোভনময় আশক্তির হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই সংসারে বীত স্পৃহ।

এই শোক তাপময় সংসারের অভ্যুত্থান ও পতন সন্দর্শনে, ভৌতিক জগতের নশ্বরতা এবং তৎপ্রসূত সুখের আবিলতা ও ক্ষণ-স্থায়িত্বভাব কল্পনা বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া প্রবলবেগে মানব মাত্রের হৃদয়েতেই আঘাত করে, তবে কেহবা সে আঘাতে জাগ্রত হয় কেহবা মুহ্যমান হইয়াই থাকে।

কল্য যাহাকে মহা বলবান, বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, অশেষ-গুণ-বিমণ্ডিত ও অগণন নর-নারী দ্বারা দেব-সদৃশ পূজিত হইতে দেখিয়াছ, পরিবর্ত্তনশীল কাল-প্রভাবে আজ হয়ত আর তাহার সে সমস্ত কিছুই নাই, সে সামান্য লোকের দ্বারাও বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইতেছে। যে ব্যক্তি এক সময় কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্য-শালী ছিল, যাহার অট্টালিকা সর্ব্বদা জন-কোলাহলে মুখরিত থাকিত, সঙ্গীত লহরীর সুমধুর ঝঙ্কারের ন্যায় নানাবিধ আনন্দ ধ্বনিতে যাহার প্রাসাদ সর্ব্বদা মুখরিত ছিল, যাহার কটাক্ষ কণা লাভের জন্য শত শত লোক তৃষিত চাতকের ন্যায় চাহিয়া থাকিত, বিঘূর্ণিত কালের কুটিল চক্রে আজ সে মুষ্টি মাত্র ভিক্ষা প্রার্থী হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে।

কল্য যে নয়নাভিরাম কুসুম সকল নিজ নিজ অনুপম রূপ-লাবণ্যের গৌরবে হেলিয়া দুলিয়া প্রেমিক কবিকে তাহার সান্নিধ্যে আসিবার জন্য অস্ফুট স্বরে মধুর আহ্বান করিতে ছিল, কৈ, আজ তো আর তাহার সে প্রফুল্লতা নাই, আজ তো আর তাহাকে কেউ আদর করিয়া গলায় পড়ে না? তাহার সে সৌরভ সে আকর্ষণি শক্তি কোথায় গেল। আবার ঐ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরি-শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, যে কল্য সকলের উপরে মস্তক তুলিয়া আপন শ্রেষ্ঠতা জগতে প্রকাশ করিয়াছিল আজ প্রভঞ্জনের তীব্র আক্রমণে সে

মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্বভাবতই কি প্রাণে বৈরাগ্যভাব আসে না? জগতের নশ্বরতা কি মনে হয়না?

সাংসারিক যাবতীয় সুখই এই প্রকার ক্ষণস্থায়ী। কালপ্রভাবে এখন যাহা আছে পরমুহূর্ত্তে আর তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, আবার যাহার কিছু মাত্র চিহ্ন এক্ষণে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না পরমুহূর্ত্তেই তাহার অদ্ভুত প্রকাশ নয়ন-গোচর হইয়া জগৎকে আশ্চর্য্য করিতেছে। ইহাই জগতের নিয়ম। পিতা মাতার স্নেহ, গুরুজনের অনুগ্রহ আশীর্ব্বাদ, ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসা, প্রণয়িণীর প্রেম (বিশুদ্ধ নহে, অবিশুদ্ধ) প্রতিবাসীজনগণের মমতা, শিশুগণের স্নেহ-স্নিগ্ধ অস্ফুট অমিয় মাখান বাক্যাবলী এবং ধন, জন, জীবন, যৌবন সকলই ক্ষণস্থায়ী। ভাবুক কবির সুরে সুর মিলাইয়া—তাইতো বলিতে ইচ্ছা হয়, ভাই ;—

"কেন ভুলে আছ, সুখের নেশা ছুটে' যাবে।
আজ যে ছেলের ননীর অঙ্গ যতনে মুছাবে,
কাল হয়তো তার পচা মাংস শ্যাল কুকুরে খাবে॥
আজ যে সুন্দরী দেখে (তুমি) নয়ন মন ভুলাবে।
কাল হয়তো সে পথে ঘাটে ভিক্ষা মেগে খাবে॥
আজ যে সুখের বাসর সজ্জায় যতনে বসিবে।
কাল হয়তো সে বাসর সজ্জা শ্মশান ভূমি হবে॥"

জাগে, জীব মাত্রেরই এই ভাব কখন না কখন প্রাণে জাগে, কিন্তু জাগিলে কি হইবে, হৃদয়ের দৃঢ়তা, চিত্ত শক্তির প্রগাঢ়তা না থাকায় আমরা পরক্ষণেই সে ভাব হারাইয়া ফেলি। এই বৈরাগ্যভাব সর্ব্বদা প্রাণে জাগাইয়া রাখিবার জন্যই সাধুসঙ্গ, সৎ-শাস্ত্র অধ্যয়ন সৎ-গুরুর নিকট শিক্ষা দীক্ষা প্রয়োজন।

বিষয়ে অনাশক্ত ভাবই বৈরাগ্য। সকলেরই এই বৈরাগ্যভাব অর্থাৎ বিষয়ে বিরাগ সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। অবশ্য তাই বলিয়া সকলকেই সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে বলা হয় নাই, সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্তভাবে থাকিবার জন্য বলা হইতেছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেমন বলিয়া গিয়াছেন—"পাঁকাল মাছের মত সংসারে থাক" অর্থাৎ পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকে থাকিয়াও গায়ে কাদা লাগায় না তুমিও তদ্রূপ সংসার কর। যেন সংসারের পাঁক তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে।

প্রাণে বৈরাগ্যভাব না আসিলে শ্রীভগবানের ভাব-সমুদ্রে ডুব দিবার অবসর হয় না, আর ভাব-সমুদ্রে না ডুবিতে পারিলেইবা ভগবৎ সত্তা উপলব্ধিই হয় কিরূপে; সুতরাং ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিয়া শ্রীভগবানের সত্তা পর্য্যন্ত ভুলিয়া কেবল অনিত্য বিষয় সুখে প্রমত্ত থাকিলে এমন দেবদুর্লভ বহু আয়াস-লভ্য মনুষ্য জন্মের সার্থকতা হয় কৈ? কেবল শৃগাল কুকুরের মত ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই কি ভগবান জীব-শ্রেষ্ঠ মনুষ্য দেহ দান করিয়াছেন?

আমরা যে বৈরাগ্যের কথা বলিতেছি সেই বৈরাগ্য যে কি তাহাই শাস্ত্রকার বলিতেছেন;—"কা বা বিমুক্তি? বিষয়ে বিরক্তি।" অর্থাৎ বিমুক্তি (বৈরাগ্য) কি? বিষয়ে বিরাগ (অনাসক্তি) ভাবই বৈরাগ্য। আবার বৈরাগ্য শব্দের ধাত্বর্থ ধরিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারি যে, আসক্তি শূন্য ভাবই বৈরাগ্য।

বি+রঞ্জ ধাতু "ক্ত" করিয়া বৈরাগ্য পদ সিদ্ধ হইয়াছে, রঞ্জ ধাতুর অর্থ ভালবাসা অর্থাৎ আসক্তি, আর বি উপসর্গের অর্থ বিগত —শূন্য, অতএব বি+রঞ্জ ধাতুর অর্থ আসক্তি শূন্য ইহাই বুঝা যাইতেছে সুতরাং বৈরাগ্য বলিতে যে আসক্তি শূন্য ভাবই বুঝায় ইহা বেশ বুঝা গেল।

কিন্তু এই আসক্তি শূন্য বলিতে সাধু সেবা বা শ্রীভগবানে আসক্তি শূন্য একপ যেন কেহ না বুঝেন, কেবল বিষয়াসক্তি শূন্যই বুঝিতে হইবে, শ্রীভগবৎ-সেবা বিষয় সেবা নহে, এবং সাধু-সেবা বৈরাগ্যের পরিপোষক। শাস্ত্রকারগণ সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত বৈরাগ্য তাহাকেই বলি, যাহাতে "বিষয়ে অনাসক্তি ও শ্রীভগবানে পূর্ণ আসক্তি বর্ত্তমান থাকে।"

অনেকে হয়তো বলিবেন যে, বৈরাগ্যের আবশ্যকতা কি? বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতাভিমানীগণ প্রায়ই বৈরাগ্যকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে "সংসারিকতা বা সংসার প্রবণতাই প্রাকৃতিক নিয়ম।" বৈরাগ্যভাব ইহাদের নিকট তুচ্ছ হইলেও প্রকৃত পক্ষে বৈরাগ্য তাচ্ছিল্যের বিষয় নয়। কোন বিষয়ের সমীচীনতা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, বৈরাগ্যই হইল সেই আদর্শ লাভের সম্পূর্ণ অনুকূল, আর বিষয়াশক্তি হইল ইহার ঘোর প্রতিকূল।

যদিও সংসারে থাকিয়া অনেক মহাত্মা অনেক কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় লৌকিক জগতের বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁহারা

সংসারী হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা সংসারে মোটেই লিপ্ত নন, তারপর সেভাবের লোকও অতি বিরল। প্রাণে আশক্তি পরিপূর্ণ ভাব লইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া কেহ যে তথা হইতে অনাহতভাবে প্রত্যাগত হইতে পারিয়াছেন তাহা নহে। চতুর্দ্দিকে মলমূত্র পরিবেষ্টিত থাকিয়া চন্দন পরিবেষ্টিত আছি বলিয়া মনে করিতে পারে কয় জনে? তবে এরূপ লোক যে নাই তাহা নহে কিন্তু সচরাচর যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই কথা বলা হইতেছে।

যে পরিমাণে সংসারাসক্তি আসিবে—সেই পরিমাণেই কর্ত্তব্য হইতে—পূর্ণ আদর্শ হইতে—মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে জীব দূরে চলিয়া যায়। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে,—অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল মহাত্মাগণ কোন মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, যাঁহাদের বিমল চরিত্র-সৌরভে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে তাঁহারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে সংসারে থাকিলেও আসক্তি শূন্য—বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। তবে—সংসার তাঁহাদিগের কার্য্য ক্ষেত্র ছিল বটে। আর এক কথা—মনতো একটা, তাহাকে কয় দিকে নিযুক্ত করিবে? যদি সে বিষয় চিন্তা করিতে থাকে তবে সে ভগবৎ চিন্তা করিবে কি প্রকারে? "যস্য সাংসারিকা চিন্তা, চিন্তা চিন্তামণেঃ কুতঃ।" অর্থাৎ যাহার চিত্ত সংসারের প্রবল চিন্তায় নিমগ্ন সে চিন্তামণির চিন্তা কি প্রকারে করিবে? কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, এই চিন্তামণির চিন্তাই কিন্তু মানব জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য—একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, একই সময় দুইটী বিষয়ে অভিনিবেশ অসম্ভব। চিত্তের এইটীই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে পরিমাণে তোমার চিত্ত একটী বস্তুর উপর আকৃষ্ট হইবে সেই পরিমাণই অন্য বস্তু হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া দূরে যাইবে—অন্য চিন্তা হইতে বিচ্যুতি ঘটিবে। এখন দেখিতে হইবে যে, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি?

ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীভগবানে ঐকান্তিক ভালবাসা, যাহাকে শাস্ত্রকারগণ বিশুদ্ধ প্রেম নামে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। কাজে কাজেই চিত্তকে যদি সংসারাসক্তি দিয়া মোহিত করিয়া রাখি তাহা হইলে ভগবচ্চিন্তা, আসিবে কি করিয়া। সুতরাং যাহাতে শ্রীভগবানকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস আনয়ন পূর্ব্বক কায়মনো প্রাণে তাঁহার

ভজনা করিতে তাঁহার লীলা রস পরিপুরীত চরিত কথা আলাপনে জীবন ধন্য—পবিত্র করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে যে জাগতীক পদার্থের নশ্বরতার কথা বলা হইয়াছে তাহা শুনিয়া হয়ত বিজ্ঞান-জ্ঞান-গর্ব্বিত পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবক আপত্তি তুলিয়া বলিবেন যে,—"জগতের কোন বস্তুইতো একেবারে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং জাগতিক পদার্থের নশ্বরতা বোধ-জনিত যে বৈরাগ্য তাহার কোনই আবশ্যক নাই।" এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য বহু আছে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি আশঙ্কায় সামান্য একটু বলিয়াই নিরস্ত হইব।

জাগতিক বস্তু সকল একেবারে ধ্বংশ না হইলেও অবস্থান্তর প্রাপ্তি যে ঘটিয়া থাকে একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না, এই যে অবস্থান্তর বা রূপান্তর ইহারই কি ফলিতার্থ ধ্বংশ নয়? আজ যে সুন্দর বপু দেখিয়া নয়ন শীতল হইতেছে কালপ্রভাবে তাহা ভষ্মিভূত হইয়া মুষ্টিমেয় ভষ্মে পরিণত হইল, এক্ষণে তোমার মন সেই বপু ভুলিয়া এই ভষ্ম মুষ্টিতে পরিতৃপ্ত হইতে পারে কি? ছিল মনোহর কান্তি বিশিষ্ট দেহ, হইল ভষ্মস্তূপ বা মৃত্তিকা পিণ্ড এই যে অবস্থান্তর বা রূপান্তর ইহা দেখিয়াই সুধীগণ জাগতীক বস্তু সকলের নশ্বরতা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আজ যাহা যে ভাবে আছে কালপ্রভাবে দু'দিন পরে আর তাহার তদবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় না, সংসারে যাবতীয় বস্তুর গতিই এইরূপ সুতরাং তাহাতে আসক্তি কেবলই দুঃখের কারণ হয়, চিন্তাশীল বিবেকীগণ এই আসক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এই যে আসক্তি ত্যাগ ইহারই নামান্তর বৈরাগ্য।

প্রেমের ফাঁসি।

—:o:—

সখি! আজি থাকা হ'ল বুঝি দায়।
ওই, শুন বাঁশী বাজিতেছে ঘন
ডাকিতেছে উভরায়॥

না মানে পরাণ যেতে চায় ধেয়ে,
কুল মান আর কি কাজই গেহে,
ধৈর্য্য মানেনা হায়।

পরাণ আমার আজিকে কেবল
বেতসের বনে ধায়॥
আজি থাকা হ'ল বুঝি দায়॥

সখি! মোর মরণ বুঝিলো আজ।
না হ'লে কেনলো চাহিছে পরাণ,
যেতে. খেয়ে কুল লাজ॥
কূলে ঢেউ তোলা মোহন বাঁশরী,
শুনে, যত কাজ যেতেছি পাশরী,
মাথায় পড়িল বাজ!
গুরুভাবে আজ দুরু দুরু ক'রে,
কাঁপিতেছে হৃদি মাঝ॥
মোর মরণ বুঝিলো আজ॥

সখি! মোর জানিনা কি আছে ভালে।
চলিলাম আজ যমুনার কূলে
মজিয়া কালার ছলে॥
যদি ননদিনী পু'ছে মোর কথা
বলো, "রাধা ওগো মরিয়াছে তথা,
আজিকে সাঁঝের কালে।
গলাতে বাঁধিয়া প্রেমের কলস
শ্যাম-কল্প-তরু ডালে।"
মোর জানিনা কি আছে ভালে॥

সখি! মোর পরাণ বঁধুয়া পাশে।
চলিলাম আজ সাঁঝের কালেতে
মিটাতে পরাণ আশে॥
গোঠ হ'তে হের ফিরিছে গোধন
ধূলি ভরা হের তমালের বন,
সাঁঝ আগমন ভাষে।

জীবনে মরণে করিতে বরণ
মিটাতে সকল আশে।
আমি চলিনু বঁধুয়া পাশে।

কাঙ্গালের মনের কথা।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য।)

—:•:—

দেখিতে দেখিতে আর একটি বৎসর ফুরাইয়া গেল !! ১৩২৫ সন আমাদিগকে ১৩২৬ সনের সীমানায় পহুছাইয়া দিয়া,—অনন্ত অতীতের অতল স্পর্শ গম্ভীরতায় নিঝুম ভাবে ডুবিয়া গেল ॥ জীব জগত মৃত্যুর অভিমুখে আর এক পদ অগ্রসর হইল ॥ হরি হরি ॥ এই যে অত বড় বৎসরটা,—কি সুন্দর কলায়-কাষ্ঠায়, পলে-অনুপলে চক্ষের নিমিষে উড়িয়া গেল ॥

এই একটি বৎসরের মধ্যে যে কত মানুষ মরিল,—আর কত মানুষ মরণ পথের নূতন যাত্রী হইয়া মরিতে আসিল,—তাহা কে জানে ? সুখ-দুঃখের লীলা-নিকেতন সংসারের চিন্তা করিতে গেলে মন-প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়ে।

এখন নূতন বৎসরের কথা ভাবিতেছি। এই যে বৎসরটা কাটাইলাম,—করিলাম কি ? বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তো কেবল সংসার দাব-দাহেই পুড়িয়া মরিলাম। কুচিন্তা, কুকর্ম্ম করিয়া সারাটা বৎসর কাটাইয়াছি। এক দিনওতো সাধু সঙ্গে বসিয়া কৃষ্ণ কথা কহিলাম না,—বা শুনিলাম না। এইরূপে যাইতে যাইতে আমার অনেকগুলি বৎসর বৃথা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আর যে কয়টা বৎসর আমার ভোগ-দখলে আসিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবে কে ?

আর আসিলেই বা কি ? বৎসরতো আসে আর যায়,—ফলাফল আমার একরূপই চলিয়াছে। তবে নূতন বৎসরটা আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন আশাও আসিয়া মনটাকে একটুকু উৎসাহিত করিয়া তুলে।

তখন ভাবি,—আর না, যা হইবার হইয়া গিয়াছে,—এখন হইতে কেবল পারত্রিক চিন্তায় মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখিব। কোন অসচ্চিন্তা কি অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইব না। সংসার থাকে থা'ক্,—আর যায় যা'ক্। সংসার সংসার করিয়া আমার সকলি গিয়াছে। এমন সাধের ভজন-যোগ্য মানব জীবনটা পশু জীবনে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া কি এই করিতে আসিয়াছিলাম? হা ধিক্! আমার জীবনে। আমি—অমৃত ফেলিয়া গরল পান করিয়াছি,—মোক্ষ পথে কণ্টক পাতিয়া নরকের পথ পরিষ্কৃত করিয়া লইতেছি। যা'ক্,—আর না।

"গতস্য শোচনা নাস্তি।" এই নূতন বৎসর হইতে মনটাকে নূতন করিয়া লইয়া নদীয়ায়—নূতন লীলার স্মরণ মনন করিব। নিজে নূতন হইয়া ইন্দ্রিয়-গুলিকে নূতন রাগের নূতন বিষয় ধরাইয়া দিব ইত্যাদি,—ইত্যাদি।

হা পোড়া কপাল! কিছুই না! সেই কুচিন্তা,—সেই সংসার,—সেই হাহাকার,—সেই অশান্তি।

এইরূপে যাইতে যাইতে আমার ৬১টা বৎসর চলিয়া গেল, এখন নর-লীলা সম্বরণের সময়,—আর করিব কি? হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ॥

হে অনাথশরণ,—পতিতপাবন,—গৌর আমার,—আমি বড় বিপদে পড়িয়া তোমাকে ডাকিতেছি,—তুমি আমাকে তোমার পবিত্র প্রেম দানে উদ্ধার কর। আমাকে আর এই সংসার কারাবাসে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিও না। বৃদ্ধ বয়সে, রুগ্ন শরীরে একেইতো তোমার ভজন করা অসাধ্য,—তাতে আবার যদি এই দুর্ব্বলের উপর সংসার বোঝাটা সর্ব্বদা চাপাইয়া রাখ, তবে আমি বাঁচি কিসে প্রভো! প্রাণনাথ! এখন হইতে আমাকে তুমি তোমার করিয়া লও। এই হতভাগ্যকে তোমার পূর্ণানন্দময় নদীয়া-লীলায় প্রবেশাধিকার প্রদান কর।

প্রভুগো! তোমার সেবাধিকারী ভক্তগণের চরণে আমাকে শরণ লওয়াইয়া দেও। এই নূতন বৎসর হইতে আমাকে তোমার পরম পবিত্র নাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লও নাথ! শুনিয়াছি তুমি নাকি পতিত-পাষণ্ড পরিত্রাণ করিতেই গোলক ছাড়িয়া ভূলোকে অবতরণ করিয়াছ। তবে আর অপেক্ষা কি প্রভো,—আমাকে আর কষ্ট না দিয়া তোমার ভক্তি মান্দকিনীর পবিত্র জলে কিছু দিন ডুবাইয়া রাখ।

হে গৌরগতপ্রাণ গৌরগণ,—আসুন সকলে মিলিয়া আজ বৎসরের শেষ দিনে গৌর-গুণ কীর্ত্তন করিয়া বৎসরটিকে অনন্ত কালের জন্য বিদায় দিই। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!! জয় গৌর নিত্যানন্দ! জয় গৌর ভক্তবৃন্দ। সবে মিলি কৃপা কর।

মায়ের কোলে চাঁদ।

—:o:—

গগনের চাঁদ গেছে মনোদুঃখে মরিয়া,
প্রভু এসেছেন তার জ্যোতিখানি হরিয়া!
সূতিকা ভবন পানে সকলে পুলকে ধায়,
বার বার দেখিলেও তৃষা না মিটিতে চায়!
কি মুখ, কি চোক তাঁর, কি মধুর ভঙ্গিমা,
মনে হয় শুয়ে আছে ফুটন্ত এ পূর্ণিমা!
অথবা হইতে পারে কখনো একপ ভ্রম,
ধীরে ধীরে জাগিতেছে বসন্তের পুষ্পবন।
অহো, সে অরূপে আজি কি রূপই ধরিয়েছে,
বাড়ন্ত জোয়ার সম ঢল ঢল করিছে!
হর্ষের কনক পদ্ম, স্পর্শে যেন নবনী,
শিহরি শিহরি তাই উঠিছেন জননী!
পাখানি কোলেতে ল'য়ে যখন বসেন মা,
মায়ের কোলেতে যেন শোভে চারু চন্দ্রমা!!

শ্রীমহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

"কামিনী সাধনার প্রতিপক্ষ কি না?"

——:•:——

শাস্ত্র যেরূপ অনন্ত তাহার মতও অনন্ত, তবে কোন কোন মত হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল। কোন কোন মত হয়ত এরূপ জটীল ভাব পূর্ণ যে, বহু কষ্টেও তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, আবার কোন কোন মত এত সরল যে সাধক অতি সহজেই সেই পথের পথিক হইয়া আপন গন্তব্য স্থানে নিরাপদে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু যে যেভাবেই হউক না কেন যেমন নানা দেশ বিদেশ, নানা বন উপবন, পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া নদী এক সমুদ্রে আসিয়াই মিলিত হয়, সেইরূপ নানাভাবে নানাপথগামী সাধক পরিণামে সেই এক স্থানে যাইয়া সকল মতামতের চরমলক্ষ্যে উপনীত হইয়া থাকে। তথাপিও সাধকমণ্ডলী নানাপথ পর্য্যালোচনা করিতে না পারিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হয়। সুতরাং সাধনার পথ যে অবশ্যই পর্য্যালোচনীয় তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই।

যাহারা কর্ম্মী তাহারা কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় ও আত্ম-প্রসাদ লাভ করে, আর যাহারা যোগী ও সন্ন্যাসী তাহারা কর্ম্ম ত্যাগের জন্য কৃচ্ছ্র, কত যোগ কত সাধনা করে। উক্ত তিন প্রকার সাধকের পথ পরস্পর পরস্পরের নিকট বিভিন্ন হইলেও ধর্ম্ম এক এবং অনাদি, তবে কেবল স্তর ভেদ আছে মাত্র শাস্ত্রও তাই বলেন,—

"সত্ত্বং রজ স্তমইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।

অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের উৎপত্তি। জীবদেহ এই গুণত্রয়ের আধার স্বরূপ। যাহার দেহে যে গুণের আধিক্য থাকে তাহার প্রবৃত্তিও তদনুরূপ হয়। এই গুণ এবং গুণ হইতে জাত যে প্রবৃত্তি ইহাও আবার বংশগত হইয়া থাকে, একটী সামান্য উদাহরণ যথা—আম্রের বীজ যেমন আম্রই হয়, ধান্যের বীজে যেমন ধান্যই হয় সর্ষপ বা অন্য কিছু হয় না সেইরূপ সত্ত্বগুণ হইতে উত্তরোত্তর সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি, রজোগুণ হইতে রাজসিক ও তমগুণ হইতে তামসিক প্রবৃত্তিই উৎপন্ন হয়।

গুণ ভেদে ধর্ম্ম-পন্থারও ভেদ হইয়া থাকে। কাজেই প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মাচরণ-বিধি পরস্পর বিভিন্ন দৃষ্ট হয়। আচরণ বিধি পৃথক হইলেও ধর্ম্ম এক। ছোট ছোট বালিকারা যমপুকুর, পুন্নিপুকুর প্রভৃতি ব্রত করিয়া থাকে, আবার কিশোর বয়সীরা উহা না করিয়া অন্য ব্রত এবং যুবতীরা সংযমের জন্য উপবাসাদি পৌরাণিক ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক মনুষ্যের জন্যই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপথ নির্দ্দিষ্ট আছে, যে মনুষ্য ধর্ম্মাচরণে বিমুখ সে পশুতুল্য। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"ধর্ম্মেন হীনা পশুভিঃ সমানাঃ"

শাস্ত্রে কোথাও বলিয়াছেন, "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" অর্থাৎ সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণীগৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থ সমশ্নুতে॥

অর্থাৎ কেবল গৃহকে গৃহশব্দে আখ্যাত করা যাইতে পারেনা। গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃতা সহধর্ম্মিনীকেই গৃহ শব্দে অভিহিত করা যায়। কারণ পুরুষ মাত্রেরই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী সেবনীয়। ইহাকে সুখসেব্য করিতে হইলে সহধর্ম্মিনীর সাহায্য অপেক্ষা করে। বোধ হয় ইহার তাৎপর্য্য আরও কিছু নিগূঢ়ার্থে পরিপূর্ণ আছে, আমরা সে বিষয় ক্রমে আলোচনার চেষ্টা করিব।

বেদের শিরোভাগকে উপনিষদ বলে। এই উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাধককে ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হইবে যে, সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও পরিশেষে সেই ব্রহ্মেতেই লীন হইবে। সুতরাং সেই সময় সেই পরব্রহ্মই জ্ঞানানন্দরূপে অবস্থিতি করিবেন। এই জাগতীক কোন পদার্থই তৎকালে থাকিবেনা। এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ় হইলে পরে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করা উচিত। বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার প্রথমে ব্রহ্ম বিষয়ক নানা কথা আছে, কিন্তু তাহার পরে কোন প্রশ্নের উত্তর করিবার সময় ব্রহ্ম হইতে জগত কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা দেখান হইয়াছে এবং উপসংহারে "একমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তং

সর্ব্বমস্থজত” অর্থাৎ অপকৃষ্ট জীবপিপীলিকা পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষ ভাবে যাহা কিছু দৃশ্য হইতেছে, সে সমস্ত মিথুনজীবকেই এই প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই স্থলে এইটী আমাদের বিশেষ আলোচ্য ও বিবেচ্য যে, ঈশ্বর যদ্যপি সমস্ত জীবকেই স্ত্রীপুরুষ ভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে যে স্ত্রী পুরুষের সমস্ত কার্য্যে সাহায্যকারিণী এবং পুরুষ স্ত্রীর সমস্ত কার্য্যে সাহায্যকারী ইহাও আমাদের অবশ্য স্বীকার্য্য। কেবল যে সৃষ্টিকর্ত্তা পক্ষপাত করিয়া এই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বলিতে পারা যায়না, তাহা হইলে ঈশ্বরও পক্ষপাতিত্বদোষে দোষী সাব্যস্ত হইয়া যান। আর মুক্তির জন্য সেই পরমকারুণিক যে সকল অনাদি উপদেশ রাশি প্রদান করিয়াছেন তাহাও আমূল বিশ্বাস মাত্র হইয়া অভিমুখ্যকারিতার পরিচায়ক হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত কার্য্যেই উভয়ে উভয়ের সহায় তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত দেবর্ষিনারদের বচনটী যে বেদ-মূলক তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। অবশ্য বেদবাণী অখণ্ডনীয় বলিয়া ঈশ্বরের মিথুন সৃষ্টি স্বীকার্য্য। কিন্তু সমস্ত কার্য্যে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী কিরূপে হইতে পারে সেইটীই আমাদের ভাবিবার বিষয়।

যজ্ঞাদি বৈধকার্য্যে স্ত্রী ব্যতিরেকে অধিকারী হইতে পারা যায়না বলিয়া যে, আত্মোপাসনায় ও স্ত্রীর সাহায্য অপেক্ষা করে তাহা বলিতে পারা যায় না। শ্রীভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

> “কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
> মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং॥

”অর্থাৎ হে অর্জ্জুন। রজোগুণের বিকারজাত এই কাম ও ক্রোধকে মহাপাপ জনক জানিবে কারণ যতই ভোগ করনা কেন কামনা কিছুতেই নিবৃত্তি হইবে না “নজাতু কাম কামানামুপভোগে ন সাম্যতি” সুতরাং এই জগতে কাম ও ক্রোধকে বৈরী বলিয়া জানিবে। ভোগ্য জগতে ভোগের নিমিত্ত আমরা সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত সুতরাং ভোগ্য বস্তুর অস্বাভাবিক ব্যবহার আমাদিগকে এতই মুগ্ধ করিয়াছে যে, কোন ভোগ্য বস্তুর অভাব বোধে উহার ভোগ তৃষ্ণা অধিকতর প্রবল হইয়া যতক্ষণ না উহা ভোগ হয় ততক্ষণ এমন দুর্লভ জীবনকেও নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। আর সেই বস্তু

প্রাপ্ত হইলে নিতান্ত আশক্ত হইয়া তাহার রসাস্বাদন করিয়া অপরিতৃপ্ত হৃদয়ে পুনর্ব্বার নূতন ভোগ্য বস্তুর লালসায় অত্যন্ত আশক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তির ও ভোগের দ্বারা ভোগ তৃষ্ণা নিবৃত্তি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে।

তৃষ্ণার তো নিবৃত্তি নাই, এই দুর্দ্দম অশন নিবৃত্ত হয়না বলিয়াইতো বলিতে হয় যে ভোগ-তৃষ্ণাসক্ত ব্যক্তির অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। যেমন পিপাসিত ব্যক্তি পিপাসায় কাতর হইলে হিতাহিত জ্ঞান একেকালে বিলুপ্ত হইয়া যায় তখন যেমন সে তৃষ্ণানিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হলাহল পরিপূরিত অভোগ্য বস্তকেও সুখকর ভোগ্য জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া মহা দুঃখে নিপতিত হয়, সেইরূপ কাম ক্রোধাদির মোহে মত্ত হইয়াও মানুষ হিতাহিত জ্ঞান একেকালে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং যাহা একান্ত গর্হিত কার্য্য তাহা করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

পুরুষ মাত্রেরই বিশেষতঃ স্ত্রী পুত্র আত্মীয় কুটুম্বাদি পরিবেষ্টিত গৃহীদের পক্ষে কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী রিপু অতীব ভয়ঙ্কর। কারণ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রায়ই গৃহীরা অতি পাতক মহাপাতকাদি করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব যাহাতে এই রিপুত্রয় আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আত্মমাহাত্ম্য তিরোধানকারী নরকের দ্বার উন্মুক্ত না করিতে পারে তজ্জন্য সততঃপরত যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

ভগবান রিপুগণের মধ্যে কামরিপুকে প্রথম ও প্রধান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, বিষ্ণু সংহিতার চতুস্ত্রিংশাধ্যায়ে প্রথমেই কাম রিপুর নাম উল্লেখ করিয়া তাহারই ফলীভূত দৃষ্টান্ত স্বরূপ অতি পাতক দেখাইতেছেন। কারণ আমাদিগের কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের মধ্যে পঞ্চমেন্দ্রিয় উপস্থ; এবং তদ্বারাই আমরা সাধারণতঃ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি। প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করা যে সকলেরই একান্ত বাঞ্ছনীয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই কিন্তু ভ্রমবশতঃ যথার্থ আনন্দের আশা করিয়া কামিনীর সুলভ সহবাস আমাদিগকে কামোন্মত্ত করিয়া অবশেষে অতি পাতকাদির ভাগী করিয়া ফেলে এ সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়া গৃহীরা একত্র আহার বিহার করিতে থাকে বলিয়া সময় সময় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অতি পাতকাদির অর্জ্জন করিয়া থাকে।"

আবার কামরিপু হইতে ক্রোধ এবং লোভ তাদৃশ বলবতী না হইলেও নিতান্ত দুর্ব্বলও নহে। সেই জন্যই নানারূপ দৃষ্টান্তাদি দর্শাইয়া ঐ সকল ত্যাগের জন্য বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন ;—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

সুতরাং বেশস্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এক কাম হইতেই যত অনর্থের মূল প্রকটীত হয় অতএব এই অঘটন-ঘটনকারী কামরিপুকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কামিনীকুল-কলুষিত সংসার মণ্ডলে থাকিয়া কি কাম পরিত্যাগ করা সম্ভব ? যেমন আকাশ পরিব্যাপ্ত জগন্মণ্ডলে থাকিয়া আকাশ সম্বন্ধ ত্যাগ নিতান্ত অসম্ভব তদ্রূপ কামিনী-কুল-কবলিত সংসারে থাকিয়া কাম পরিত্যাগও অসম্ভব। সুতরাং কামিনী পরিত্যাগ কাম পরিত্যাগের প্রথম সোপান সুতরাং যজ্ঞাদি বৈধ কর্ম্মে স্ত্রীর সাহায্য প্রয়োজন হইলেও আত্মোপাসনায়ও যে স্ত্রীরসাহায্য অপেক্ষা করিবে তাহা বলিতে পারা যায়না। এই জন্যই দেবর্ষি নারদের "নগৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" এই গৃহোপক্রমের বচনটীতে যে, সর্ব্বান্" শব্দটী আছে তাহার অর্থ "গৃহি ভোগ্যার্থ সকলান্" অর্থাৎ গৃহীগণের ভোগ্য সকল পুরুষার্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ আত্মোপাসনায় কামিনীর কিছু মাত্রও অপেক্ষা করেনা। আর আত্মোপাসনায় গৃহীর অধিকারও নাই। যজ্ঞাদি বৈধ কর্ম্মে গৃহীর অধিকার সুতরাং তাহাতে কামিনীর অপেক্ষাও আছে। আত্মোপাসনায় সন্ন্যাসির অধিকার তাহাতে কামিনীর অপেক্ষা নাই। কাজে কাজেই উক্ত বচনটীর ঐরূপ অর্থই উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ সন্ন্যাসিকে উপক্রম না করিয়া গৃহীকে উপক্রম করিয়াই উক্ত বচনটী প্রকটীত হইয়াছে।

এক্ষণে "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই বচনটীর ভাবার্থ বুঝিয়া অবশিষ্ট সংশয় নিরসনের জন্য চেষ্টিত হওয়া যাউক।

প্রথমতঃ আমাদিগের দ্রষ্টব্য বিষয় ধর্ম্ম। কিন্তু ধর্ম্ম যে কি তাহা আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিনা বা করিবার প্রয়োজনীয়তাও আমরা সচরাচর

আদর্শরূপে দেখিতে পাইনা, এ বিষয় বুঝিতে হইলে প্রথমত দেখিতে পাইব যে, "বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যঃ সগুণো ধর্ম্ম উচ্যতে।" বিহিত ক্রিয়া সাধ্য গুণ বিশেষকে অর্থাৎ অনাদি ঐ উপদেশরাশী দ্বারা বিধানিরূক্ত কর্ম্ম প্রসূত গুণ বিশেষই ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। সংহিতাকার ঋষিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত, কিন্তু পূর্ব্ব মীমাংসকাচার্য্যভগবান্ জৈমনি বলিয়াছেন যে, "চোদনা লক্ষণো হর্থোধর্ম্মঃ" প্রবর্ত্তক বাক্য প্রমাণক পদার্থ বিশেষ অর্থাৎ যে পদার্থটীকে লক্ষ্য করিয়া প্রমাণিভূতবেদবাক্য প্রবর্ত্তিত হইয়া নিয়োজ্য পুরুষ সকলকে ক্রিয়ায় নিযুক্ত করে তাহাকেই ধর্ম্ম শব্দে অভিহিত করা হয়।

"অগ্নিহোত্রং জুহোতি" "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গ কাম।"

স্বর্গকামী ব্যক্তি বুঝিবে যে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয় আমি স্বর্গ কামী সুতরাং আমাকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করা উচিত এইটী স্থির করিয়া ওকে ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হয়। কাজে কাজেই অগ্নিহোত্র যজ্ঞে স্বর্গকামী পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে বলিয়া ঐ "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" শ্রুতিটী প্রবর্ত্তক বাক্য এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া ঐ অগ্নিহোত্র যজ্ঞটীই ধর্ম্ম শব্দে অভিহিত হয়। কিন্তু নিতান্ত দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎকালে ফল প্রদান করিতে আশু বিনাশী যজ্ঞ সমর্থ হয়না বলিয়া যজ্ঞ জন্য একটী এরূপ অদৃষ্ট মানিতে হয় যে সেই ভবিষ্যৎ ফলের প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত সূক্ষ্মরূপে অন্তর্নিহিত থাকে ও সময়ে ফল প্রসব করে সুতরাং ভাবি ফলের উদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থায়ী বর্ত্তমান কর্ম্ম জন্য সূক্ষ্ম কর্ম্ম—অদৃষ্ট বা অপূর্ব্বকেও ধর্ম্ম শব্দে অভিহিত করিতে হইবে। এক্ষণে সহজেই বুঝা গেল যে বিহিত ক্রিয়া ও বিহিত ক্রিয়া সাধ্যগুণ বিশেষই ধর্ম্ম। গীতায় এই ধর্ম্ম দুই প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন যথা—শুক্ল ও কৃষ্ণ ধর্ম্ম, তন্মধ্যে শুক্ল ধর্ম্ম দ্বারা শুক্ল গতি ও কৃষ্ণ ধর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণ গতি লাভ হয়।

শুক্ল কৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।"

শ্রুতিতে দেবযানও পিতৃযান প্রাপক শুক্ল ও কৃষ্ণ ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে পরন্তু যোগ বিত্তম মহর্ষি পাতঞ্জলি কর্ম্মমে চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মকেও চারি প্রকারে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন যথা,—

কর্ম্মা শুক্লা কৃষ্ণং যোজিনস্ত্রিবিধ মিতবেষাং

মহর্ষি বেদব্যাসের স্বভাষ্যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে আমরা বাহুল্য ভয়ে কেবল উহার যথার্থটীই প্রকাশ করিয়া সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

ক্রমশঃ।

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা।

(বঙ্গাব্দ ১৩২৬। চৈতন্যাব্দ ৪৩৪।৩৫)

কলিকাতা শ্রীভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডল হইতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও ১৩২৬ সালের বৈষ্ণব ব্রত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের দিনে ধর্ম্ম-মণ্ডলের এ কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই, আমরা পাঠকগণের অবগতি ও উপকারার্থে ব্রত তালিকাটী অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও মুদ্রিত করিয়া ভক্তির পাঠকগণকে উপহার দিলাম। ব্রত তালিকার সম্বন্ধে কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকিলে অথবা শ্রীভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডলের বিবরণ জানিতে হইলে পণ্ডিত প্রবর প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন, ১৬১নং হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। ইতিঃ (ভক্তি সম্পাদক)

——:•:——

(বিষ্ণুমন্ত্রেদীক্ষিত যতি-ধর্ম্মপরায়ণা (বিধবা) দ্বিজপত্নীগণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে।)

বৈশাখ।

একাদশী	১৩ই শনিবার।
অক্ষয় তৃতীয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা	১৯শে শুক্রবার।
জহ্নুসপ্তমী	২৩শে মঙ্গলবার।
একাদশী (পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী)	২৮শে রবিবার
শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী	৩০শে মঙ্গলবার
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল যাত্রা	৩১শে বুধবার

জ্যৈষ্ঠ।

একাদশী	১২ই সোমবার।
একাদশী	২৬শে সোমবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা	৩০শে শুক্রবার।

আষাঢ়।

একাদশী	৯ই মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা	১৪ই রবিবার।
ঐ পুনর্যাত্রা	২২শে সোমবার।
শয়নৈকাদশী—রাত্রের প্রথমযামে	
শ্রীশ্রীহরির শয়ন, চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ	২৪শে বুধবার।

শ্রাবণ।

একাদশী	৭ই বুধবার।
একাদশী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রারম্ভ	২২শে বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ	২৩শে শুক্রবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন	২৬শে সোমবার।

ভাদ্র।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত	২রা মঙ্গলবার।
একাদশী	৫ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত	১৬ই মঙ্গলবার।
পার্শ্বৈকাদশী ও শ্রবণাদ্বাদশী বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ, সায়ং কালে—	
শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন	২০শে শনিবার।
শ্রীশ্রীবামনদেবের আবির্ভাব দ্বাদশী মধ্যে অর্চ্চনান্তে পারণ	২১শে রবিবার।

আশ্বিন।

একাদশী	৩রা শনিবার।
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব	১৭ই শনিবার।
একাদশী	১৮ই রবিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসযাত্রা	২২শে বৃহস্পতিবার।

কার্ত্তিক।

একাদশী	২রা রবিবার।
গোবর্দ্ধন যাত্রা ও অন্নকূট	৭ই শুক্রবার।

গোপাষ্টমী ১৫ই শনিবার।

উত্থানৈকাদশী সায়ংকালে শ্রীশ্রীহরির উত্থান ও রথযাত্রা,

ভীষ্ম পঞ্চকারম্ভ ১৮ই মঙ্গলবার।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সমাপ্ত ১৯শে বুধবার

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা ২৯শে শুক্রবার

অগ্রহায়ণ।

একাদশী ২রা মঙ্গলবার

একাদশী ১৭ই শুক্রবার।

পৌষ।

একাদশী ২রা বৃহস্পতিবার

একাদশী ১৭ই শুক্রবার।

পুষ্যাভিষেক যাত্রা ২০শে সোমবার।

মাঘ।

একাদশী ২রা শুক্রবার।

বসন্তপঞ্চমী শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন ১২ই সোমবার।

মাকরী সপ্তমী শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব ১৪ই বুধবার।

ভৈমী একাদশী ১৭ই শনিবার।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব ১৯শে সোমবার।

ফাল্গুন।

একাদশী ৩রা রবিবার।

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত ৬ই বুধবার।

একাদশী, আমর্দ্দকী-ব্রত, গোবিন্দার্চ্চন ১৮ই সোমবার।

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা, শ্রীশ্রীমম্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা।

৪৩৫ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ। ২১শে বৃহস্পতিবার।

চৈত্র।

একাদশী ৩রা মঙ্গলবার।

শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রত ১৫ই রবিবার।

একাদশী ১৭ই মঙ্গলবার।

দমনকারোপণোৎসব ১৮ই বুধবার।

শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা ২০শে শুক্রবার।

30 OCT 31
WRITERS BUILDING

রাধিকা-রঞ্জন-স্তুতি।

(১)

তারকা ভাস্কর, ত্র্যম্বক শঙ্কর,
কেতকী-কহ্লার শশী,
সুশুভ্র চন্দ্রিকা, প্রফুল্ল মল্লিকা,
রাধিকা-রঞ্জন-হাসি।

(২)

মারুত-হিল্লোল, তটিনী-কল্লোল,
অনন্ত অম্বুধি-গীত ;
দ্বিরেফ-গুঞ্জনে, গাহিছে সঘনে,
রাধিকা-রঞ্জন-স্তুতি।

(৩)

নন্দন-মন্দারে, হিমাদ্রি কন্দরে,
নির্জ্জন কান্তার মাঝে।
নির্ম্মল নির্ঝরে, অনন্ত অম্বরে,
রাধিকা রঞ্জন রাজে।

(৪)

চামেলী—চম্পক, কমল—কিংশুক,
পবিত্র ভকতি মদে ;
শতত লুণ্ঠিত, যমুনা-চুম্বিত,
রাধিকা রঞ্জন-পদে।

(৫)

অশ্বিনী—ভরণী, কৃত্তিকা—রোহিণী,
নগেন্দ্র-নন্দিনী—দীপ্তি ;

পূণ্যা—আত্মজা, ইন্দিরা অম্ভোজা
অনঙ্গ-মোহিনী মূর্ত্তি।
কৃতান্ত বরুণ জয়ন্ত—অরুণ,
শশাঙ্ক শেখর—স্মর;
জয়তি যাদব, গাহিছে বাসব,
অতীতি নন্দন-নয়॥

(৭)

মাধব মাধব, কেশব কেশব,
শ্রীকৃষ্ণ কংশারী-হরি।
শ্রীনন্দ-নন্দন, অনঙ্গ-মোহন,
সংসার-অর্ণব-তরি॥

(৮)

অমর্ত্ত্য—অর্চ্চিত, চন্দন—চর্চ্চিত,
পঙ্কজ-সঙ্কাশ পদে;
প্রণমি রমেশ, প্রণমি রাধেশ,
সতত ভকতি মদে॥

"কামিনী সাধনার প্রতিপক্ষ কি না?"

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

একণে কর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা জানিতে পাই যে, কর্ম্ম চারি প্রকার। যথা;—কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, শুক্ল, অশুক্লাকৃষ্ণ। তন্মধ্যে তমোগুণ মূলক দুঃখ ফলদায়ক হিংসাদি কৃষ্ণকর্ম্ম, ইহা দুরাত্মাদিগের। রজোগুণ মূলক সুখ দুঃখ ফলদায়ক, বহিঃসাধন তিল যবাদি সাধ্য যাগাদি শুক্লকৃষ্ণ; ইহাতে পরপীড়া ও অনুগ্রহ উভয়ই আছে বলিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই উৎপাদিত হয়। সত্ত্বগুণ মূলক সুখ তপঃস্বাধ্যায় ধ্যানাদি শুক্ল; ইহা

কেবল চিত্তে দ্বারা হয় বলিয়া বহিঃ সাধন তিল যব পশ্বাদি সাধ্য নহে সুতরাং ইহাতে পরপীড়া নাই। আর গুণ হেতুত্রয়রহিত সুখ দুঃখ ফল শূন্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতি অশুক্লাকৃষ্ণকর্ম্ম। অবিদ্যাদি ক্লেশ রহিত, চরম দেহ সন্ন্যাসী বা যোগী শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও ফল কামনা না থাকায় অশুক্লা ও নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং অকৃষ্ণ কর্ম্মই তাঁহার পক্ষে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এবং তদিতর প্রাণিগণের পক্ষে পূর্ব্ব কথিত অন্য তিনটি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এক্ষণে যদি চিন্তা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, শুক্লকৃষ্ণ-কর্ম্মরূপে ধর্ম্মাচরণ করিতে হইলেই কামিনীর সাহায্য অপেক্ষা করে। কিন্তু আত্মোপাসনায় অর্থাৎ শুক্ল, কৃষ্ণ বা অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্মে কামিনীর অপেক্ষা নাই। কেননা তাহাতে ইন্দ্রিয় সংযম প্রয়োজন, কাজেই বুঝা গেল যে, সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কামিনীর সাহায্য অপেক্ষা করিয়া উন্মার্গগামী কেন হইবে ?

এই সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, 'সস্ত্রীকো-ধর্ম্মমাচরেৎ,' এই শাস্ত্র বাক্য শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্মরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানকে স্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিতে অনুমতি করিতেছেন। সুতরাং এরূপ সাধনানুষ্ঠানে কামিনী প্রতিপক্ষ হইতে পারেনা। কিন্তু মুমুক্ষুগণের আবশ্যকীয় সাধনানুষ্ঠানে কামিনীকুল যে নিতান্ত প্রতিপক্ষ তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ মুক্তিলাভের প্রধান উপায় যোগাদি অনুষ্ঠান, সেই যম নিয়মাদি, প্রাথমিকঅনুষ্ঠান। কিন্তু যমানুষ্ঠান। করিতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান একটী তাহার অবয়ব বলিয়া কামিনীকুল প্রতিকুল পন্থায় দণ্ডায়মান বলিতে হইবে। সুতরাং মোক্ষ সাধনানুষ্ঠানে কামিনী প্রতিপক্ষ, অতএব মোক্ষসাধনানুষ্ঠাতাদিগের পক্ষে কামিনী নিতান্তই প্রতিপক্ষ বলিয়া যে তাহার সাহায্য পরিত্যাজ্য তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, মোক্ষ সাধনের প্রতিপক্ষ বলিয়া কামিনীকুল কখনই ঘৃণার পাত্র হইতে পারে না, কারণ মোক্ষ লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ কামিনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্মরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সঞ্চিত পাপক্ষয় করিতে হয়, পরে চিত্তশুদ্ধি হইলে মোক্ষ সাধনের অনুষ্ঠান করিতে অধিকারী হইতে পারা যায় ও ভারভুক্ত কামিনীবৎ কামিনী স্বয়ং পরিত্যক্ত হইতে অভিলাষ করে। এই অবস্থায় সমারূঢ় না হইতে পারিলে ইহা কখনই বোধগম্য হইবে না যে, কামিনী মোক্ষ সাধনের প্রতিপক্ষ কেন? তবে শাস্ত্রানু-

শীলন দ্বারা ইহা সুপরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় যে, সাধারণতঃ কাম্যনৈষ্ণুল সাধনের প্রতিপক্ষ ব্যতিরেকে স্বপক্ষে কখনই নহে, এবং ঘৃণার পাত্রও নহে। এইরূপ বিবেক বুদ্ধির শীতল ছায়ায় সমাসীন হইয়া সংসার পরিশ্রান্তি দূর করিতে অভিলাষী সাধককুল নির্বিঘ্ন চিত্তে ভাবিয়া দেখুন যে, সাধনের উভয় পথই অগ্রপশ্চাৎ ভাবে একই গন্তব্য স্থান অধিকার করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কে কোন পথে যাইবেন। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেই ভাবেই অভিলষিত পথে গমন করিয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করুন। প্রয়োজন বোধ করিলে বারান্তরে এ বিষয় সমধিক আলোচনা করা যাইবে *

গৌর-গোবিন্দ।

—:০:—

ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই। (নরোত্তম দাস)।

*　*　*

দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ সুবর্ণ প্রতিমা ভান
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্যজ্যোতি দেখি পাইল বড় প্রীতি
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

* লেখক প্রবন্ধের মধ্যে যে সমস্ত কথার অবতারণা করিয়াছেন, সাধারণে সে সকল বিষয় বুঝিবার অবসর পায় কৈ? তবে এ সকল বিষয় প্রতিবাদ করিয়া লেখককে নিরুৎসাহ করিবার আবশ্যক নাই, তাই আমরা এপ্রবন্ধ সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশে ক্ষান্ত হইলাম। পাঠকগণের মধ্যে যদি এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে তিনি আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইতে পারেন, আমরা প্রয়োজনানুসারে উহা প্রকাশে যত্ন লইব। ইতি—(সম্পাদক ভক্তি।)

সীতা ঠাকুরাণী বালকঠাম শ্রীগৌর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গোকুলকানুর পরিচয় কতকটা পাইয়াছেন, কিন্তু এখনও বর্ণের মর্ম্মানুভব করিতে পারেন নাই। শ্রীচরিতামৃত কার আবার বলিতেছেন—

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ।
এই শিশু সর্ব্বলোকে করিবে তারণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ মহাজ্ঞানি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌরাঙ্গের হস্ত পদাদিতে মহাপুরুষ-ভূষণ বত্রিশ লক্ষণ দর্শন করিয়া বিশ্বম্ভরকে নারায়ণ বলিয়া স্থির করিলেন। বাল্য লীলায় আবার—

লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে। (শ্রীচৈঃ চঃ)
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার। (শ্রীচৈঃ চঃ)

এ সকল দেখিয়া মনে হয় ননীচোরা ব্রজদুলালই যেন—

শিশুগণ ল'য়ে পাড়া পড়শীর ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

আবার লীলা দর্শন করিতে যাইয়া ভগবতে যেমন দেখিতে পাই, এও সেই ভাব—

চোরে লইয়া গেল প্রভু বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে আইলা প্রভু তারে ভুলাইয়া॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

আমাদের গৌর যে গোপাল, ইনিই যে গোকুলশশী তাহা বাল্যলীলায় এ সকল অনুভবময়লীলা খণ্ডে উপলক্ষেই পরিচয় দিয়াছেন।

ব্রজগোপাঙ্গনাগণের কাত্যায়নীব্রতের সাফল্য প্রদানবৎ নিমাই, বল্লভ-নন্দিনী লক্ষ্মীর পূজা সাদরে গ্রহণ করিলেন।

প্রভু কহে "আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভিপ্সিত বর॥"
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

এস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ ব্রজলীলা স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে বটে কিন্তু এখনও রাধা-প্রকটতার আভাস পাওয়া যায় নাই। পৌগণ্ডে প্রভুর বিদ্যাবিলাস আরম্ভ। চৈতন্য ভাগবতকার নিজ ভাষায় বলিতেছেন—

নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হেন সান্দীপণি॥

অধ্যয়ন-লীলায় শ্রীনিমাঞির মথুরানাথত্ব বেশ স্পষ্টতর প্রকাশিত হইয়াছে। সুরধুনী পুলিনে ধেনুবৎসদল বিচরণ করিতেছে দেখিয়া ব্রজের রাখালভাব প্রভুর মনে পড়িত এবং ভাবের ভোরে হৈ হৈ করিয়া গোবৎস চরাইতেন। এইভাবে নদীয়াচাঁদ গোকুলচাঁদ হইয়া পড়িতেন। এবিষয়ে মহাজন বাক্য অপ্রাকৃত প্রমাণ। যথাঃ—

গোষ্ঠ লীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
ধবলী শ্যামলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গাবেণু মুরলী করি জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া বন ফিরান পাঁচনি॥ (বাসুদেব ঘোষ)

শ্রীনন্দ-নন্দন ও বাসুদেবের ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দেশ বাহুল্য মাত্র। কারণ বাসুদেব শ্রীনন্দ-নন্দনের বিভূতি। কৃষ্ণ-গুণাবলীর পর্য্যালোচনায় এই অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইবে। তদ্গুণাঃ—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসুলক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যোবুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকাল সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্র চক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান শরণাগত পালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥

ইত্যাদি। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

প্রোক্ত বিশেষণ নিচয় শচীনন্দনে ও যদুনন্দনে তুল্যরূপেই সঙ্গত হয়। কেবল শূরঃ ও নারীগণমনোহারী এই দুইটী বিশেষণ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু সে সন্দেহও ভ্রান্তি মূলক, কেননা—

"উৎসাহী যুধি শূরোঽস্ত্রপ্রয়োগে চ বিচক্ষণঃ।"

রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণচ্ছলে অনেকগুলি বিকট দৈত্যাসুর অবলীলা ক্রমে নিধন করিয়াছেন। কোনও অস্ত্রপ্রয়োগ করেন নাই বটে কিন্তু উৎসাহ ও উল্লাসের সহিত নিহত করিয়া সখাগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। হস্ত দ্বারা নিধন করিলে, হস্তও অস্ত্র বলিয়া গণ্য হয়। বসুদেব নন্দন শত্রুহননে চক্র প্রয়োগ করিয়াছেন। এদিকে নবদ্বীপে জগাই মাধাই উদ্ধারে শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেব চক্রের আহ্বান করিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু আবশ্যক হয় নাই। ইহাতে মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্যেরই প্রকাশ পাইয়াছিল।

কৃষ্ণ তুমি চুম্বকমণি, লোহা গোপীগণ।
যথা যথা ক্রীড়া কর, তথায় ভ্রমণ॥

আবার দ্বারকানাথের এই গুণে বিমুগ্ধা হইয়া জগদারাধ্যা রুক্মিণী, কালিন্দী আদি নারীগণ তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ নাগরী ভাবাপন্ন নরহরি ঠাকুরকে কিরূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন তাহা নরহরি ঠাকুরের স্বরচিত পদে পাঠ করা যাউক্—

হানিল নয়নবাণ তনু যে সারিল।
দরশে অবশ অঙ্গ পরশে শীতল॥

শ্রীনন্দ নন্দনাত্মক শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরির সর্ব্বচিত্ত প্রাণ আকর্ষণ করিলেন এবং নরহরিকে নদীয়ানাগরী বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যথা :—

বেলা অবসানে   ননদিনী সনে
জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের   রূপ নিরখিয়ে
কলসী ভাঙ্গিয়ে এনু॥
কাঁপে কলেবর   গায়ে আসে জ্বর
চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের   রূপের সাগরে
সাঁতারে না পাই থা॥
দীঘল দীঘল   নয়ন যুগল
বিষম কুসুম শরে।

রমণী কেমনে ধৈরয ধরিবে
মদন কাঁপয়ে ডরে॥
কহে নরহরি গৌরাঙ্গ মাধুরী
যাহার অন্তরে জাগে।
তার কুলশীল সকলি মজিল
গোরাচাঁদ অনুরাগে॥

রাগানুরঞ্জিত নয়নে যিনি শ্রীনন্দনন্দন তিনিই যে ভক্তের নিকট শচী-নন্দনরূপে প্রতিফলিত হন, তাহা উপরোক্ত পদে প্রমাণ হইতে পারে। সামর্থাদি রতিভেদে এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম বলিয়া ভক্তের অনুভূত হয়। নচেৎ—

কংসারিরপি সংসারবাসনা বদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধবে হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

গীতগোবিন্দের এই শ্লোকে শ্রীজয়দেব "কংসারিঃ" পদ ব্যবহার করিলেন কেন? আবার "সংসার" শব্দেরও বিশেষার্থ এস্থলে দেখুন।

এই শাস্ত্রানুগত্যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বৈধভাব সর্ব্বথা পরিহার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গে তাঁহার ও শ্রীরাধার পৃথক স্ফূর্ত্তি দর্শাইতে যত্নশীল হইব। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোল্লিখিত গুণাবলী শ্রীগৌরাঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা দর্শান যাউক্।

রুচিরাঃ—শ্রীরাধার পদ্মগন্ধি-কান্তি-লাবণ্যে কৃষ্ণের মৃগমদগন্ধি লাবণ্যামৃতপুর শ্রীঅঙ্গ আবরিত।

নিরমল গোরাতনু কষিত কাঞ্চন জনু
হেরইতে পড়ি গেল ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গমে দংশন মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥
সজনি সব হাম পেখলু গোরা।
অকুল দিগ্‌বিদিগ নাহি
পাইয়ে মদন লালসে মন ভোরা॥ (বাসুদেব)

শ্রীনরহরি ও বাসুদেব শ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ্ সুতরাং ইহাঁদের বর্ণনা কল্পিত অর্থাৎ রূপক নহে।

তেজঃ প্রভাবঃ।—কাজীর উদ্ধার লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু কি বলিয়াছেন?—

ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে অগ্নিদেহ বাড়ীর ভিতর॥
দেখি মোরে কি করে উহার নরপতি।
দেখি আজি কোন্ জনে করে অব্যাহতি॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ।

প্রভুর প্রভাব কাহিনী কি বলিব, এক একটী ভক্তের প্রভাবইবা কত শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাস কি বলিয়াছেন দেখুন্ :—

কেহ বলে আমি শ্বেত দ্বীপের বৈষ্ণব।
কেহ বলে আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ॥
কেহ বলে এবে কাজী বেটা গেল কোথা।
লাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা॥

বলীয়ান্।— প্রভুর নৃত্য বিলাসে, তীর্থপর্য্যটনলীলায়, জলকেলিতে এবং কোন্দলে তাঁহার অসীম বল প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রভুর বালক সব জিনে বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ।

নামে প্রেমোদয় হয়, সুতরাং সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি কর গৌরলীলা আদ্যোপান্তই মধুর। দৈহিক বল প্রয়োগের স্থান বিরল কি মোটেই ছিলনা।

বয়সান্বিতঃ।—প্রভু বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবন বিবিধ বয়সে বিবিধ রস দিয়া ভক্তঅলিগণকে পানোন্মত্ত করিয়াছেন।

সত্যবাক্যঃ।—"স্যান্নানৃতং বচো যস্য সত্য বাক্যঃ স ভণ্যতে।"

হাসি বলে প্রভু আগে পড় কত দিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন॥
এমন বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে।
অজভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ।

প্রিয়ম্বদঃ।—"জনে কৃতাপরাধেঽপি শান্তবাদী প্রিয়ম্বদঃ।"

এক ব্রাহ্মণ মুখে শ্রীনিত্যানন্দের নিন্দা শ্রবণ করিয়া—

* * শ্রীগৌর সুন্দর।

হাসিয়া বিপ্রের প্রতি কহিলা উত্তর ॥
শুন বিপ্র যেবা মহা অধিকারী হয়।
তবে তার দোষ গুণ কিছু না জন্মায় ॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ।

বাবদূকঃ।— স্থুল এই পঞ্চদোষ পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে।
অবিচার বাক্যে অবশ্য পড়ে দেখিবাদে ॥
বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কারে হৈলে করে অর্থ ঝলমল ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না সরয়ে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত ॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ।

সার্ব্বভৌম ও প্রবোধানন্দ প্রবোধেও প্রভুর অলৌকিক মেধা, প্রতিভা পাণ্ডিত্য ও বাবদূকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দিগ্বিজয়ী কাশ্মীরীর পরাজয়ে বাগ্দেবী সরস্বতী প্রভুর এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

সরস্বতী রাত্রে তারে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল ॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।" সুতরাং এস্থলে ঈশ্বর কৃষ্ণ। বিদ্যাবিলাসে ও কাশ্মীরীবিজয়ে শ্রীচৈতন্য প্রভুর অসাধারণ মেধা শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়—

ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥ শ্রীচৈঃ চঃ

বিদগ্ধঃ।—"কলাবিলাস দিগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্ত্তিতে।"

শ্রীগৌরাঙ্গ নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন, মুকুন্দ বাসুদেব প্রভুরই প্রেরণায় সঙ্গীতবিশারদ হইয়াছিলেন।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ।

প্রভুর রসোল্লসিত নৃত্যবিলাসে সুর-নর সকলেই বিমুগ্ধ হইতেন। তাহার তরঙ্গায়িত সিন্ধুরূপ তাণ্ডববিহারের লহরোত্থিত শীকরবিন্দু এখনো কোন কোন ভক্তের হাবভাবনর্ত্তন ভঙ্গীতে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বারাণসীর বিন্দুমাধব মন্দির সম্মুখে প্রভুর অপরূপ প্রেমনৃত্য দর্শনেই প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী আত্ম-বিস্মৃত হইয়া প্রভুর চরণের শরণাগত হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ভবনের নাট্যাভিনয়ে প্রভুর বিদগ্ধতার একশেষ প্রকাশ পাইয়াছে।

এই মত বলে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।
সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কাঁদে হাসে॥

কৃতজ্ঞঃ।—প্রভুর লীলাসমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয়। সুতরাং দক্ষতা সম্বন্ধে পৃথগালোচনা নিষ্প্রয়োজন। জগাই মাধাই উদ্ধার লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন,—যে কৃতজ্ঞতায় পাষাণও বিগলিত হয়। তাহা এই :—

জগাই রাখিল হেন বচন শুনিয়া।
জগায়েরে আলিঙ্গেন প্রভু সুখী হৈয়া॥
জগায়েরে বলে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ।

সুদৃঢ় ব্রতঃ।—প্রভু সন্ন্যাস করিবেন, তাই বলিতেছেন :—

প্রভু বলে মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব মুই না রহিব হেথা॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ।

এইভাবে মহাপ্রভুর লীলা কাহিনী আলোচনা করিয়া শ্রীগোবিন্দ লীলার সহিত মিলন করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥

বারান্তরে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। অলমিতি।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য।)

—:•:—

সম্বরিয়া স্বীয় সহস্র কিরণ,
রক্তিমায় রঞ্জি পশ্চিম গগন,
অস্তাচল চূড়ে বসিলা তপন,
ধরণী পরিলা ধূসর বসন।
দু'একটি তারা ফুটিছে আকাশে,
কুমুদিনী ধীরে নয়ন বিকাশে,
ঘরে ঘরে বধু জ্বালিয়াছে বাতি,
দেবালয়ে, বাজে—মঙ্গল আরতি।
ক্ষীণালোকে পূরি পূরব অম্বর,—
রাহুগ্রস্ত হ'য়ে, পূর্ণ শশধর,—
উদিলা ফাল্গুনী পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়,
বিতরিতে পুণ্য—এমর ধরায়।
উপরাগ হেরি নর-নারীগণ,
আনন্দে করিছে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মৃদুমন্দ বহে সান্ধ্য-সমীরণ,—
পুলকে পূর্ণিত সকল ভুবন।
নদীয়া ভরিয়া হরি হরি ধ্বনি,—
হরি ধ্বনি বিনা কিছুই না শুনি;
গঙ্গা ঘাটে আসি, শিষ্ট জন সঙ্ঘ,
শ্রীহরি নামের, তুলিছে তরঙ্গ।
আনন্দে করিছে,—সবে স্নান দান,—
মনেতে ভাবিয়া অশেষ কল্যাণ;—

ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভ তিথিযোগ,—
তাহাতে নক্ষত্র ফল্গুনীর ভোগ।
রাশি লগ্ন সিংহ—উচ্চ গ্রহগণ,
ষড়-অষ্টবর্গ—সর্ব্ব সুলক্ষণ,
নরলোকে সুরলোকে কি আনন্দ!
সকলেরি মুখে,—"শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ!!"
এ হেন সময় নদীয়া নগরে,—
জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুরের ঘরে,—
চৌদ্দশত সাত শকে শুভক্ষণে,
জনমিলা প্রভু, লীলায় আপনে।
নারীগণ মিলি দিল জয়কার,—
উলু উলুধ্বনি করি পাঁচ ঝাড়।
কলি-কবলিত জীবের উদ্ধার,—
করিবারে এই গৌর অবতার।
জগত জুড়িয়া জয় জয় জয়,—
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণানন্দময়,—
শচীর সূতিকা গৃহ জ্যোতির্ম্ময়,
নিরখি আনন্দে, বিহ্বল বিজয়।

কাঙ্গালের মনের কথা।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য।)

—:•:—

এই সংসারের একটি প্রাণীও মরিতে ইচ্ছা করেনা,—সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চায়। মরণের নামে সকলেই কাঁপিয়া উঠে,—ভয় পায়। তবে যে দুই একটি অজ্ঞানান্ধ স্ত্রী পুরুষ,—শোক-দুঃখের কিম্বা ক্রোধাপমানের তীব্র তাড়নায় ধৈর্য্য হারা হইয়া আত্মহত্যা করে,—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

মানবেতর জন্তুর কথা জানিনা, কিন্তু দুই একজন পশুবৎ অজ্ঞ ব্যতীত,—মানুষ প্রায় সকলেই জানে যে,—একদিন না একদিন,—নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। তথাচ মরিতে চায় না। চায়না কি? অর্থাৎ মরণের জন্য সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্তে প্রস্তুত থাকিতে পারেনা।

অশীতিপর বৃদ্ধ,—নানা দুরারোগ্য উৎকট রোগে আক্রান্ত,—এখন তখনই মহাযাত্রা করিয়া চলিয়া যাইবে,—সংসারের সুখভোগ যাহা করিবার,—করিয়াছে,—সেও মরিতে চায় না। মরিবার নামে সেও ব্যাকুল হয়।

স্ত্রী পুত্র নাই,—বন্ধু বান্ধব নাই,—ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করে,—এমন কোন আত্মীয় স্বজন নাই,—এক বেলা আহারেরও সংস্থান নাই,—চক্ষু দুইটিও নাই,—লাঠি ভর করিয়া,—পথে বিপথে চলিয়া দিনান্তে একমুষ্টি মাত্র আহার করে,—যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে,—সেও মরিতে চায়না।

কুষ্ঠরোগে হাত পায়ের আঙ্গুলগুলি পড়িয়া গিয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত,—মক্ষিকার উৎপীড়নে সর্ব্বদা গা ঢাকিয়া নির্জ্জনে পড়িয়া থাকে,—সেও মরিতে চায় না!

কতজন অতি ঘৃণিত, লাঞ্ছিত অতি অবমানিত জীবনটা লইয়া—সমাজ চক্ষের অন্তরালে বন্য পশুর মত লুকাইয়া লুকাইয়া কাল যাপন করিতেছে, সেও মরিতে চায়না।

আর যারা সুখে সন্তোষে, সুস্থ শরীরে, দশজনের মধ্যে একজন হইয়া আছে,—তারাতো চায়ই না। ইহারা—মনে মনে নিজেকে অমর বলিয়া গর্ব্ব করে। হরি! হরি!! হরি!!!

এই সব জগতের জীব না মরিয়া পারিবে না,—তথাচ মৃত্যু ভয়ে সর্ব্বদা কম্পিত। মানবেতর জন্তুদিগের মধ্যেও মরণের ভয় যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য প্রভৃতি—জন্তুরাও মৃত্যু-ভয়ে সতত সন্ত্রস্ত অতি ক্ষুদ্রতম কীটাণুদিগের মধ্যেও মৃত্যু ভয়ের অটুট রাজত্ব। তাহা আমরা অনেক স্থলে যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত অনুভব করিতে পারি না।

মৃত্যুভয় সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে এই,—কোন এক দরিদ্র ব্যক্তি অরণ্য হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বাজারে গ্রামে বিক্রয় করিত। একদা সে অধিক অর্থলাভ লালসায়,—বৃহৎ বোঝা বাঁধিয়া আর মাথায় করিতে

পারিতেছে না। বহু চেষ্টাতেও কাষ্ঠ বোঝাটি তুলিতে না পারিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এবং মনোদুঃখে মৃত্যুকে ডাকিতে লাগিল। যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত, তখন সে মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তির সাক্ষাদ্দর্শনে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মৃত্যু তাহাকে চৈতন্য করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে ডাকিয়াছ কেন?" সে তখন মতলব ঘুরাইয়া লইয়া বলিল,—"মহাশয়! আমার এই বোঝাটি ধরিয়া মাথায় তুলিয়া দিবার জন্য।"

জগতের জীব ইচ্ছা করুক আর নাই করুক,—কিন্তু সকলকেই একদিন নিশ্চয় মরিতে হইবে। তুমি যখন জন্মের ভিতর দিয়া আসিয়াছ,—তখন তোমাকে মৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইতে হইবেই। না মরিয়া এই মর জগত হইতে যাইবার অন্য কোন উপায় আছে কি?—সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার দিনতো বহু দিন হইল চলিয়া গিয়াছে। অতএব যাইতে হইবে কিন্তু মরণের ভিতর দিয়া।

তুমি রাজা হও আর প্রজা হও—ভক্ত হও আর অভক্ত হও,—যেই কেন হও না—যাইতে হইবে কিন্তু মরণের ভিতর দিয়া। তুমি রোগী হও বা সুস্থ হও, কুলীন হও বা অকুলীন হও,—সরল হও বা কুটিল হও,—যাইতে হইবে কিন্তু মরণের ভিতর দিয়া।

মৃত্যুটা যে কি? কত কষ্টে যে জীবের দেহ হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয়,—কত যাতনায় যে দেহ পিঞ্জর হইতে প্রাণ পাখী উড়িয়া যায়,—তাহা যে মরে, সে ভিন্ন অন্য লোকে বুঝিতে পারে না। তবে জ্ঞানীজন আপন প্রজ্ঞা বলে কতকটা অনুভবে আনিতে পারেন মাত্র।

মৃত্যু যাতনা এবং মৃত্যুটা যে কি? তাহা যদি মানুষে ঠিক ঠিক বুঝিয়া লইতে পারিত,—তাহা হইলে এই মর জগতে নিশ্চয়ই,—হিংসা, দ্বেষ, বাদ বিসম্বাদ,—অহঙ্কারাভিমান, পরপীড়ন, স্বার্থ বুদ্ধি কোন কিছুরই স্থান থাকিত না। মৃত্যুকে প্রকৃতরূপে না বুঝাতেই মানব-রাজ্যে দানব-লীলার নিত্যাভিনয়। প্রেত-পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য।

ভাই মরজগতের মানুষ! তুমি যে মরিতে চাওনা—বলতো না মরিয়া এই দেহ লইয়া যাইবে কি উপায়ে? মর রাজ্যে আসিয়া অমরত্ব লাভের আশাটা দুরাশা মাত্র। এবারতো মরিবেই,—ভবিষ্যতে যদি আর মরিতে ইচ্ছা না

কর,—তবে অমর-ধামে যাইবার চেষ্টায় নিযুক্ত হও। মর রাজ্যে আসিলে মরিতেই হইবে। অমর-ধামে গেলে আর মরিতে হইবে না।

তবে তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার যে,—অমর-ধামে যাইবার উপায় কি? এ সম্বন্ধে গুরু বাক্যই সত্য। গুরুদেব জগতের জীবকে অমর ধামে টানিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে সেই পথই প্রদর্শন করাইতেছেন। আমরা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ সে পথের—পথিক না হইয়া, বারম্বার এই—জ্বালা যন্ত্রণাময় মর জগতে—মরিতে আসি।

গুরুদেব বলেন,—"যদি অমর ধামে বা আনন্দ ধামে যাইতে চাও,—মর জগতের দুঃখ দুর্দ্দশা জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাও,—মৃত্যু যাতনা হইতে অনন্ত কালের জন্য অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছা কর,—তবে যথা বিহিত স্বধর্ম্মে থাকিয়া শ্রীশ্রীগৌর ভগবানের ভজনা করিতে থাক। প্রভু নিত্যানন্দের চরণে শরণ লও। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে বসিয়া শ্রীহরি নাম কীর্ত্তন কর। ভক্তের প্রসাদ চরণামৃত গ্রহণ কর। আর তোমার কর্ম্মফল সকল শ্রীশ্রীযশোদা নন্দনের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া দেও। এবং সর্ব্বপ্রকার বাসনা হইতে মনকে মুক্ত করিয়া লও। লইয়া এবার মর,—এই মরণেই তোমার মরণ শেষ,—আর জন্মিতে বা মরিতে হইবে না। এইবার মরিয়াই লীলাময়ের নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইতে পারিবে।

মৃত্যুটাকে খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। লইয়া জীব জগতকে বুঝাইয়া দেও যে, যদি জন্ম-মরণ-পথ বন্ধ করিয়া অমর হইতে চাও,—তবে সর্ব্বদা বলিতে থাক,—হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

মৃত্যু বুঝিলেই বৈরাগ্য আসে,—মনপ্রাণ অবসন্ন হইয়া ভগবচ্চরণে আশ্রয় লয়। তখন আপনা আপনি হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া মহামন্ত্র স্ফুরিত হয়,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

জীবের পরিণাম।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—"জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু" অর্থাৎ জন্ম হইলেই তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। এমন নিশ্চয় বিষয় জগতে আর কিছুই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবকী দেবীকে বধোদ্যত ভোজপাংশু কংশের সহিত বসুদেব মহাশয়ের কথোপকথন প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, বসুদেব মহাশয়, কংশকে বলিতেছেন,—

"মৃত্যুর্জ্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥" ভাঃ ১০।১।৩৮

হে বীর! জন্মধারী জীবগণের দেহের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, সুতরাং অদ্যই হউক আর শত বৎসরান্তেই হউক প্রাণিগণের মৃত্যু অনিবার্য্য।

জীব পর-মুহূর্ত্তে কি হইবে বলিতে পারেনা কিন্তু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাহার মৃত্যু অবধারিত হইয়া রহিয়াছে এটী খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারে।

* * * *

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—শুধু জীব নয়—যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহাকেও একদিন দেহ ত্যাগ করিতে হইবে, তবে মৃত্যু নাই কেবল সেই অনাদিরাদি সর্ব্বকারণ কারণ সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের। এতদ্ব্যতীত এই নিলাম্বু-মেখলা বসুন্ধরার ক্রোড়স্থিত যাবতীয় জীবকেই একদিন না একদিন স্বজনগণ পরিবেষ্টিত ভোগবিলাসময় এই মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক অজানা দেশে গমন করিতে হয়।

* * *

এক্ষণে এই মৃত্যু কি? যদি সে বিষয় সন্ধান করিতে যাই তবে দেখিতে পাই—যে সময় জীব, জাগতীক যাবতীয় সংশ্রব বিহীন হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিতেও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া থাকে, শরীরাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রনিচয়ের সেই চিরবিশ্রামেরই নামান্তর মৃত্যু বলিয়া কথিত হয়। সবই আছে, সেই চোক্, সেই কাণ, সেই নাসিকা, সেই হস্ত, পদ, সবই বর্ত্তমান কিন্তু কি জানি কোন

এক মহান্ পদার্থের অভাবে সব থাকিয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থা জীবমাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী। ভাবুক কবি বড় প্রাণের কথাই বলিয়াছেন;—

"একদিন হায় এমন হবে এ মুখে আর বল্‌বে না।
এ হাতে আর ধর্‌বে না ভাই এ চরণ আর চল্‌বে না॥
নাম ধ'রে ডাক্‌বে সবে শ্রবণেতে শুন্‌বে না।
পুত্র মিত্র জগৎ চিত্র নেত্র তোমার হের্‌বে না॥
অসার হবে এ রসনা আস্বাদন আর কর্‌বে না।
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে লবে না॥
রাজ-সিংহাসন ছাই মাটি বন এ বিচার আর থাক্‌বে না।
বন্ধনে দহনে দেহে যাতনা তো জানাবে না॥
হবে সাঙ্গ অবসান সঙ্গে কিছুই যাবে না।
(তাঁরে) এইবেলা ডাক্ প্রাণ ভরে ভাই, সময় যে আর মিল্‌বে না॥"

* * *

বোধে, এ কথাগুলি কখন না কখন, কোন না কোন হৃদয়ে উদয় হয়; আর বেশ বিবেচনা করিয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও এই ভাবের একটী প্রতিচ্ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখে। রাখিবেই বা না কেন? বেশী দিনের কথা ত নয়? সেই মাতৃগর্ভে সকলেরই এ কথা স্মরণ ছিল। আর ভগবানের নিকট করযোড়ে কতই না আকুলি ব্যাকুলি করিয়া বলিয়াছিল, "প্রভো! আমি বেশ বুঝিয়াছি, তোমাকে ভুলিয়াইতো আমার পুনঃ পুনঃ গর্ভ যন্ত্রণা হইতেছে, এবার জন্ম দেও, আর তোমায় ভুলিব না।" কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সি মায়ার এমন চতুরালি যে, জন্ম গ্রহণ মাত্রেই আমরা মায়ার হাতে সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে বসি। মানবের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থাগুলি পর পর সাজাইয়া কোন সাধক অতি সুন্দর একটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন গীতটী এখানে পাঠকগণের অবগতির জন্য অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম—

"সপ্তম মাসেতে যবে জননী জঠরে,
গর্ব্ভের অনলে পুড়ে ডাকিলে কাতরে,
(কোথায় আছ দীননাথ) (এবার মতিহীনে দয়া কর)

(আমি আর তোমায় ভুলিবনা) (এবার আমায় জনম দাও)
(এবার) জনম পেয়ে ভবে গিয়ে পূজ্‌ব তোমার পদযুগলে॥
ভূমিষ্ঠ হইতে মায়া জ্ঞান হরি নিল,
প্রবল জঠর স্মৃতি অন্তর হইল,
(সব ভুলে গেলে,) (বিষ্ণু মায়ার পরশনে)
(শেষে) শৈশবেতে দিবারেতে রৈলে ধুলা খেলার ছলে।
বাল্যেতে খেলিলে খেলা সঙ্গিগণ সনে,
কাটালে কৈশোর কাল পুস্তক পঠনে
(সে পড়া পড়লেনা) (যে পড়া পড়তে জনম নিলে)
(আবার) যুবাকালে মোহজালে পড়িলে রিপুর কৌশলে॥
সংসার চিন্তাতে প'ড়ে প্রৌঢ়কাল গেল,
ক্রমে বক্ষে বদ্ধমূল রৈল পাপ শেল
(সব ভুলে গেলে) (মায়ামায়ির সঙ্গ পেয়ে)
(শেষে) আয়ার ভয়ে নত হ'য়ে পড়িলে তার পদতলে॥
আসিল বার্দ্ধক্য কাল অতীব ভীষণ রে,
শুভ্র কেশ লোল চর্ম্ম কোটরে নয়ন রে,
(এখন আর কি করিবে) (সর্ব্বেন্দ্রিয় বিকল হ'ল)
ত্যজি মায়াছবি আয়ুরবি যাবে চির অস্তাচলে॥ *

*　　•　　•

সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীব আমার আমার করিয়া কত কি যে করে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত ব্রত, পূজা, ধ্যান, তপ, জপ, কত অভিযোগ আপত্তি করে কিন্তু সে যখন চলিয়া যায় তখন পড়িয়া থাকে মাত্র তাহার নশ্বর দেহ-পিঞ্জর খানি এবং একটু স্মৃতি; আবার সেই দেহখানিকেও বন্ধু বান্ধবগণ চির-উদাসময়ী শ্মশান ভূমিতে লইয়া গিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতায় দগ্ধ করে। হায় জীব! এইতো তোমার দেহের পরিণাম, এই দেহের জন্য তুমি কত না যত্ন, কত না অর্থ ব্যয় করিয়াছ, সামান্য ধূলি কণা লাগিলে তুমি নানা প্রকারে তাহা দূর করিতে যত্ন করিতে, আর আজ সেই দেহের তোমার এই দশা, তোমার সে ভাব, সে উদ্যম এখন কোথায়?

* * *

শ্মশান তুমিই ধন্য ; ছোট, বড়, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, সুন্দর কুৎসিত এক কথায় সকলকেই তোমার ক্রোড়ে আসিয়া একদিন বিশ্রাম লাভ করিতে হইবে। একি, সমীরণ, সাঁ সাঁ রবে কাণে কাণে তুমি আবার কি বলিয়া দিতেছ? ও বুঝিছি ; মানব জীবনের নশ্বরতার বার্ত্তা এমন করিয়া মানবের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেছ—তা বেশ, দাও—দাও ; এমন করিয়া দাও যেন সে কথা, মানব কখন না ভুলে। আর অস্থিমালা তুমিও শ্মশানের চতুর্দ্দিকে অমনি করিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া নরের উপাধি মর্য্যাদা লোপ করিতে থাক, জীব দেখিয়া শিখুক আর মনে মনে ভাবুক, রাজা, প্রজা, ধনি, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলেরই ত এই অবস্থা।

* * *

হায় মুগ্ধ মানব। তোমার অমন সুন্দর দেহের এই পরিণতির জন্যই কি তুমি প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া ধরাকে সরার মত জ্ঞান করিতে? এই জন্যই কি তুমি ভোগ-বিলাসে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া অমৃত জ্ঞানে বিষয় কালকূট পান করিতে ছিলে? তুমি যে নব-কোমল-কুসুম-কলিকা-সদৃশ ভার্য্যার স্কন্ধে শিরীষ-কোমল বাহু যুগল রাখিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিতে, আজ তোমার সে অনুভব শক্তি কোথায় গেল? ওই যে তোমার আত্মীয় স্বজন ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া করুণ রোদনে গগন প্রতিধ্বনিত করিতেছে, চাও—চাও, একবার তাহাদের প্রতি ফিরিয়া চাও উঠিয়া বল কেন তোমরা কাঁদিতেছ ; তোমার নয়ন-কটাক্ষ-শর-সন্ধানে কত হরিণী যে ব্যাকুল হইত, আজ তোমার সে নয়নের শক্তি কোথায় গেল ; কই মানব! তোমার ভূষা কই, কই তোমার বেশ, তুমি যে এখন দীনাতিদীন কাঙ্গাল সাজিয়াছ। স্তুতি, নিন্দা, মান, অপমান সকলই যে তোমার নিকট একরূপ সমান হইয়াছে, এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে তুমিই না হৃদয়ে শত সহস্র আশা পোষণ করিতে ছিলে? এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে না তোমার নয়ন কত দৃশ্য দর্শন করিতে উৎসুক ছিল? কিন্তু একি, ক্ষণকাল মধ্যে তোমার এমন নির্ব্বাক নিস্পন্দ অবস্থা কেন? কি করিয়া তোমার এমন অবস্থা আসিল এ প্রহেলিকা বলিয়া দিয়া আমার সন্দেহ নিরসন করিতে পার কি?

* * *

একি নিদ্রা! না তাই বা কেমন করিয়া বলি ; তুমি ত প্রতিদিনই নিদ্রা যাইতে, কিন্তু সে নিদ্রায় আর এ নিদ্রায় এত বৈষম্য দেখিতেছি কেন? ইহাই কি তোমার

কাল নিদ্রা। তখনতো সামান্ত চিৎকারে তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হইত, আর এখন ত শত শত কান্নার নির্ঘোষেও তোমার এ নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না? কেন এরূপ অদ্ভুত রূপান্তর, কেন এরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন এ কথা কে বলিয়া দিবে। শত শত উপদেশে, শত শত দ্রব্য গুণে এতদিন মুহুর্ত্তের জন্ম যে অবস্থা তোমার হয় নাই, আজ বিনা উপদেশে বিনা দ্রব্যে কি করিয়া তাহা সংঘটিত হইল। তোমার লীলা খেলা ত ফুরাইল যে কটা দিন ভবে ছিলে একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, কি করিতে আসিয়া কি করিয়া চলিয়া গেলে?

* * *

এইত জীবের পরিণাম। তবে কেন জীব সচ্চিদানন্দ-ঘন ভগবানকে ভুলিয়া অসৎ পথে ধাবিত হয়। আর না বন্ধুগণ। আর ভুলিয়া থাকা ভাল দেখায় না, যখন চোখের উপর এ ব্যাপার নিত্য প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে তখন এই মুহুর্ত্ত হইতেই এমন কার্য্য করিতে আরম্ভ করা উচিত, যাহাতে শেষের দিন হাসিতে হাসিতে যাইতে পারা যায়; ভক্ত তুলসিদাসজি বলিয়াছেন শুনুন—

তুলসি। যব জগমে আওয়ে জগ হাসে তোম্ রোয়।
এসি করণি কর্‌কে, চলো তোম্ হাস জগ রোয়।

বন্ধুগণ, সাধু বাক্য স্মরণ করিয়া নিজ নিজ জীবন গঠনে প্রবৃত্ত হউন আমরাও হরিবোল বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করি। হরিবোল, হরিবোল।

প্রেরিত পত্র।

—:০:—

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত 'ভক্তি' সম্পাদক মহাশয়।

আপনার সুবিখ্যাত 'ভক্তি' পত্রিকার ১৩২৫ সালের চৈত্র সংখ্যায় "কামিনী সাধনার প্রতিপক্ষ কি না?" ইতি শীর্ষক সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বহু সংশিক্ষা লাভ করতঃ প্রীত হইয়াছি। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধের কতিপয় স্থলে স্বতঃই কতকগুলি সন্দেহ উদিত হইয়াছে। সেগুলি ক্রমশঃ আপনাকে

জ্ঞাত করাইব। আশা করি শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া সুমীমাংসা করতঃ আপনি ঐ সকল সন্দেহ দূর করিতে যত্ন লইবেন। এক্ষণে আমার বক্তব্য শুনুন।

প্রথমতঃ উক্ত প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের মতে—"যাহার দেহে যে গুণের আধিক্য থাকে তা'র প্রবৃত্তিও তদনুরূপ হয়। এই গুণ এবং গুণ হইতে জাত যে প্রবৃত্তি ইহাও আবার বংশগত হইয়া থাকে, একটী সামান্য উদাহরণ যথা—আম্রের বীজে যেমন আম্রই হয়, ধান্যের বীজে যেমন ধান্যই হয় সর্ষপ বা অন্য কিছু হয় না সেইরূপ সত্ত্ব গুণ হইতে উত্তরোত্তর সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি (ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়। "এই যুক্তিটি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিনা।

গুণাধিক্য অনুসারে প্রবৃত্তি হওয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না। বস্তুতঃ প্রবৃত্তি দেখিয়াই মানবের গুণ নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু গুণ ও তজ্জাত প্রবৃত্তি বংশগত হয়, ইহা কলের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ" ইত্যাকার বচন পরম্পরার কোন আবশ্যকই হইত না। অবশ্য ২।৪টি দৈহিক ও মানসিক গুণ, দোষ বা প্রবৃত্তি বংশগত হয় কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা নিঃসন্দেহে ধারণা হয় না যে, আম্রের বীজে যেমন আম্রই হয় সাত্ত্বিকের বীজে তেমন সাত্ত্বিকই হইবে। উদ্ভিজ্জগণ সঙ্গ-ফলে পরিবর্ত্তিত হয় না কিন্তু মানব চরিত্রের উপর সঙ্গ ও সাধনার প্রভাব অত্যধিক পরিলক্ষিত হয়। তবে মানবের সন্তান মানবই হয় এই মাত্র বলা যাইতে পারে।

জন্ম-রহস্য বা তদ্বিষয়ক শাস্ত্রাদি জানিনা; কিন্তু শুনিয়াছি যে (১) আত্মা-বৈজায়তে পুত্রঃ (২) জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে উচ্চ নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়। (৩) সংসর্গজা দোষ-গুণা ভবন্তি।

, ১ম সূত্র অনুসারে আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন সুতরাং পিতার গুণ পুত্রে বর্ত্তমান হওয়া বিচিত্র নহে এরূপ অনেকে মনে করেন। পরন্তু আভিধানিক-গণ উক্ত শ্রুতি বচনে 'আত্মা' শব্দের অর্থ—'দেহ' ই সাব্যস্ত করিয়াছেন।

যদি পিতার দোষ-গুণ পুত্রেই বর্ত্তমান হইত তাহা হইলে শিক্ষা ও সাধনার কোন প্রয়োজন হইত না। বিশেষতঃ ২য় সূত্র 'স্বকর্ম্ম ফলভাক্‌পুমান্ এই নিয়মেও বিরোধ ঘটিত। পিতার আত্মাকে যদি পুত্ররূপেই জন্মিতে হয়, তাহা হইলে কর্ম্মানুসারে কোন জীবাত্মার কোথাও গতায়াত হয় না। এদিকে শুনা যায় যে, "কর্ম্মবিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ," কর্ম্মফলে হয়ত কোন ব্রাহ্মণ যবন হইতেছেন

আবার কেহ যবন ব্রাহ্মণ হইতেছেন। তাহা না হইলে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সকলই বিফল হইয়া যায়।

তারপর ৩য় সূত্র "সংসর্গজা দোষ-গুণা ভবন্তি" এই নিয়ম দ্বারা 'ক' যতই কেন সাত্ত্বিকের পুত্র হউন না তাঁর ভাগ্যে যদি সেরূপ সঙ্গ না ঘটে, অতএই যদি তাঁহার কুসঙ্গ হয় তাহা হইলে 'ক' অসৎ না হইয়া পারেন না। আবার 'খ' যতই কেন তামসিকের সন্তান হউন না তাঁহার ভাগ্যে যদি সৎসঙ্গ ঘটিয়া যায় তাহা হইলে তাঁহার জন্মগত হীনতা নষ্ট হইতেও বাকী থাকে না। এ বিষয়ে বহু বহু দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীমৎ যবন-হরিদাসের সঙ্গ-ফলে রামচন্দ্র খাঁন প্রেরিত বেশ্যার কি হইয়াছিল তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই। ভগবান শঙ্করাচার্য্য সত্যই বলিয়াছেন 'ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।' যদি দোষ-গুণ বংশগত হইত তাহা হইলে মহর্ষি শঙ্করের বাণী ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। অস্মৎ সমাজেন চাষা সজ্জনায়তে. তথাপি কাক ন চ রাজহংসঃ' ইত্যাকার যে সকল বচন প্রচলিত আছে তাহা স্বীকার করিতে গেলে মহর্ষি শঙ্করকে ভ্রান্ত বলিতে হয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও বলিয়াছেন—

"সাধু-সঙ্গ সাধু-সঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধু-সঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দেহের কোনরূপ হীনতা বা বিকৃতি যেমন ঔষধাদি প্রয়োগে সংশোধিত হয়, হৃদয় ও মনের স্বভাবও সেইরূপ শিক্ষা, সাধনা ও সৎসর্গফলে পরিবর্ত্তিত করা যায়।

কেন কাহারও সেরূপ সঙ্গ লাভ হয় এবং কেনই বা কাহারও হীন সঙ্গ হয় এ প্রশ্ন করিলে মূলে 'বিশ্ব-প্রয়োজন' বা শ্রীভগবানের লীলাই বলিতে হয়। ফলতঃ জগতে উত্তম, মধ্যম বা কনিষ্ট হইবার পক্ষে জন্মজ জন্ম অতি অল্পই করিতে পারে। শিক্ষা, দীক্ষা, সংসর্গ প্রভৃতি সংস্কারজ জন্মই উক্ত বিষয়ে প্রবল। তাই শাস্ত্র বলেন 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে' ইত্যাদি।

আবার সাধনা যত প্রকার আছে তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা সৎসঙ্গ। অর্থাৎ সজ্জন, সৎ-গ্রন্থ, সৎ-কথা, সৎ-চিন্তা, সৎ-দৃশ্য প্রভৃতি যাহা কিছু সৎ তৎসঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

তথা-কথিত নৈতিকারগণ উদ্ভিদ্ জগতের নিয়ম মনুষ্য সমাজে প্রয়োগ করিয়া আমাদের গুণ কর্ম্মানুযায়ী চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজকে জাতি বিদ্বেষরূপ হুতবহ-জ্বালাময় শ্মশানে পরিণত করিয়াছেন।

পরমার্চ্চনীয়পাদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গুণেরই আদর করিয়া জন্ম-জনিত গর্ব্বকে বিশেষরূপে খর্ব্ব করিয়া গিয়াছেন। তাই "চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।" তাই "এ মন। কি করে বরণ কুল' ইত্যাদি পদ দেখিতে পাই।

শ্রীভগবানের করুণা সকলের উপরেই সমান ভাবে আছে। যাহাকে এখনই তুমি 'রত্না-দস্যু' বলিতে ছিলে দুইদিন পরে তুমিই তাহাকে পূজা করিতেছ। যাহাকে তুমি আমমাংস ভোজী বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলে দুইদিন পরে সে-ই তোমার ভাগ্য নিয়ন্তা। তাহাকে তুমি একবার মাত্র প্রণাম করিবার জন্য কতই ব্যগ্র ও উদ্গ্রীব।

সেই জন্যই আমাদের পরমদয়াল শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, তুমি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট—কনিষ্ঠ অধিকারী জ্ঞান করিবে, কোন কারণে বড় মনে করিবেনা। তাহা হইলে দ্বেষ হিংসা আদি কণ্টকলতা সকল সত্বরেই সমাজ কানন হইতে মূলোৎপাটিত হইবে এবং সখ্য ও প্রেমের চন্দনতরুর সদ্গন্ধে সমাজ পরিব্যাপ্ত হইবে।

লেখক মহাশয়ের মূল কথা অর্থাৎ কামিনী সাধনার যত দূর প্রতিপক্ষ তাহা তাঁহার উক্ত প্রবন্ধ সমাপ্ত হইলে, অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল। পাঠকগণ অধমের ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করিবেন। অলমিতি

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র (উকীল।)

তুমি হরি কর পার।

—:•:—

আমাবস্যার রাত্রি, তাহাতে আবার আষাঢ় মাস, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতেছে। কার্য্যান্তরে কলিকাতায় গিয়াছিলাম, সে অবস্থা দিনের বেলা, কিন্তু কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিতে একেবারে রাত্র এগারটা। এইট্রেন ধরিতে না পারিলে সারাটী রাত্র বসিয়া থাকিতে হইবে। তাই হিতাহিত জ্ঞান

শূন্য হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশনেরদিকে ছুটিয়াছি, ষ্টেশনের সীমানায় পা দিয়া মনে করিলাম এবার আর ভাবনা নাই। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইতেই শুনিলাম ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা দিতেছে, আমিতো ছুটিয়া প্লাটফরমে ঢুকিতে গেলাম ; কিন্তু একজন দ্বার রক্ষক আমাকে ধরিয়া ফেলিল ও বলিল "বাবু! মৎযানা, গাড়ি ছোড় দিয়া।" আমিতো যেন আর এজগতে নাই, হায় হায় হায়। এত করিয়া ছুটাছুটি করিয়াও গাড়ি ধরিতে পারিলাম না, এখনতো ভয়ানক বিপদ, এ অবস্থায় যাইবই বা কোথায় ? বৃষ্টি যে আবও জোরে আসিল।

পিছন্ ফিরিয়া দেখি আমার মত সমদশাগ্রস্থ আরও তিনজন, এই ঝড় জল ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া আসিয়াও গাড়ি পাইল না। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম দুইজন বাগনান ও একজন আমার সঙ্গে * * * ষ্টেশনেই যাইবে। হরি, হরি, এখন উপায়। বাগনান যাবার লোক দুটীর একজন বলিল "মহাশয়! আমাদের এই রাত্রে বাড়ী না গেলে কি যে বিপদ ঘটিবে তাহা বলিতে পারিনা, এই দেখুন আমাদের সঙ্গে বরফ ও ঔষধাদি কত কি আছে, আমার পিতাঠাকুর কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমি আমার এই ছোট ভাইকে সঙ্গে করিয়া এই সমস্ত দ্রব্য সমভিব্যাহারে যাইতেছি।" তাহাদের কথা শুনিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল কিন্তু আমি আর কি করিব, একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়া কেবল বলিলাম "ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, বৃথা আকুপাকু করিয়া আর কি করিবেন।" এমন সময় দেখি আমার পূর্ব্ব পরিচিত বিনোদ বাবু ষ্টেশনের মধ্যেই পাচারি করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণে যেন একটু বল পাইলাম। কিন্তু খুব ছুটাছুটি করিয়া এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, উঠিয়া গিয়া তাঁহার নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সেই খানেই বসিয়া "দয়াময়" "করুণাময়" "দীনবন্ধু" প্রভৃতি দু'একটী শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক আলস্য ত্যাগ ও ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। হটাৎ দেখি আমার বন্ধুবর নারায়ণ বাবু ষ্টেশনের ভিতর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তা দিয়া তাঁহার স্বভাব-মধুর কোকিল বিনিন্দিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন ;—

* * * আহা তাই যদি নাহি হবে গো,—

পাতকি তারণ তরিতে তাপিত আতুরো তুলেনা লবে গো,

হ'য়ে পথের ধুলায় অন্ধ আমি দেখিব কি বৈয়াবন্ধ

তবে পারে ব'সে পার কর ব'লে পাপী কেন ডাকে দীনশরণে ॥"

আমিতো তাঁর খুবই কাছে ছিলাম কিন্তু তিনি আমার দিকে ফিরেও দেখ্‌লেন না, আমি একবার দু'বার তিনবার ডাক্‌লাম কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া আর কিছু বলিলাম না। এমন ভাবে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল।

এখন আমার সঙ্গের লোকটা অর্থাৎ যে লোকটা আমার সহিত * * ষ্টেশনে যাইবে সেই অপরিচিত ব্যক্তি আমার সমস্ত খুটিয়া খুটিয়া পরিচয় লইতে লাগিলেন। আমি আর কি করিব, শুধু মুখে ব'সে থাকা ভাল লাগেনা কাজেই তার কথায় উত্তর দিতে লাগিলাম, হটাৎ পিছনদিক হইতে কার কথা কাণে আসিল "তোমরা হ'লে মস্ত কবি, তোমাদের কি চুপ ক'রে ব'সে থাকা সাজে?" আমি চেয়ে দেখি, আমার বাল্য বন্ধু ক্ষিরোদচন্দ্র, বহুদিন পরে তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া "এস ভাই, এস" বলিয়া তাহার সংবাদ লইতে ব্যস্ত, এমন সময় সে বলিল ভাই ওসব খবর পরে হবে, তুমি নাকি আজকাল খুব ভাল কবিতা লেখক হ'য়েছ, তাই এই সময় একটু কবিত্ব শক্তি দেখাও দেখি। আমি ট্রেনফেল হ'য়ে বড়ই দুঃখিত হ'য়ে ঘরে ফিরতেছি। আমি দেখলাম সবই এক দশা প্রাপ্ত। ক্ষিরোদচন্দ্র কিভাবে বলিয়াছে জানি না, আমি তাহার কথা শুনিয়া বলিলাম ভাই! কবিতা লিখিবার শক্তি আমার নাই, তবে যে দু'একটা গান বা পদ্য লিখি সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় সে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। যখন প্রাণে একটা আঘাত বা আনন্দের তরঙ্গ উঠে তখন যেন বাহিরের সব ভুলিয়া যাই, অমুনি ভিতর থেকে কে যেন ঠেলে ঠেলে কথা বের ক'রে দেয়, আমি কেবল সেগুলি সাজিয়ে রাখি মাত্র। আচ্ছা, তোমার ইচ্ছে হ'য়েছে দেখি, করুণাময়ের কি ইচ্ছা।—

ক্ষিরোদচন্দ্রকে এই কথা ব'লে পকেট হইতে নোটবুক খানি ও পেন্‌সিলটী লইয়া প্রথমেই লিখিলাম। "তুমি হরি কর পার" সত্যি সত্যি বল্‌তে কি, তার পরই যেন কেমন তন্ময় হ'য়ে গিয়ে নিচের কথা কয়টী লিখেছিলাম, সে আজ প্রায় ১৮ মাস পূর্ব্বের কথা, কিন্তু যখন আজ হটাৎ পকেট বইখানির সেই লেখাটির দিকে নজর পরিল তখন যেন সে চিত্রটী আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল, তাই কবিতাটী প্রকাশের পূর্ব্বে এতটুকু বাচালতা প্রকাশ করিয়া পাঠক

পদের অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করিলাম, আশা করি ক্ষমা করিবেন।—যে পদটী লিখিয়াছিলাম তাহা এই—

যাও মোরে সঙ্গে ল'য়ে ওহে ও পায়ের সাথি।
একেইতো' একা আমি তাহে ঘোর অমারাতি॥
অসীম জলধি রাশী তাহে নাহি দেখি কুল।
হারাব অকালে প্রাণ হ'লে তুমি প্রতিকুল॥
বিশাল তরঙ্গ রঙ্গে গ্রাসিছে আসিয়া মোরে।
চ'লেছি ভাসিয়া হরি অনুকূলে আন ধ'রে॥
তুমি যদি ত্যজ মোরে গতি কিবা আছে আর।
অকুল এ সিন্ধু যদি তুমি হরি কর্ণধার॥
তরিব কেমনে প্রভো। জানিনা সাঁতার।
অপার এ ভবসিন্ধু তুমি হরি কর পার॥

এইভাবে লিখিয়া ক্ষিরোদচন্দ্রকে দেখাইতেছি এমন সময় একখানি গাড়ী প্লাটফরমে প্রবেশ করিল, অনুসন্ধানে জানিলাম এগারটার গাড়ী খানি আজ দেড় ঘণ্টা দেরিতে ছাড়িবে যে খানির জন্য আমরা ছুটিয়া আসিয়াছিলাম সেখানি এগারট এর নয়। হরিবোল হরি, একি? আমি আর কোন কথা কাহাকেও বলিতে পারিলামনা। কেবল ক্ষিরোদের নিকট বিদায় লইয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিলাম আর মনে মনে বলিতে লাগিলাম, "অপার এ ভবসিন্ধু তুমি হরি কর পার।"

কলিযুগে প্রভুর কৃপা।

—:০:—

হিন্দুর বেদ পুরাণে কলিযুগ অতি নিন্দিত। ধর্ম্মদেব এই যুগে মাত্র এক পদে দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু বৈষ্ণব মহাজনগণ এই কলিযুগকে সর্ব্বযুগসার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে যথাক্রমে জ্ঞানযোগে কর্ম্মযোগে বা সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ সেবায় যাহা লভ্য হইয়াছে কলিযুগে কেবল মাত্র শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সেই তিন যুগের সাধনের পূর্ণফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহন্নারদীয়পুরাণ প্রভৃতি তাহা স্পষ্টই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥ ভা ১২।৩।৫২
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥ বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

এই কলিযুগেই স্বয়ং ভগবান্ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত সঙ্গে মিলিত হইয়া ভক্তগুণ মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য এই সঙ্কীর্ত্তন মহাযজ্ঞের অবতারণা করিয়াছেন। জপ, তপ, ব্রত, উপবাস, দান, ধ্যানাদি যাহা এতদিন প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম সাধন বলিয়া বিঘোষিত ছিল কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নাম যজ্ঞ প্রচার আরম্ভ করায় পূর্ব্ব সাধন সমুদয় নিষ্প্রভ হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ নিমাই পণ্ডিত সাজিয়া নিখিল শাস্ত্র সমুদ্র মন্থনান্তে বৃহন্নারদীয় পুরাণের সিদ্ধান্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়া তারস্বরে প্রচার করিলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিযুগে এই নামযজ্ঞ ভিন্ন অন্য সাধন নাই—নাই—নাই। সঙ্গে সঙ্গে দামামা নির্ঘোষে প্রচারিত হইল এতদিন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে চারি পুরুষার্থ নামে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্র যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। ঐ সমস্ত শাস্ত্র বর্ণিত পুরুষার্থগুলিও পুরুষার্থ বাচ্য নহে; ঐ গুলিও কৈতব, ঐ গুলিও অজ্ঞানতা। বিশেষতঃ বেদান্ত প্রতিপাদিত নির্ব্বাণ মুক্তি একেবারেই অগ্রাহ্য, উহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান কৈতব।

"অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যার গন্ধে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ চৈঃ চঃ

জীবের একমাত্র পুরুষার্থ হইল প্রেম। আর জীবমাত্রেরই তাহা প্রয়োজন।

'সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥"

কেবল মাত্র ভক্তিযোগ দ্বারা তাহা লভ্য হয়। এই প্রেমের মহিমাও অনির্ব্বচনীয়, ইহাতে অসাধ্য সাধিত হয়। সর্ব্বেশ্বর অখিল-ভুবনপতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই বিশুদ্ধ প্রেম-বন্ধনে বাঁধা পড়েন। প্রেম-পিপাসু ভগবান্ ভক্তের

প্রেমে বশীভূত হইয়া পড়েন, শ্রীভাগবত শাস্ত্রই ইহার প্রমাণ। ব্রজগোপগোপী-গণই ইহার আদর্শ শ্রীবৃন্দাবনই সেই প্রেমের নিত্যধাম, আর 'রসো বৈসঃ' স্বয়ং ভগবান্ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীনন্দদুলালই সেই প্রেমধামের নায়ক, সেই প্রেমময় ভগবানই আমাদের একমাত্র আরাধ্য।

জ্ঞান কর্ম্মাদি বিভিন্ন সাধনেও ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু বৈষ্ণবেরা সেরূপ ভগবৎ প্রাপ্তিতে রাজি নহেন তাঁহারা অনুভূতি জনিত আনন্দে বা দর্শন জনিত সুখে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা নিজের বশে আনিতে চাহেন। নিজের প্রেমাধীন করিতে হইলে নদীয়া-বিহারী প্রাণ গৌরাঙ্গ সুন্দর নিজ জীবনে ও ভক্তগণের জীবনে সেই ব্রজপ্রেম আচরণ করিয়া অবাঙ্ মানস গোচর ভগবানকে বাঁধিবার কৌশলটী শিখাইয়াছেন—

কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞানযোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণবশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ চৈঃ চঃ

আবার শাস্ত্রান্তরে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে,

"আরাধ্য কৃষ্ণ ব্রজেশ তনয় তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রুচিৎ রম্যা উপাসনা যা বজবধূবর্গেন কল্পিত॥
ভাগবতম্ প্রমাণমমলং প্রেমা পুমার্থমহান্।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোমতমিদং তত্রাদর নাপর॥"

যে ভক্তি সাধন দ্বারা এই অতি দুষ্প্রাপ্য কৃষ্ণপ্রেম মহাধন লভ্য হয় তাহার নাম হইল সাধন ভক্তি। তাহা আবার দুই জাতীয়, এক বৈধী ভক্তি অর্থাৎ শাস্ত্র বিধিই তাহার প্রবর্ত্তক ও পরিচালক। আর অন্যটী হইতেছে রাগভক্তি, শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক রাগ অর্থাৎ প্রগাঢ় তৃষ্ণা; যাহা ব্রজবাসিদের নিজ সম্পত্তি তাহাই যাহার প্রবর্ত্তক এবং সেই ব্রজবাসিকে আদর্শ করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া যে ভজন তাহাই হইল যাহার পরিচালক তাহার নাম রাগানুগাভক্তি। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত, আচরিত ও নির্দ্দিষ্ট পন্থা এবং কেবলমাত্র

এই পন্থা অবলম্বনে মাধুর্য্য বিমণ্ডিত নরলীলার অনুরূপ শ্রীকৃষ্ণ, গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর শ্রীনন্দদুলালকে সহজে এবং সম্যক্‌ প্রকারে পাওয়া যায়।

কর্ম্ম জপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি তপধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥

কিন্তু এই ভজন করিতে হইলে যে ব্রজজনের অনুগত হওয়া চাই, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও আচরণ।

শ্রীসম্প্রদায়ের অধিনায়ক যিনি অদ্যাপি ঐ সম্প্রদায়ীর মধ্যে "মহাপ্রভু" বলিয়া পূজিত হইতেছেন এই মহাপণ্ডিত বল্লভভট্টের বিশেষ আগ্রহে শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগ হইতে তাঁহার বাটী আড়েল গ্রামে আসিয়াছেন। শ্রীযমুনার শ্যামল চিক্কণ জল দেখিয়া কৃষ্ণ প্রেমে থর থর কাঁপিতেছেন, পরম অন্তরঙ্গ রসিক ভক্ত শ্রীরূপকে পাইয়া প্রেমাবেশ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণান্তে কৃষ্ণ সঙ্গম লালসে কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীমতীর ভাবে অনুভাবিত হইয়া শুইয়া আছেন; বল্লভ ভট্ট সেবাপরা সখির ন্যায় পাদ সম্বাহন করিতেছেন, এমন সময়ে আর একটী অন্তরঙ্গ ভক্ত আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। ভাবাবেশে প্রভু "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "অধুনা কৃষ্ণের সংবাদ কি? বিস্মিত বজনস পণ্ডিত সুরসিক ভক্ত সুরে সুর মিলাইয়া বলিলেন" প্রভো, কৃষ্ণের সংবাদ আর কি বলিব? আর সে নিগূঢ় রহস্যের কথা বলিবইবা কাহাকে। কেইবা শুনিলে তাহা বিশ্বাস করিবে? সম্প্রতি যাহা দেখিয়া আসিলাম তাহা পরমাদ্ভুত। দেখিলাম মহাযোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ যাঁহাকে কোটি সংবৎসর ধ্যান করিয়া পাইতেছেনা সেই দেবাদির দুর্ল্লভ, অখিল ভূতাশ্রয় কূটস্থ পরব্রহ্ম শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযমুনা তটকুঞ্জে কাচিৎ ব্রজগোপীর প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া সেই ব্রজগোপীর কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছেন। ত্রিহুতিয়া মহাপণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায়ের মুখে এই কথা শুনিয়া প্রভুর পূর্ব্বভাব সমুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রভু একেবারে আলুলাইয়া পড়িলেন। ভক্ত বসু বুঝি তখন ছদ্মবেশী ঠাকুরকে ধরিয়া ফেলিল।

"মনুষ্য নহে ইহোঁ কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার।"

রঘুপতি পুনরপি কহিলেন "প্রভো এতদিনে আসল কথা বুঝিয়াছি, বৃথাই শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া জীবন নষ্ট করিয়াছি, যাঁহারা ভবভয়ে ভীত, তাঁহারা কেহ কেহ শ্রুতির আশ্রয় লইতেছেন, কেহ কেহ বা স্মৃতির অনুবর্ত্তী হইতেছেন, আর কেহ কেহ বা ভারত পুরাণাদির শরণ লইতেছেন, সে সব ধাঁধা মিটিয়া গিয়াছে ভগবানকে ধরিতে যদি শরণ লইতে হয় তবে ভক্তেরই শরণ লইব, যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া যাঁহার অলিন্দে সেই নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য কূটস্থ ভগবান্ সাক্ষাৎ পুত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন আজ হইতে সেই নন্দ মহারাজের ভজনা করিব। তাঁহার কৃপা হইলে সেই লীলাবিহারীকে পাইতে বেশীক্ষণ বিলম্ব হইবে না। ইহাই হইল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মত "আনুগত্য ভজন।" কিন্তু এই রাগানুগার ভজন জোর করিয়া ধরিবার বস্তু নহে। পুষ্ট না হইতেই কচি আম জোর করিয়া জাগদিয়া পাকাইলে যেমন তাহা পাকেনা, পচিয়া যায়। বৈধীভক্তি অনুশীলনে প্রীতিযুক্ত ব্রজভাব না আসিতেই ব্রজগোপী সাজিলে কেবল ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবে। সে রাজ্যে ফাঁকি যে আদৌ চলেনা। তাই, সাধু গুরু মহাজনের উপদেশ মতে সর্ব্ব প্রথমে সাধককে বৈধীভক্তি অনুশীলন করিতে হয় পরে উহাই ক্রমে পাকিয়া রাগ ভক্তিতে পরিণত হইবে। চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের মধ্যে নিম্নকথিত পাঁচটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥

অর্থাৎ তদীয় (সেবন)—তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥

কুলীন গ্রামী বসু রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসিলেন "গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধন?"

প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥

কলিহত জীবের উদ্ধার জন্য প্রভু বেজায় ঠেকিয়াছেন। তাই ক্রমে সাধনের সুলভ হইতে সুলভতর সংস্করণ বাহির করিতেছেন কিন্তু মায়াকিঙ্কর তবুও কৃষ্ণোন্মুখী হইতেছেনা। তাই মনের ক্ষোভে প্রাণের ভাই নিতাই চাঁদের করে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া, জোর করিয়া কর্ণে কৃষ্ণনাম

জানাইবার যুক্তি করিতেছেন, বৈষ্ণব কবির ভাষায় সেকথা পাঠকগণ আস্বাদন করুন—

"বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন্ ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
নাম প্রেম বিতরিতে অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে
অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব
তুমি মোর প্রধান সহায়॥
নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড়-মণ্ডল ভার করিতে নাম প্রচার
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি॥
মো হৈতে না হবে যাহা তুমিতো পারিবে তাহা
প্রেমদাতা পরম দয়াল।
বলরাম কহে পঁহু দোঁহার সমান দুঁহু
তার মোরে আমিত কাঙ্গাল॥

সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত-কেশরী বেদান্তাচার্য্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম একদিন প্রশ্ন করিলেন—

ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ চৈ: চ:

এইখানে প্রেমদাতা পতিত পাবন নিতাই চাঁদের কৃপায় সঙ্কীর্ত্তন প্রেম বন্যায় জগৎ ভাসিতেছে জানিয়া নীলাসংবরণ সময়ে প্রভু স্বরূপ রামরায়ের গলা ধরিয়া বলিতেছেন—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥

সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

নাম সঙ্কীর্ত্তনের গুণ গাহিতে গাহিতে বলিলেন, জীবের চিত্ত স্বভাবতই দর্পনের ন্যায় অতি মসৃণ ও স্বচ্ছ ছিল, মায়ার হাতে পড়িয়া কর্ম্মদোষে জীবের সেই দর্পণ-তুল্য চিত্ত কলঙ্কিত ও কর্কশ হইয়াছে। ত্রিতাপ জ্বালায় জীব দগ্ধ হইতেছে অবিদ্যাই বিদ্যা হইয়াছে এই কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন জীবের কর্কশ কলঙ্কিত-চিত্ত পরিমার্জ্জিত করে, ভব তাপ প্রশমিত করে, প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়, এবং কৃষ্ণভক্তি বিদ্যাকে সঞ্জীবিত করে। নামের সঙ্গে প্রেমের প্রকাশ হইয়া জীবকে আনন্দের পাথারে ডুবাইতে থাকে এবং পদে পদে নামামৃত আস্বাদনে জীবত্ব ও অমর হইয়া যায়। মোটের উপর জীবের দেহ মন বুদ্ধি সমস্তই প্রেমরসে আপ্লুত হইয়া যায়। জীব হাতে হাতেই অনন্তবাদির দুর্লভ প্রেমধনে ধনী হইয়া প্রেমময়কে লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্ ॥
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্ ॥

ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

——:০:——

বঙ্গের আদি কবি, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অমৃতোপমলীলা-লেখক কবিবর শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জীবনী লেখা মাদৃশ অজ্ঞের অসাধ্য, তবু যে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সে কেবল আত্ম শোধনার্থে। শুনিয়াছি মহতের জীবনী আলোচনায় হৃদয়ের দুর্ব্বাসনা দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়; তাই আমার এ দুঃসাহস। সহৃদয় পাঠকগণ! আমার লেখনী মুখে আপনাদের মনোব্যাথা উৎপাদন না হয় এই কৃপা করিয়া কৃতার্থ করুন।

যখন মুসলমান ভূপতিবৃন্দের শাসনে বঙ্গদেশ শাসিত হইতে ছিল তখন যে দেশের অবস্থা বিশেষতঃ হিন্দুগণের অবস্থা খুব ভাল ছিল তাহা বলা যায় না, কেননা উক্ত ভূপতিগণ ও তাঁহাদের পরিচারকগণের অত্যাচারে তাৎকালিক গ্রন্থকারগণের জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হইবার উপায় এক্ষণে একমাত্র জনশ্রুতি ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর জীবনী লেখাতে বঙ্গদেশীয় ব্যক্তির তত অনুরাগও পূর্ব্বে পরিলক্ষিত হইত না। কবিগণের রচিত নিজগ্রন্থে তাঁহারা আত্ম-পরিচয় রূপে যাহা দিতেন তাহা এবং তাঁহাদিগের বংশাবলীর বর্ত্তমান ব্যক্তি-গণের বাচনিক বিবরণ ও দেশীয় জনশ্রুতি অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ সকল মহাপুরুষ গণের জীবনী আলোচনা করিয়া কথঞ্চিত মনের আক্ষেপ নিবারণ ব্যতিত আর অন্য কোন উপায় বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশ কবির আকর, একটু অনুসন্ধান করিলে কত কত মহানুভব কবির সন্ধান আমরা পাইতে পারি। বাল্যকাল হইতেই আমরা সুমধুর কবিতা পাঠ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। যাহারা আপন আপন হস্ত নির্দ্দেশ বিষয়েও অক্ষম এমন শিশুর নিকটও কবিতা সমধিক আদরনীয়। "মেয়েলী বারব্রত" যাহার প্রচার এদেশে অত্যন্ত বেশী তাহার মন্ত্রাদিও পদ্যে রচিত। অধিক কি এদেশের অঙ্ক শাস্ত্রও পদ্যে রচিত হইয়া বালক বালিকা গণের সমধিক উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছে। বিখ্যাত গণিত শাস্ত্রবিদ্ ৺শুভঙ্কর দাসের "আর্য্যা" ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাঙ্গালা ভাষার আদি মৌলিক মহাকাব্য শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থও পদ্যে রচিত, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পদ্যই বাঙ্গালা ভাষার মূল, বিশেষরূপে আলোচনা করিলে ইহাও বেশ প্রমাণ হয় যে, কবিতা ও কবিতার পরমাণু লইয়াই বঙ্গভাষা প্রথম গঠিত হয়। গদ্য রচনাতেও যে কবিত্ব নাই তাহা বলা যায়না তবে পদ্যের যেরূপ চিত্তাকর্ষনী শক্তি আছে গদ্যে সেরূপ শক্তির অভাব দেখা যায়। বিশেষতঃ কোমল হৃদয় বঙ্গীয় জনসমাজে কবিতার সমধিক আদর বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

মধুরতা যাহাতে আছে তাহাতেই আনন্দ, যেমন কোকিল কুজন, ভ্রমরগুঞ্জন স্বভাবতই মধুর ও শ্রবণ সুখকর সেইরূপ স্বভাব-কবির কাব্যও শ্রোতা এবং পাঠকের কর্ণ তৃপ্তিকর ও অন্তরানন্দ জনক। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয়

এই যে, এই সকল হৃৎকর্ণ-রসায়নকারী কাব্য রচয়িতা প্রাচীন স-াব-কবিগণের বিষয় জানিতে হইলে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। কোথায় তাঁহাদের জন্মস্থান, তাঁহাদের জনক জননী কে, কিভাবে কোন কার্য্য করিয়া তাঁহারা উন্নত হইয়াছেন, কি প্রকারেই বা এই কবিত্ব শক্তিলাভ করিয়া জনসমাজে এত আদরণীয় হইয়াছেন ইত্যাদি বিষয় বহু কষ্টেও সম্যক অবগত হওয়া যায় না। অবশ্য অনেকে ঐ সকল মহাত্মাগণের জীবন বৃত্তান্ত জনসাধারণে প্রচার করিবার মানসে কঠোর অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতেও সম্যক কৃতকার্য্য হইতে দেখা যায় না।

আজ সহৃদয় পাঠকগণের নিকট আমরা যে মহাকবির জীবনী আলোচনায় জন্য দণ্ডায়মান, সেই বঙ্গীয় সাহিত্য কাননের-কলকণ্ঠ-কোকিলের সম্বন্ধেও অনেকে অনেক প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন, আমরা নিজ মনগড়া কোন কথা না বলিয়া সেই সকল মত প্রচারকারীগণের সুরে সুর মিলাইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আর যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মত প্রচারকারীগণের মতের অসামঞ্জস্যতা প্রমাণেও চেষ্টা করিব। তবে আমাদের মতকেই অভ্রান্ত বলিয়া অবিচারে গ্রহণ করিতে কাহাকেও অনুরোধ করিব না, আলোচনা দ্বারা যেটা খাঁটি বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহাই গ্রহণ করিবেন। এবং আমাদিগের ভুল, ভ্রান্তি আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন পাঠকগণের নিকট সবিনয় এই টুকুই আমাদের নিবেদন।

প্রেমের অমিয়-মন্দাকিনী শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত মহাগ্রন্থ রচয়িতা কবিবর শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা-ভাষার আদি কবি, সেই আদি কবি—সেই বঙ্গীয়-সাহিত্যাকাশের সমুজ্জ্বল-নক্ষত্রের পবিত্র জীবন-কাহিনী যতটুকু অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি তাহা যথাক্রমে নিম্নেব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে বাঙ্গালা ভাষার আদি কবিবলায় যাঁহারা আমার উপর রাগ করিতেছেন তাঁহাদিগকে দু'একটী কথা না বলিয়া পারিলাম না।

সত্য বটে, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস মালাধর বসু, রায়রামানন্দ এবং কাহারও কাহারও মতে ভাষা-রামায়ণ প্রণেতা কৃত্তিবাস পণ্ডিত বৃন্দাবনদাসের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ ও গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন আর শ্রীমম্মহাপ্রভুও চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি

রায় রামানন্দের গ্রন্থাদি শ্রবণে পরম আনন্দানুভব করিতেন। শ্রীচরিতামৃতকার বলিতেছেন ;—

"চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দসনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু উপরোক্ত কবিগণের ও মালাধর বসুর গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইঁহারা যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন সে কথা কে বলিবে? আর এককথা—চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দ এবং মালাধর বসু কবিতা লেখক, আর তাঁহাদের ভাষাও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা নহে "ব্রজবুলি মিশ্রিত"। তারপর মালাধর বসুকে অনুবাদ শাখার আদি কবি বলা যাইতে পারে। কেননা তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিজ গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস পণ্ডিত ও অনুবাদ শাখার দ্বিতীয় কবি। তিনিও সংস্কৃত রামায়ণ হইতে ঘটনাবলী ও ভাব সংগ্রহ করিয়া ভাষা রামায়ণ রচনা করেন, তবে একথা সহস্রবার স্বীকার্য্য যে, অনুবাদ হইলেও তাঁহার রামায়ণের প্রতি পত্রে, এমন কি প্রতি ছত্রে ছত্রেই কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অসাধারণ প্রতিভা ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয় যে, শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুরই সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় মৌলিক মহাকাব্য রচনা করেন।

অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, বৃন্দাবনদাসের সময় অর্থাৎ তাঁহার মহাকাব্য রচনার পূর্ব্বে বঙ্গভাষা অলঙ্কার হীনা মলিনা বালিকা ছিলেন, এই বাঙ্গালা ভাষার মাতামহী সদৃশা প্রাকৃত ভাষার পার্শ্বে ইঁহাকে মলিনা অবস্থাতেই পরিদৃষ্ট হইত। তারপর আবার মহাপরাক্রমশালী তাৎকালীক যবন ভাষার অধীনে মস্তক অবনত করিয়াই থাকিতে হইত। এমন কি পারসী ভাষার পরাক্রমে তখন সংস্কৃতকেও মৃতপ্রায় পরিলক্ষিত হইত। তখন রাজা মুসলমান আর রাজভাষা না শিক্ষা করিলে রাজ কার্য্যেও নিযুক্ত হওয়া যাইত না। সুতরাং রাজভাষা পারসী তখন সকলের নিকটই আদরণীয় ছিল।

যে সময় দীনা বঙ্গ ভাষায় এই অবস্থা—যে সময় বঙ্গভ যা পাঠশালার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অন্তরে অলক্ষ্যভাবে গঠিত হইয়া বিরাজিত ছিল সেই সময় আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিজ কুটীরে বসিয়া ধর্ম্ম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষায় উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। যদি সত্যকথা বলিতে হয় তবে এই বলিব যে, বৃন্দাবনদাসই বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি কর্ত্তা। যতদূর আলোচনা করা গিয়াছে তাহাতে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমরা বাঙ্গলা ভাষায় আদি কবির আসনে বসাইতে পারি না। এ সম্বন্ধে এক সময় দার্শনিক লেখক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর "বান্ধবে" যাহা লিখিয়াছিলেন পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ঐতিহাসিকেরা যে কালকেই কেন বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও আবির্ভাব-কাল বলিয়া অবধারণ না করুন, ইহা নিঃসংশয় কথা যে, শ্রীগৌরাঙ্গের সময় হইতেই বঙ্গে উহার সমধিক প্রভাব। বঙ্গের সে অতি পুরাতন অনার্য্য ভাষা লোপ পাইল এবং সংস্কৃত মিশ্রবাঙ্গালা সংস্কৃত-সম্পদে সমৃদ্ধা ও শোভান্বিতা হইয়া, চারিদিকে প্রচারিত হইতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তখন বাঙ্গালার গদ্য ফুটিল না, ফুটিল গীত।

যখন ভাগীরথী-তটে প্রেম-ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের ভাবের উচ্ছ্বাসে, কীর্ত্তনের নূতন উৎসবে, নব-জলধর গম্ভীর মধুর মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল যোগে বাজিয়া উঠিল, তখন বঙ্গদেশে একসঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠে সঙ্গীতময়ী বাঙ্গালা ভাষা ধ্বনিত হইল। যেমন নব বসন্ত-সমাগমে, নিকুঞ্জে কিম্বা বনে ও উপবনে এক সঙ্গে অসংখ্য কোকিল-কণ্ঠ শব্দরিত হয়, গৌরচন্দ্রের প্রেম-বসন্ত-সমাগমে সেইরূপ সহস্র ভক্তকবির কোমলকণ্ঠে অতি বড় ললিত, অধিকতর মধুর, অতিমাত্র ভাব-রস-পীযূষ সিক্ত গীত-পদাবলীতে কুহরিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন যাহার গায়ে শ্রীগৌর-সুন্দরের বাতাস লাগিল সে-ই আনন্দে মাতিয়া ভাবে, উথলিয়া নাচিয়া নাচিয়া গীত গাইল। যে আর কিছু না পারিল, সে-ও অন্ততঃ দুই চারিটি নূতন গীতে আপনার প্রাণের কথা গাঁথিয়া প্রাণ জুড়াইল এবং তৃষিত প্রাণে গীতি-সুধা পান করিয়া, ভাবের সেই এক অনির্ব্বচনীয় আবেশে নয়ন-জলে ভাসিল। এই যে বাঙ্গলায় গীতের প্রবল স্রোত ঢেউ খেলাইয়া প্রবাহিত হইল, আর উহা থামিল না।

আমরা প্রবন্ধের মূল বিষয় বলিতে যাইয়া অন্যান্য অনেক কথার সূচনা করিয়াছি, এইবারে আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা প্রকাশে যত্ন করিব।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় সহচর শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীহট্টপ্রদেশেই জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাতীরে বাস ও বিদ্যাধ্যয়ন মানসে শ্রীহট্ট হইতে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতের সহিত শ্রীধামনবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। কিছুদিন পরে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি নামক তাঁহার অন্য দুই ভ্রাতাও নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীবাসের সহিত মিলিত হয়েন। কেবল তাঁহার এক সহোদর শ্রীহট্টেই থাকেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠেই আমরা এইটী অবগত হই।

আলোচ্য মহাপুরুষের জননী নারায়ণী দেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের সহোদর কন্যা, কিন্তু নিতান্ত বালিকা অবস্থা হইতেই তিনি শ্রীবাসের তত্ত্বাবধানে নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে নারায়ণী স্বীয় মাতুলালয় কুমারহট্টে গমন করিলে তথায় ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে মহানুভব শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। এইরূপ কিম্বদন্তি আছে যে, বৃন্দাবন ঠাকুর ১৮ মাস মাতৃ গর্ভে থাকিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত যে অতি শয় রহস্যময় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বহুদর্শি পণ্ডিতগণের দু'একটী মত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপধ্যায় ৺মদনগোপাল গোস্বামী প্রভুর মতে "শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজার নৈবেদ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভোজন করিয়া সেই ভোজনাবশেষ নারায়ণীকে প্রদান করিলে, সেই প্রসাদ ভোজনে-দ্বারাই বিধবা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন ঠাকুরের জন্ম হয়।"

বর্ত্তমান বৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় অনুমান করেন;—নারায়ণী গর্ভাবস্থায় বিধবা হ'য়েন এবং সেই গর্ভেই ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল।

আমাদের দেশে কিন্তু প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চর্ব্বিতাবশেষ তাম্বুল ভক্ষণেই বিধবা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হয়।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নবদ্বীপধামে আবির্ভাব ১৪০৭ শকে, আর আনুমানিক ১৪২৪ কিম্বা ১৪২৫ শকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বাসস্থান শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই সময় নিত্যানন্দ প্রভুর অবধুত সন্ন্যাসী বেশ দর্শন করিয়া নবদ্বীপবাসীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলে ঐ সঙ্গে শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বিধবা নারায়ণীও ছিলেন, তাঁহার বয়স তখন মাত্র চারি বৎসর। নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে তিনি নারায়ণীকে লক্ষ্য করিয়া "পুত্রবতী হও" বলিয়া বর প্রদান করেন, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিধবা নারায়ণীর প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্রবর প্রদান শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "প্রভো। বিধাতার বিধানে নারায়ণী বাল-বিধবা, আপনি সর্ব্বজ্ঞ প্রভু হইয়াও বিধবাকে পুত্রবর প্রদান করিলেন কেন? তদুত্তরে নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, "আমার আশীর্ব্বাদ কখনই নিস্ফল হইবেনা, মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল ভক্ষণে নারায়ণী গর্ভবতী হইবে এবং সেই গর্ভেই স্বয়ং ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করিবেন, এই অসম্ভব ব্যাপারে কেহই কোন রূপ দোষ দিতে পারিবেনা।" নিত্যানন্দ প্রভুর কথা মত কিছুদিন পরে নারায়ণীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ হইল এবং সেই গর্ভেই আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যখন মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ প্রদান করেন তখন নারায়ণীর বয়ঃক্রম মাত্র চারি বৎসর, এবং মহাপ্রভুর বয়স অষ্টাদশবর্ষ, এই চারি বৎসর বয়সে নারায়ণী বিধবা হইল কি প্রকারে, চারি বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়াইতো অসম্ভব, কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়টী অনুধাবন করিলে এ বিষয় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়না। বিষটী আমরা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়নাটকে এই ভাবে দেখিতে পাই —

শ্রীবাস পণ্ডিত ছাব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেব-দ্বিজে বিশ্বাসহীন ছিলেন, তাঁহার মন বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানে পূর্ণ ছিল। এবং সঙ্গিগণ সঙ্গে সর্ব্বদাই গ্রাম্য চর্চ্চা প্রভৃতিতে রত থাকিতেন। যখন শ্রীবাসপণ্ডিত এইভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন সেই সময় অধমতারণ, কলিকলুষহারি করুণাময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব একদিন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে, "শ্রীবাস! আর কেন বৃথা কালক্ষেপ করিতেছ, তোমার পরমায়ু যে মাত্র আর এক বৎসর আছে যদি মঙ্গল চাও তবে এই সময় কিছু অন্তিমের কাজ করিয়া লও।" আশ্চর্য্য এই যে,

স্বপ্ন ভঙ্গের পর শ্রীবাস আর সে শ্রীবাস নাই, একেবারে যেন নূতন মানুষ হইয়াছে. তাহার চিত্ত বৃত্তি আর অন্য কিছুতে যায় না, এমন দুর্লভ জীবন বৃথা নষ্ট করিয়াছি এই পরিতাপ-পূর্ণ হৃদয়ে শাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নারদ পুরাণে লিখিত—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা।" এই শ্লোকটী পাইলেন।

কি জানি কোন বৈদ্যুতিক শক্তি এই শ্লোকের ভিতর দিয়া শ্রীবাসের প্রাণে প্রাণে আঘাত করিতে লাগিল, তাহার আর কিছুই ভাল লাগেনা. কি যেন একটা অভাবনীয় চিন্তা আসিয়া শ্রীবাসের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। সেই দিন হইতে শ্রীবাস আর কোনরূপে স্থির হইতে না পারিয়া দিবানিশি হরিনাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর গত হইলে একদিন শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে হটাৎ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন সকলে দেখিল তাঁহার দেহে প্রাণ নাই, কিন্তু ইচ্ছাময়ের কি যে ইচ্ছা তাহা তিনিই জানেন, কিছু সময় পরে তাহার সেই স্পন্দহীন দেহে সংজ্ঞা আসিলে তখন তাহার ভাব দেখিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন যে, শ্রীবাসের দেহে নারদ শক্তি প্রবেশ করিয়াছে। এই শ্রীবাসই শেষে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আচার্য্যত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥"

শ্রীবাস পণ্ডিত সংসারে স্বর্গ ও নরক, সৎ ও অসৎ দুইটী পথই দেখিয়াছেন সুতরাং পুনরায় যাহাতে তাঁহাকে আর অসৎ পথে—নরকের পথে—অবস্থের পথে পদার্পণ না করিতে হয় তাহার জন্য সর্ব্বদাই তিনি চেষ্টা করিতেন। পাছে ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীর স্নেহে আবার সংসারের চিন্তা আসিয়া তাহাকে গৌরাঙ্গ-দেবের কৃপামৃত পানে বঞ্চিত করে ইহা ভাবিয়াই শ্রীবাস পণ্ডিত অতি অল্প বয়সে নারায়ণীকে বিবাহ দেন। তবে কোন গ্রামে, কাহার সহিত কোন তারিখে নারায়ণীর বিবাহ হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না আর অনুমান দ্বারা তাহা স্থির করাও কঠিন।

ক্রমশঃ—

WRITERS' BUI

ভক্তি ১৭শ বর্ষ, ১১শ, ১২শ, সংখ্যা, আষাঢ়, শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল।

কলিযুগের প্রাধান্য।

সারগ্রাহী গুণজ্ঞ প্রাচীন ঋষিগণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগ-চতুষ্টয়ের মধ্যে শেষোক্ত একপাদ ধর্ম্মবিশিষ্ট কলিযুগেরই বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। পঞ্চমবেদ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে করভাজনের উক্তিতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই।

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥" ভাঃ ১১।৫।৩৬।

অর্থাৎ—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বহু আয়াস-লভ্য সাধনে দ্বারা যে ভাব লাভ হয় কলিকালে একমাত্র শ্রীশ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই একটী শ্লোকের বিষয় অনুধাবন করিলেই বেশ সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, কেন কলিযুগের এত সুখ্যাতি। তারপর আবার ঐ ভাগবতেরই দ্বাদশস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে,—

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ ভাঃ ১২।৩।৫১

অর্থাৎ—কলিকালের বহু দোষ থাকিলেও একটী মহৎগুণ এই যে, শ্রীহরির গুণ কীর্ত্তনে দ্বারা সকল দোষ নষ্ট হইয়া জীব পাপ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ভগবৎস্মরণের পাবণতা, বিশেষতঃ কলিকালে কিরূপ ফলদায়ক তাহা শুকদেব মহাশয় ভাগবতে স্পষ্টই বলিয়াছেন ;—

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্।
সর্ব্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥ ভাঃ ১২।৩।৪৫

অর্থাৎ কাল কলির প্রভাবে মানবগণ অনুক্ষণই নানাবিধ পাপ কার্য্যে লিপ্ত হয়, কিন্তু চিত্তে একবার পুরুষোত্তম শ্রীহরির স্ফুরণ হইলে সে সকল দোষই নষ্ট হইয়া জীব শুদ্ধ—পবিত্র—কৃতার্থ হয়।

এখানে হয়তো প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, "মনুষ্যের স্বভাবানুসারে যুগে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহাই ইহ পরকালের সুখের হেতু বলিয়া যুগধর্ম্ম নামে অভিহিত। কিন্তু কলিযুগে যে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম তাহার প্রমাণ কি?" এ বিষয় শাস্ত্রে প্রমাণের অভাব নাই, তত্ত্বদর্শী আর্য্য ঋষিগণের যোগ-সিদ্ধ চিত্ত-দর্পণে যে ভাবের বিকাশ হইয়াছে জীবের উপকারার্থে—নাস্তিক জড়বাদি তার্কিকগণের মত-খণ্ডনে তাঁহারা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পদ্ম পুরাণে দেখিতে পাই, নাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগোচিত ধর্ম্ম। তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন।—

"সত্যং কলিযুগে বিপ্র শ্রীহরের্ণাম-কীর্ত্তনং
পরং স্বস্ত্যয়নং নৃনাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

অর্থাৎ কলিযুগে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র পরম স্বস্ত্যয়ন ও সত্য। এতদ্ ব্যতীত জীবের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। পঞ্চমবেদ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অবগত হওয়া যায়—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥" ভাঃ ১২।৩।৫২

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা জীব উদ্ধার হইয়া থাকে, আর কলিযুগে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই জীবের ভব-বন্ধন মোচন হয়। বৃহন্নারদীয় পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে;—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্‌যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্ ॥ ৩৮।৯৭

অর্থাৎ সত্যযুগে ক্লেশ-সাধ্য ধ্যানযোগ, ত্রেতাযুগে নানা বিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং দ্বাপরযুগে বহুবিধ অর্চ্চনাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয় একমাত্র শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই কলিযুগে সেই ফল লাভ হয়। স্কন্দপুরাণ তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন ;—

"তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনং।
কলৌ যুগে বিশেষণ বিষ্ণু প্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার তপস্যার মধ্যে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন রূপ তপস্যাই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কলিযুগে ভগবৎ প্রীতির নিমিত্ত শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই অবশ্য কর্ত্তব্য।

অন্যান্য যুগের বহু আয়াস লভ্য ফল কলিযুগে অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিযুগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে ইহাও একটী প্রধান কারণ।

তারপর আরও এক কথা, এই কলিযুগেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব অবতীর্ণ হইয়া দেবগণ বাঞ্ছিত উন্নতোজ্জ্বল-রস-নির্য্যাস প্রেমধন আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে অযাচিত ভাবে বিলাইয়াছেন। আবার কলিজীবের অবস্থা বিচার করিয়া প্রেমময় ঠাকুর আমার, নামে সর্ব্বশক্তি প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রে নামের মহিমাদ্যোতক প্রমাণের অভাব নাই। ঐ দেখুন প্রভু আমার অবিশ্বাসী তার্কিক পাষণ্ড গণের ভ্রমনিরসণ জন্য তারস্বরে বলিতেছেন,—

"নাম্নস্ত যাবতি শক্তি পাপনির্হরনে হরে।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকি জনা॥
অর্থাৎ— একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
পাপী হ'য়ে ততপাপ করিতে না পারে॥"

আবার মহাপ্রভুর মাহামহিমাময় জীবনী পর্য্যালোচনা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি শুধু উপদেশ দিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে এমন সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ অথচ সরল শিক্ষা শ্রীমহাপ্রভু ভিন্ন আর কেহ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়না। তাইতো বৈষ্ণবকবিগণ বড় গলায় গাহিয়াছেন ;—

"হেন অবতার হবে কি হ'য়েছে
হেন প্রেম পরচার॥"

এমন সরল পন্থা ও আচরণের এমন সহজ উপায় পাইয়াও কি আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত? কোন মতেই উচিত নয়। ব্যাপারতো বড় সহজ নয়, চতুরশীতি লক্ষ জন্ম গ্রহণের পর তবে এমন উপযোগী, এমন সাধন ভজন দ্বারা উন্নত হইবার জীবন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এত সুবিধা পাইয়াও যদি আমরা প্রভুর উপদেশানুযায়ী না চলিয়া পশুর ন্যায় আহার বিহারাদি দ্বারা অযথা সময় ক্ষেপ করি তাহা হইলে পরিণামে যে আরও কত ভীষণ যন্ত্রনা

আসিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? পরম ভাগবত উদ্ধবমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন ;—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং,
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণ ধারং।
ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎস আত্মহা ॥

অর্থাৎ হে উদ্ধব! মানব দেহ সুদুর্লভ. কেননা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি জন্মের পর বহু সুকৃতিবলে তবে এই মনুষ্য দেহ লাভ হয়। কিন্তু সুদুর্লভ হইলেও যখন আমার কৃপায় জীব ইহা লাভ করিয়াছে তখন সুলভই বলিতে হইবে। এই মানব দেহ একটী সুদৃঢ় তরী স্বরূপ, শ্রীগুরুদেবই এই তরীর কর্ণধার এবং আমিই অনুকূল বাতাস বহাইয়া ঐ তরী চালনার সহায়তা করিয়া থাকি এমন সুযোগ পাইয়াও যে মানব ভবসাগর পার না হয় তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে যাহাতে এমন মানব জন্ম বৃথা না যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হয়। অন্ততঃ হওয়াও উচিত। কিন্তু দুর্দ্দৈব এমন যে, সে প্রবৃত্তি একবারও আসেনা। আর আসিলেও সৎসঙ্গাদি দ্বারা সে ভাবের পুষ্টি না করিয়া অসৎ সঙ্গাদি দ্বারা যাহাতে সে ভাব নষ্ট হয় আমরা স্বতঃপরত তাহাই করিয়া থাকি।

আমাদিগের এইরূপ দুর্দ্দৈব দেখিয়া এবং অন্যান্য যুগের ন্যায় কষ্ট সাধ্য সাধন ভজন করিয়া আত্মোন্নতি লাভ করা কলিজীবের পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়াই ভগবান শ্রীনন্দনন্দন রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গে ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে কলি জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াছেন যে,—

"নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
নামেই পাইবে প্রেম সর্ব্ব সিদ্ধি সার ॥"

এমন জন্ম ও এমন সুবিধা পাইয়াও যদি আমরা আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া দেহোচিত, জন্মোচিত কার্য্যে বিরত থাকি তাহা হইলে দেহান্তে যে আমাদিগকে আবার সেই কৃমী কীট যোনী প্রাপ্ত হইতে হইবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু মায়ার আপাতমধুর প্রলোভনে পড়িয়া আমরা একবারও সে বিষয় ভাবিনা

কেবল পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির দাস হইয়া বৃথা ঘুরিয়া মরিতেছি।

আমাদের কৃত কর্ম্মেদ্বারা যদি ভগবদ্ভাবের উদয় না হয়, শ্রীভগবানে যদি বিশুদ্ধা রতি উৎপাদন না করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাতে কপটতা রহিয়াছে। শাস্ত্র এইরূপ কর্ম্মকে পণ্ডশ্রম বলিয়াছেন;—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্‌সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎযদিরতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥" ভাঃ—১।২।৮

সুতরাং ভগবচ্চরণে রতি উৎপাদন শীল কর্ম্মই আমাদের অবশ্য করণীয়। আর সেই কর্ম্মের দ্বারাই যথার্থ দুঃখ দূর হয়। নৈতিক বা সমাজিক উন্নতি দ্বারা দুঃখ দূর হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, ভগবদ্ভজনে দ্বারা আত্মোৎকর্ষ লাভ হইলে সহজে জীবের দুঃখ দূর হয় ও সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের চরণে রতি জন্মায়। এই ভজনের পন্থা বহু ভাবে যুগে যুগে কথিত হইয়াছে কিন্তু কাল কলি-কবলিত জীব ক্রমশঃই অস্থির মতি ও অল্পায়ু হইতেছে দেখিয়া দয়াময় গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রচার করিলেন যে, শ্রীভগবানের নাম গুণানু কীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইয়া জীবের অভিষ্ট লাভ হইবে। নিজমুখে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব নাম কীর্ত্তনে দ্বারা কি হইবে তাহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নামের জয় ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন ;—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্‌॥

তবে অকপট চিত্তে নামের আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। বাহ্যিক সাধুতা দেখাইয়া কপট ভাবে লোক দেখান ভাব অবলম্বনে নাম করিলে ভক্তি লাভতো দূরের কথা বরং পূর্ব্ব সঞ্চিত কিছু ভাব থকিলে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। কোন ভক্ত বড় প্রাণের আবেগে বলিয়াছেন—

"কপট থাকতে না হয় সাধু অনুকূল।
কপট থাকতে গুরু কৃষ্ণ প্রতিকূল॥
যায় একূল ওকূল হেরয়ে অকূল
আকুল হয় ঘোর বিপদে॥"

কপটতা যেমন ভক্তির বাধক এমন আর কিছু নয়। অপকট প্রাণে একবার "হাকৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিলেই হৃদয় কোমল হইয়া আনন্দ-সিন্ধু উচ্ছ্বলিত হইতে থাকে। যন্ত্র ঘটীকা যেমন বিদ্যুৎ তারে সংযুক্ত হইবামাত্রই শব্দ না করিয়া পারে না সেইরূপ অকপট ভাবে নাম গ্রহণ করিলে দিন দিন আত্মোৎকর্ষ লাভই হইতে থাকে। তখন তাহার সঙ্গ যে একবার করে সে আর আকৃষ্ট না হইয়া পারেনা।

এই দুঃখ তাপময় সংসার অরণ্যে রোগ শোকাদি রূপ নানা প্রকার হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে, কিন্তু যাহাতে জীব সহজে এই শ্বাপদ সঙ্কুল ভবারণ্য উত্তীর্ণ হইয়া নিত্যানন্দময় ধামে নিত্যানন্দ ঘন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারে সেই জন্য মঙ্গলময় শ্রীভগবান গৌরাঙ্গ রূপে ঘরে ঘরে হরিনাম মন্ত্র প্রচার করিয়া বলিতেছেন "জীব নামের আশ্রয় লও, নাম ভিন্ন আর গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই।"

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

নামের আশ্রয় লইয়া অকপট চিত্তে পড়িয়া থাকিলে ঐ নামই তোমাকে নামীর সহিত সম্বন্ধ করাইয়া দিবে। কেন না নাম আর নামী যে অভেদ।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ॥"

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

তাই মহাপ্রভু অনাদি কালের বহির্ম্মুখ স্বতন্ত্রতা দোষ যুক্ত সংসার দগ্ধ জীবকে ভগবন্মুখীন করিবার জন্য নাম মন্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। এই যে জীবের আত্যন্তিক দুঃখ দূরের জন্য চেষ্টা এমন সহজ ভাবে অন্য কোন যুগে কোন অবতার করেন নাই কেবল এই কলিযুগেই এই আনন্দময়ের আনন্দঘন লীলা বিকাশের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ পূর্ব্ব হইতেই কলিযুগের এত গুণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

"ধন্য ধন্য কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
যেইযুগে করিলেন নাম পরচার॥"

পথের কাঙ্গাল।

(১৭)

—:০:—

এ যে পথের কাঙ্গাল। সত্য সত্যই এটি পথের কাঙ্গাল। ইহার ধন নাই, জন নাই, বন্ধু নাই—কেহ নাই—কিছু নাই—তাই এটি পথের কাঙ্গাল। পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়—কত কেঁদে, কত সেধে—"কাঙ্গালকে দয়া কর বাবা"—ব'লে কত প্রার্থনা করে—তবুতো কেহ ফিরিয়া দেখেনা—তবুতো কেহ নিকটে আসেনা—তবুতো কেহ ইহার প্রাণের কথা শোনেনা। কেন শুনিবে? তারা যে জানে এটি পথের কাঙ্গাল, কাঙ্গালের সহিত কথা কহিলে, কাঙ্গালের পানে চাহিয়া দেখিলে—কাঙ্গালের কাছে দাড়াইলেও যে, খেলো হইতে হয়, ছোট হইতে হয়—অভিমান শূন্য হইয়া পড়িতে হয়!

তাই তাহাকে শতবেদনা, শত মুখভার—শত অনাদর, শত অবহেলা—এ সবই নীরবে সহিতে হয়—কেননা—এটি যে পথের কাঙ্গাল। পথের পাশে পড়িয়া—কত পথিকের পানে চাহিয়া দেখে কেহ উজ্জ্বল, কেহ ম্লান—কেহ ধীর, কেহ চঞ্চল। কেহ পরিপূর্ণতার আশায়, কেহ অপূর্ণতার আক্ষেপে—চলিয়াছে। এ বিস্তৃত পথের উপর দিয়া তাহারা কোথায় চলিয়াছে তাহা তাহারাই জানে। চলার কিন্তু বিরাম নাই—যে যার ভাবে, যে যার বাসনার টানে—যে যার শক্তি অনুসারে—যদৃচ্ছা চলিয়াছে। পতিত যে কেহ আছে—কাঙ্গাল যে কেহ আছে এ কথা তাহারা যেন বুঝিতেও পারেনা—যেন একথা তাদের মনেই পড়েনা—মাথা উঁচু করিয়া চলিতেছে বলিয়া তাহারা যেন আপনাদিগকে উন্নত বলিয়াই স্থির করিয়া রাখিয়াছে। তাই, কাঙ্গাল বেশে, পথের পাশে আসিয়া যে কেহ এদৃশ্য দেখিয়াছে—তাহাকেই বলিতে হইয়াছে—

"—চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যে জ্বালা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥
যতদিন ভবে, না হবে না হবে, তোমার অবস্থা আমার মত।
দেখেনা দেখিবে বুঝেনা বুঝিবে, জেনে না জানিবে বেদনা কত॥"

কিন্তু হায়! এভাব পথিকের প্রাণে জাগেনা। তাহারা আপন সন্ধানেই ব্যস্ত—আপনার কাছে। আপনাহারা ছুটিছে—বিশ্ব—ছুটিছে বাতাস—উঠিছে লহর—ভ্রমিছে চক্র কি বিরাট ভ্রূকুটি কুটীল অট্টহাসে—থেকে থেকে নেচে নেচে মৃদু গুরু গম্ভীরে—ভেসে আসে শুধু এই প্রতিধ্বনি কাঙ্গালের কাণেঃ—

জীবনের হাটে কিবা বসেছে মোহন মেলা,
চলেছে যাত্রীর দল খেলিতে নবীন খেলা।
যে যাহার আপনার পরিচিত সাথী ল'য়ে,
ছুটিতেছে কি আশ্বাসে আনন্দে অধীর হ'য়ে।
স্নেহ কার' হাত ধ'রে সযতনে লয়ে যায়,
কি জানি হারালে যদি আর নাহি খুঁজে পায়।
কে আসিতে ভুলে গেল, দেখে কেহ ফিরে ফিরে,
ভাবিছে তাহার তরে, দাঁড়ায়ে রহিবে কি রে?
কেহবা পথের মধ্যে দেখিয়া বিদেশী জনে,
চমকি দাঁড়ায়ে ভাবে, কত কথা মনে মনে।
চলেছে এতেক যাত্রী তুই কেন উদাসীন্!
বসিয়া মূঢ়ের মত অলসে যাপিস্ দিন।
যাহারা চলিয়া গেল তাহারাত ফেরে নাই,
তোর তরে সেথা কিরে নাহি দাঁড়াবার ঠাঁই।

পথের কাঙ্গাল, তখন যেন উর্দ্ধনেত্রে ঐ অনন্ত অসীম আকাশের পানে, শুধু উদাস নয়নে চাহিয়া ভাবে "বিশ্ব ভুবন মস্ত ডাগর—"—এর মাঝে আমি কোন্ অস্তিত্বের দাবী রাখি? আমাকে বিশ্বের বাহিরে রাখি সেই বা কি—ভিতরে রাখিলেই বা কি? আমি যে লঘু হ'তে লঘু—আমার গুরুত্ব কোথায়? তখন যেন—ঐ অনন্তের সুদূর নিবিড় সুনীল আকাশ হইতেও স্পন্দিত হয়—

এ হাটে এসেছে কত দেশ দেশান্তর হ'তে,
কত নর কত নারী, কত বয়েসের পথে।
কেহ প্রতিদান আশে করে উপহার দান,
কেহ বিনা বিনিময়ে বিকায় আপন প্রাণ।
কেহবা সর্ব্বস্ব দিয়ে ভাবে দেয়া হয় নাই
অধিক লোভে বা কারো, আশায় পড়িল ছাই।

মনোমত পেয়ে কেহ আনন্দে লইয়া যায়,
কেহ ছলনায় ভুলে ঠেকেছে বিষম দায়।
সকলেরি তাড়াতাড়ি—কারো দেরী নাহি সয়,
ফুরালে হাটের বেলা, যদি কেনা নাহি হয়?
ওরে মুগ্ধ উদাসীন! বিধাতা কি তোরে একা,
সকলের বিপরীত দিল ললাটের রেখা?
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি' মনে কি ভাবিছ তাই,
সকলেরি আছে কিছু তোর কিছু নাই নাই।

পথের কাঙ্গাল তখন যেন ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে অন্তরের অন্তস্থলে—অসীম শূন্যতার মধ্যে তার 'হারানিধির'—তার পরশমণির—তার মর্ম্ম-বেদনা ধর্ম্ম-সাধনা—কাতর ক্রন্দনের সমযোগে ঘণীভূত কেন্দ্রের প্রতি—স্বস্থ. সুস্থ ও প্রশান্ত ভাবে লক্ষ্য করিতে চাহে। আর এমনি সময় ঐ বিশ্ব-প্রাণ বায়ু-লহরী—থাকিয়া থাকিয়া—নাচিয়া নাচিয়া—অণু-পরমাণু-কম্পনে—এক নীরব ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়:—

কি আশায় রে উদাসী বসেছিস্ যোগাসনে?
কি সাধনা সিদ্ধ হবে? পাইবি কি হারাধনে!
বিভিন্ন জনতা স্রোত কলরবে চলে যায়,
তুই বসে আঁখি মুদে—দৃক্‌পাত নাহি তায়।
গগনে প্রখর রবি, সারাদিন নাহি রবে,
ফুরাবে হাটের মেলা, বেলা অবসান হবে।
তখন নয়ন মেলি চারিদিক শূন্য দেখে,
রজনীর অন্ধকারে কার সাড়া পাবি ডেকে?
সকলেত' চলে গেছে তোমার সন্মুখ দিয়ে,
আপনার মনোমত হাটের বেসাতি নিয়ে।
দিবসেতে দেখ নাই চাহিয়া তাদের পানে,
তাহারাও কেহ তাই, ডাকে নাই অভিমানে।
তোর শূন্য প্রাণ ফিরে, বিশ্বের বিরাগে তাই।
দূরে দাঁড়াইয়া দেখে—কেহ্ নাহ কেহ নাই।

পথের কাঙ্গাল তখন পথের পাশে পড়িয়া থাকে। নড়েনা—বলেনা—চলেনা—। তখন, তার ভিতর ডাকে ভিতরে—আর বাহির ডাকে—বাহিরে। এই সন্ধিক্ষণ—এই টানাটানির মাঝে—এই দুয়ের ডাক্ শুনিয়া—সে যে স্থির হইয়া যায়—বাহিরেও চাহেনা—ভিতরেও ভাবেনা। লঘু গুরু বর্জ্জিত—ইতর বিশেষ বিহীন, এক অথবা বহুর পার্থক্য রহিত—সে সাম্য অবস্থার কথা সে বলিতে পারেনা—ভাষায় তার কথা জোটেনা। ভিতরে তখন যে ভাব ছোটে—বুকে, মুখে, চোখে তার শুধু আভাষ টুকুই ফোটে।—তাহা যে দেখে সেই ভাবে, যে জানে সেই ধরে; যে বোঝে সেই শোণে :—

"পথের এ কাঙ্গালের ধ্যান রত হৃদি মাঝে,
অকথিত মর্ম্ম কথা, স্পন্দনে কম্পনে বাজে।
নিশ্বাস প্রশ্বাসে তার ভাব কণা ভেসে যায়
অন্ধকারে অন্ধকার গোপনে মিলিতে চায়।
প্রকৃতির বীণা রন্ধ্রে বিনির্গত ঐক্য তান্,
বিয়োগেতে যোগ সূত্র করিতেছে অধিষ্ঠান।
কোরক কুসুমরূপে হাসিয়া বিকাশ পায়,
পল্লব টুটিয়া পড়ে, সৌরভ শূন্যেতে ধায়।
স্থূল দৃষ্টি দেখে জড়, মনে সূক্ষ্ম পরিচয়;
অন্তরের সাধনা সে—বাহ্যিক তা কিছু নয়।
এ বিশ্বাসে এ কাঙ্গাল তেয়াগী অনিত্য ঋদ্ধি
বসিয়াছে যোগাসনে, লভিতে পরম সিদ্ধি॥
অনন্তের আরাধনে জুড়িয়াছে মহাযাগ্
কেবলে বৈরাগ্য ইহা—এ যে দৃঢ় অনুরাগ॥

করুণাময়।

—:০:—

বেড়াবনা আর খুঁজিয়া তোমারে
নিকটেতে তুমি র'য়েছ।
কি আর জানাব হৃদয়ের ব্যথা
সকলিত তুমি জেনেছ॥

চাহি নাই কিছু তোমার নিকটে
অযাচিতে ঢেলে দিয়েছ।
কামনা বাসনা দূর ক'রে দিয়ে
হৃদি মাঝে দেখা দিয়েছ।
এত দয়া তব না থাকিলে দেব,
দয়াময় বলি জগতে।
ডাকিত কি কেহ, করিত কি কেহ
সম্বন্ধ তোমার সহিতে? ॥

"মন্ত্র-শক্তি।"

—:০:—

"মন্ত্র-শক্তি"র বিষয় আলোচনা করিতে গেলে মন্ত্রের কি মাহাত্ম্য, মন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ কি ফল লাভ হয় এবং মন্ত্র জপ দ্বারা প্রাণে কি প্রকার ভাবের উদয় হয় ইত্যাদি অনেক প্রকার প্রশ্নই মনে স্বভাবতঃ উঠিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে মন্ত্র শক্তি লিখিয়া বা বলিয়া কাহাকেও বুঝান যায় না। মন্ত্রশক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার বিষয়।

মন্ত্র কি, কোন দেবতার কি মন্ত্র, কোন অধিকারীর কোন প্রণালী অনুসারে কোন মন্ত্র সাধন করিলে মন্ত্র-শক্তির উন্মেষ হয় তাহা এবং মন্ত্র সংস্কার ও মন্ত্র চক্রাদির বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে তাই আমরা সংক্ষেপে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শাস্ত্র বলিয়াছেন;—"মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ যাহার মনন করিলে, যাহার সাধনা করিলে জীব পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় তাহার নামই মন্ত্র। মন্ত্র স্বয়ং ঈশ্বরের মূর্ত্তি। মন্ত্র-শক্তি বলিতে পক্ষান্তরে ঈশ্বরের মাহাত্ম্যও বলা যায়। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য মন্ত্ররূপে জীবের অনুভব বেদ্য হন। ঐ মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই জীব পরিত্রাণ লাভ করে। তাই শাস্ত্র মন্ত্রের সংজ্ঞা উপরোক্তভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

হৃদয়ে মন্ত্র-শক্তির উন্মেষ হইলে জীব শ্রীভগবানকে জানিতে ও বুঝিতে পারে। সুতরাং মন্ত্রই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বনীয়। এই মন্ত্রই আমাদিগের সৎপথের পরিচালক এবং চিত্তের বিশুদ্ধিতা ও নির্ম্মলতা প্রদানে সমর্থ। এক কথায় মোটের উপর মন্ত্রই অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া ত্রিতাপ-তাপ-সঙ্কুল সংসার-সাগর পার করিয়া সেই আনন্দঘন শ্রীভগবানকে মিলাইয়া দেয়।

আমরা ঘোর সংসার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া নানাদেশ ভ্রমণ ও নানা প্রকার লোকের সহিত ব্যবহার করিয়া এবং অসংখ্য অসংখ্য বস্তুর সংসর্গাদি করিয়াও বস্তুর যথার্থ সদসৎভাব হৃদয়ঙ্গম করতঃ সংসার বন্ধন হইতে উদ্ধারের উপায় স্থির করিতে পারিনা। কিন্তু এই সুদুস্তর সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া এই মন্ত্রই আমাদিগকে পরম নিগূঢ় ভগবৎ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়।

মন্ত্র-শক্তিই আমাদিগকে সৎপথে চালিত করিয়া অনন্তকালের সংস্কার সম্ভূত ভ্রম সকল দূর করতঃ অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া সর্ব্বব্যাপী ভগবদ্ভাব বুঝাইয়া কৃতার্থ করিতে পারে। গুরুদত্ত মন্ত্ররূপ বীজে শ্রদ্ধাযুক্ত জপরূপ জল সেচন করিলে নিশ্চয়ই শ্রীভগবানরূপ বৃক্ষের দর্শন পাওয়া যায়।

মনন করিবার শক্তি যাঁহার কিছুমাত্রও আছে, যিনি শ্রীগুরুদেবের বাক্যে শ্রদ্ধা রাখিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে পারেন তিনিই জানেন যে, মন্ত্র-শক্তি কি স্বর্গীয় অমৃত-ধারা-বাহিনী পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব শক্তি। প্রত্যক্ষ ভগবানের মূর্ত্তি স্বরূপ ইষ্ট মন্ত্র যাঁহার হৃদয়ে সংস্কারিত হইয়াছে তিনি যথার্থই কৃতার্থ। আর সেই সার্থকজন্মাপুরুষ ঐ ইষ্ট মন্ত্রের যথাযথ ব্যবহার করিয়া তারপর বলিলেও বলিতে পারেন যে, মন্ত্র-শক্তি কি? অন্যের বলিবার বা বুঝিবার শক্তি কোথায়?

বিষয়টী এমনই মধুর, কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই এমন আনন্দ, এমন অতুলনীয় ভাব হৃদয়ে উদয় হয় যে, মনে হয় সকলের নিকট এই আনন্দ কাহিনী বিবৃত করি, কিন্তু বাহিরের বাগ্ বিস্তারে যে ইহার মধুরতা প্রকাশ হইবার নয়। মন্ত্রের মাহাত্ম্য বলিতে গিয়া কোন শাস্ত্রকার সীমা না পাইয়া

বলিয়াছেন ;—"চকিতমপিধত্তে শ্রুতিরপি।" এমন কি বেদও মন্ত্র শক্তির মহিমা কীর্ত্তনে সমর্থ হন নাই সামান্য মানুষ আর কি করিবে।

শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কিছু দিন মন্ত্র-সাধনা করিলেই মন্ত্র-শক্তি বুঝা যায়। নতুবা নিজে কিছু কার্য্য না করিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া বিচার বিতর্ক বা যুক্তির দিক্ দিয়া এ বিষয়ের কিছুই বুঝা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলিয়াছেন—

যদা তত্তক্তসংসর্গাৎ মন্ত্রদীক্ষাং লভেন্নর।
তদা নির্ব্বৃত্তিমাপ্নোতি সারাৎসারাৎপরাৎ পরাং॥

যত্র দেহে লভেন্মন্ত্রং তদ্দেহাবধি ভারত।
তৎপাঞ্চ ভৌতিকং ত্যক্ত্বা বিভর্ত্তি দিব্যরূপকম্॥

করোতি দাস্যং বৈকুণ্ঠে গোলোকে বা হরেঃ পদে।
পরমানন্দসংযুক্তো মোহাদিযু বিবর্জ্জিতঃ॥

ন বিদ্যতে পুনর্জ্জন্ম পুনরাগমনং নহি।
পুনশ্চ ন পিবেৎক্ষীরং ধৃত্বা মাতৃস্তনং পরং॥

অর্থাৎ মন্ত্রলাভ করিলেই ইষ্ট লাভ হয়। মন্ত্র দীক্ষা পাইলে ইন্দ্রিয়াদি পবিত্র হয় ও মানব দিব্যদেহ লাভ করে। * মন্ত্র-শক্তিবলে জীবের জন্ম মরণাদি অশেষ ক্লেশ দূর হইয়া যায় এবং জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সালোক্য সাষ্টি, সারূপ্যাদি সকল রকম মুক্তিরই ভাগী হয়। মন্ত্রশক্তি জড় দেহে চৈতন্য প্রকাশক, মন্ত্রশক্তি অন্ধের নয়ন, ঈশ্বর তত্ত্ব প্রকাশক, দিব্যচক্ষু প্রদাত্রী সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের প্রেম-প্রদ। মন্ত্র অজ্ঞানান্ধকার বিনাশক, অধ্যাত্ম প্রদীপ, দেহ, মন, প্রাণ ও শক্তির শক্তি-সঞ্চারক। বীজ ভিন্ন যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব। মন্ত্র শক্তির আশ্রয় ব্যতিত ইষ্টদেবের দর্শন লাভ ও সেই প্রকার সুদূর পরাহত। যুক্তি পরতন্ত্র হইয়া বৃথা তর্ক করিলে মন্ত্র-শক্তি অনুভব হয়না, পরন্ত বিশ্বাস করিয়া মন্ত্র-সাধনা করিলে সহজেই মন্ত্র-শক্তি অনুভব হয়।

"ভুলাতে নারিবে কভু।"

—:•:—

হৃদয় নিকুঞ্জে নিভৃতে সতত
বিরাজিছ সদা যদি হে।
প্রেম-মন্দাকিনী উছলি উছলি
ভাসায়ে কেননা দেয় হে॥
নব জলধর শ্যাম কলেবর
কেননা নয়নে ভাসে গো।
রাধা নামে সাধা মোহন বাঁশরী
কেননা শ্রবণে পশে গো॥
কেন বা কামনা দাবানল সম
পোড়ায় সতত মোরে হে।
তব নামানন্দে কেন এ রসনা
থাকেনা সদাই রত হে॥
ডাকিলে কওনা কথাটী বারেক
দেওনা কেনগো দেখায়ে হে।
বিরাজ হৃদয়ে সদা যদি তুমি
তবে কেন পাই ব্যাথা হে॥
বুঝেছি এসব লুকোচুরী তব
ওহে ও কপট কালিয়া!
আমিও তোমার "না ছোড়" সেবক
রহিনু ও পদে পড়িয়া॥
দাও কি না দাও দেখাটী এবার
কও কি না কও কথা হে।
দেখিব এবার ভালই করিয়া
কেমনে ছাড়ান্ পাও হে॥

আমিতো তোমার দাসই বটে হে
তুমিত আমারি প্রভু।
যতই দাওনা মায়া-চুষিকাঠি
ভুলা'তে নারিবে কভু॥
(দাসে) ভুলা'তে নারিবে কভু॥

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

অনেকে কেবল কিম্বদন্তির উপর নির্ভর করিয়াই এক একটা মতের সত্যতা প্রমাণ করিতে চান, কিন্তু শুধু কিম্বদন্তি ধরিলে সকলে তাহা গ্রহণ করিবে কেন? হাঁ, কিম্বদন্তি মানিতে আমরা নারাজ নহে তবে যদি তাহার প্রতিকূলে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাই এবং সেই শাস্ত্র কথিত অন্যান্য বিষয়গুলি যদি আমরা মানিয়া লই, তাহা হইলে সেখানে শাস্ত্রীয় যুক্তির প্রতিকূল কিম্বদন্তি গ্রহণ করিব কেন? যেমন কেহ কেহ বলেন বৃন্দাবন দাসের জন্মের সময় নারায়ণীর বয়স আট বৎসর ছিল। ইহারা যে কোন গ্রন্থ হইতে বা কোন প্রমাণের জোরে এটী বলেন তাহা তাঁহারাও বলিতে পারেননা, আমরাও জানিনা। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর নারায়ণীর বিবাহ হয়।" তাহা হইলে দেখা যায় যে যখন মহাপ্রভু মহাপ্রকাশের পর নারায়ণীকে স্বীয় প্রসাদ দান করেন তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু যৌবন লীলায় প্রবৃত্ত। সুতরাং তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়সের সময় নারায়ণী চারি বৎসরের বালিকা। আর তাহার ছয় বৎসর পরে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং তখনতো নারায়ণী দশ বৎসরের। কাজেই সন্ন্যাসের পরে বিবাহ হইয়াছে ধরিলে দশ বৎসরের অনেক পরে নারায়ণীর বিবাহ হয় ইহাই অনুমান হয়। কেননা তিনি লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীবাস ও শ্রীরাম উভয়ে সপরিবারে কুমার হটে বাস করেন এবং নবদ্বীপ ছাড়িবার সময়ে নারায়ণীর বিবাহ দেন। সুতরাং বিধবাবস্থায় বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্মিয়াছিলেন স্বীকার করিলে ১০ বৎসরেরতো পরেই হইবে কেননা বিবাহ

না হইলেতো বিধবা হয়না? তারপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুলের অবশিষ্ট ভক্ষণ করিয়া যে, নারায়ণী কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাহা উক্ত বৃন্দাবন দাস নিজকৃত চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে যথাযথে স্পষ্টই বলিয়াছেন যথা—

"আপন গলার মালা দিল সভাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বুল আজ্ঞা হইল সভারে॥
মহানন্দে খায় সভে হরষিত হৈঞা।
কোটী চন্দ্র শারদ মুখের দ্রব্য পাঞা॥
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভাতৃ সুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥"

* * *

"খাইলে, প্রভুর আজ্ঞা হয় নারায়ণী।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কাঁদ দেখি তুমি॥
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
কৃষ্ণ বলি কাঁদে অতি বালিকা স্বভাব॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥

আমরা ইউরোপের অনেক বিষয় অনুকরণ করিতে যাই কিন্তু যথার্থ যেটী তাহাদের মধ্যে অনুকরণের যোগ্য সেটীর দিকে আদৌ লক্ষ্য করি না। ইউরোপ যেরূপ প্রতিভার আদর করে আমরা সেরূপ প্রতিভার আদর করিতে শিখিলে আজ এই সকল মহাত্মাগণের জীবনী আলোচনা করিতে এত কষ্ট হইত কি?

ইউরোপে কবিগণের সমাধিস্তম্ভে কবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও জন্ম মৃত্যুর সন তারিখ নির্ণয় করিয়া একটী স্মরণ চিহ্ন রাখা হয় কিন্তু এ পোড়া দেশে যদি সেইরূপ করিত তাহা হইলে কি আজ বিরুদ্ধ বাদীগণের প্রতিকুল মতের স্রোতে পড়িয়া এমন হাবুডুবু খাইতে হইত? সচ্ছন্দে আমরা সেইটী দেখিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া লইতে পারিতাম কোন গোলই থাকিতনা। কিন্তু হুজুগে

দেশে তাহা হইবার নয়। বিলাস ব্যসনে, আমোদ প্রমোদে, কেবলমাত্র নিজ-সুখ-সচ্ছন্দতায় জন্য এ দেশের লোক অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে পারে। লোক-সমাজে প্রতিপত্তি পাইবার জন্য, বড় বড় খেতাব লাভের জন্য আমরা স্রোতের ন্যায় অর্থ ব্যয় করি, কিন্তু একটা প্রাচীন কীর্ত্তি বজায় রাখিতে বা প্রাচীন মহাত্মা-গণের বিষয় নির্ভুলরূপে জনসমাজে প্রচার করিতে আমরা একেবারেই উদাসীন। এ বিষয়ে যদি দেশের ধনীগণ একটু কটাক্ষপাত করেন তবে অনায়াসেই অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-দুহিতা নারায়ণী কেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর এত প্রিয় পাত্রী ছিলেন তাহা কবিকর্ণপুর নিজ রচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় লিখিয়াছেন, যথা—'ব্রজলীলায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজী কিলিম্বা নাম্নী অম্বিকার ভগ্নি ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় তিনিই উচ্ছিষ্ট ভোজী নারায়ণী দেবী।"

যাহা হউক আর এ বিষয়ের বাদ প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবনা, যদি এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইতে পারেন আমরা যথাযথ ভাবে উহা প্রকাশে যত্ন লইব।

কুমারহট্টগ্রামে যে দিন বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয় সেদিন বিধবার গর্ভে সন্তান হইল দেখিয়া সকলে ছি, ছি, হরি, হরি, রাম, রাম, প্রভৃতি নামউচ্চারণ করিয়া নিন্দা করিয়া ছিল, ভক্তেরা বলেন প্রকারান্তরে হরিনাম শুনিতে শুনিতে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইল। যাহা হউক দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃন্দাবনদাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, একদিনের জন্যও লোক নিন্দার ভয়ে নারায়ণী পুত্রস্নেহের কোনরূপ ত্রুটী করেন নাই। নারায়ণী শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা পাত্রী ছিলেন, কখনও কাহাকে ভয় বা কাহারও নিন্দাতে কর্ণপাত করিতেন না। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যখন মাত্র এক বৎসরের সেই সময় নারায়ণী কুমার-হট্ট পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী মামগাছিতে আসিয়া বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে কামদারী স্বীকার করেন। এস্থান হইতে মাঝে মাঝে নবদ্বীপে যাইয়া নারায়ণী মহাপ্রভুর দর্শন ও প্রসাদ ভোজন করিতেন।

প্রবাদ যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অল্পদিন পূর্ব্বে মামগাছী গ্রামে আসিয়া সারঙ্গ মুরারী বাসুদেব ও নারায়ণী প্রভৃতির সহিত

সাক্ষাৎ করিয়া কি জানি কেন বাসুদেবকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপে লইয়া যান, বাসুদেব যাইবার সময় নিজ ঠাকুর বাড়ীর ভার সম্পূর্ণ রূপে নারায়ণীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন সেই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত উক্ত দেবালয় "নারায়ণীর পাঠ" এবং উক্ত সেবা "নারায়ণীর সেবা" বলিয়া বিখ্যাত।

মামগাছী গ্রামে নারায়ণীর সেবা গ্রহণ সময় বৃন্দাবন দাসের বয়স মাত্র দেড় বৎসর, উক্ত মামগাছীর বর্ত্তমান মহান্তগণ বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বলিতেন বৃন্দাবনদাসের বিদ্যারম্ভ মামগাছীতেই হয় এবং নবদ্বীপের কোনও চতুষ্পাঠীতে (অনেক অনুসন্ধানেও চতুষ্পাঠীরও অধ্যাপকের নাম পাওয়া যায় নাই।) সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন বৃন্দাবনদাস ব্যাসদেবের অবতার সুতরাং তাঁহার বিদ্যা দৈব লব্ধ। কেবল মাত্র নিত্যানন্দ প্রভুর নিকটই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যাহাই হউক আমরা কোন রকমেই বৃন্দাবনদাসের অধ্যয়ন সম্বন্ধে কোনরূপ সন্তোষ জনক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না, কাজেই প্রবাদ বচনই প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে বেদব্যাসের অবতার তৎ সম্বন্ধে কবিকুলতিলক শ্রীমৎকবিকর্ণপুর শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

"বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসবৃন্দাবনোঽধুনা
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ ॥"

অর্থাৎ যিনি দ্বাপরে বেদব্যাস ছিলেন তিনিই অধুনা বৃন্দাবন দাস হইয়া গৌরাঙ্গ লীলায় অবতীর্ণ। আর ব্রজের কুসুমপীড় নামক কৃষ্ণসখা কার্য্যবশতঃ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আবার শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে ;—

"কৃষ্ণ লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥"

পুনঃ— "দ্বাপরেতে যেইজন হৈল বেদব্যাস।
গৌরাঙ্গ লীলায় তেঁহ বৃন্দাবনদাস ॥"

স্বরূপ নির্ণয় গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"নারায়ণী সুত বলি বৃন্দাবনদাস।
শ্রীভাগবত কৈল তেঁহ বেদব্যাস ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর শান্তিপুর, নীলাচলে গৌড়, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, বৃন্দাবন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া যখন নীলাচলে পুনর্ব্বার আগমন করেন তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়ে হরিনাম মহামন্ত্র প্রচার করিতে আদেশ করেন তদনুসারে নিত্যানন্দ প্রভু স্বীয় পার্ষদগণ সঙ্গে প্রথম পানিহাটী তৎপর সপ্তগ্রাম এবং নবদ্বীপে গমন করেন তথা হইতে যখন গ্রামে গ্রামে প্রেমদাতা নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমপ্রচার করিতেছিলেন তখনই বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গ লাভ করেন। তারপর যখন (১৪৪৪ কিম্বা ১৪৪৫ শকে) গৌরভক্তগণ সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করেন সেই সঙ্গে বৃন্দাবনদাসও ছিলেন। ক্রমে নবদ্বীপ হইতে সাত ক্রোশ পশ্চিমে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গতঃ দেনুড় গ্রামে আসিয়া স্নান ভোজনাদি নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে বৃন্দাবনদাসকে কিছু মুখশুদ্ধি আনিতে বলায় তৎক্ষণাৎ স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটী হরিতকী লইয়া তাহা নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রদান করিলে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "এ হরিতকী কোথা হইতে আনিলে," তদুত্তরে বৃন্দাবনদাস বলিলেন ;—"প্রভো! গতকল্য এই হরিতকী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম" এই কথা শ্রবণ মাত্র নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন "তোমার এখনও সঞ্চয় প্রবৃত্তি রহিয়াছে তুমি এখনও সন্ন্যাস ধর্ম্মের উপযুক্ত হও নাই, কিছুদিনের জন্য আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রামে থাক এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ কর।" এই আদেশ করিয়া সেই হরিতকী দেনুড় গ্রামে সেই স্থানে প্রোথিত করিয়া অন্যান্য ভক্তগণ সঙ্গে তথা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, বৃন্দাবনদাস, প্রভুর এতাদৃশ কঠোর আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু কিছুতেই বৃন্দাবনদাসকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না। বরং বৃন্দাবনদাসের প্রতি ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আমার আদেশ কখনই অন্যথা হইবেনা, আমার আদেশ পালন কর অচিরাৎ তুমি অবিনশ্বর যশ লাভ করিবে।" বৃন্দাবনদাস অবশেষে একবার মাত্র নীলাচল, বৃন্দাবন ও দ্বাদশ গোপালের পাঠ সমূহ দর্শন করিয়া আসিয়া দেনুড় গ্রামে বাস করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহাতেও নিত্যানন্দ প্রভু সম্মতি দিলেন না, কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্যদেব, জগন্নাথ, রাধাগোবিন্দ ও বালক-

গোপালের পাটের শ্রীমূর্ত্তি সকল ঐ গ্রামে প্রকাশের অনুমতি দিয়া অন্যান্য ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলাভিমুখে গমন করেন। যখন প্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনদাসের এইরূপ ঘটনা ঘটে তখন বৃন্দাবনদাসের বয়স ১৫ কি ১৬ বৎসর মাত্র।

প্রভুর আদেশ মত বৃন্দাবনদাস ঐ দেনুড় গ্রামে ক্রমে ক্রমে শ্রীমূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ক্রমাবয় নিত্যানন্দ প্রভুর স্বহস্তে রোপিত সেই হরিতকী হইতে একটী প্রকাণ্ড হরিতকী বৃক্ষ জন্মিয়াছিল কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ১২৬৬ সালে এক ব্যক্তি ঈর্ষাবশতঃ উক্ত বৃক্ষটী ছেদন করিয়া একটী প্রাচীন কীর্ত্তি নষ্ট করিয়াছে। যাহা হউক অদ্যাবধিও ঐ স্থানকে "অবধুত হরিতকী তলার ডাঙ্গা" এবং বৃন্দাবনদাসের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীটী "বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট" নামে বিখ্যাত ; এবং প্রতি বৎসর নানাস্থান হইতে অনেক যাত্রী এই শ্রীপাট দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

এক্ষণে বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা যত দূর পারি কিছু আলোচনা করিব।

শ্রীল কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য রচনার পরে যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় কাহারও মত ভেদ নাই। এক্ষণে সেই শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্যের রচনাকাল কবিকর্ণপুর স্বরচিত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই।—

"বেদা, রসা, শ্রুতয়ঃ ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে শাকে তথাশলু শুচৌ সুভগে চ আসিবারে সুধাকিরণ নাম্ন্যমিত দ্বিতীয়াতিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য।"

বেদ—৪, রস—৬, শ্রুতি—৪ ইন্দু—১।

অঙ্কস্য বামা গতিঃ সুতরাং ১৪৬৪ শকে আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে এই গ্রন্থ রচনা শেষ হয়।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধানের নয় বৎসর পরে কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য রচনা করেন। তাহার পরে বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা হয়।

বঙ্গভাষাও সাহিত্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ, এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব জীবনী লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের পূর্ব্ব মতের সহিত একমত হইয়া

১৪৫৭ শকে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচনা কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায় ১৪৫৭ কেন কাহারও কাহারও মতে যে ১৪৬৫ শকে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচনাকাল বলিয়া নির্দ্দেশ হয় তাহাও নির্ভুল বলিয়া মানিতে পারিনা। কারণ দেখুন।—

১৪০৭ শকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত লীলা করিয়া ১৪৫৫ শকে তিরোভাব। তারপর পূর্ব্বে যে শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যের রচনা কাল নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ১৪৬৪ শকে উহার রচনা শেষ হয় তাহার পরে শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচিত হয়। স্বর্গীয় ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন ১৪৭০ শকে শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচিত হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট বহু প্রাচীন একখানি হস্ত লিখিত পুঁথি ছিল উহাতে নাকি ১৪৯৭ শকে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা শেষ হইল বলিয়া লেখা আছে, এই পুঁথিখানি হস্তগত হওয়ার পর উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় নিজ পূর্ব্বমত ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দেনুড় গ্রামের নিকটবর্ত্তী কাইগ্রামের জমীদার পরম বৈষ্ণব ৺ বিশ্বম্ভর বসু মুন্সী মহাশয়ের গৃহে এখনও উক্ত হস্তলিখিত গ্রন্থখানি আছে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নাম প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ছিল, শ্রীচরিতামৃত কার বলিয়াছেন :—

"বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥"

আবার বলিয়াছেন :—

"বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্য-মঙ্গল যিঁহো করিল রচন॥"

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল রচনার কিছুদিন পরে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গতঃ কোগ্রাম নিবাসী শ্রীল লোচনানন্দ দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মঙ্গল নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরকে উপহার প্রদান করেন। কিন্তু নরহরি ঠাকুর উক্ত গ্রন্থ দর্শন করিয়া বলিলেন—বৎস। তুমি শ্রীচৈতন্য মঙ্গল রচনা করিয়াছ বটে কিন্তু তোমার গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বে দেনুড় গ্রাম নিবাসী বৃন্দাবনদাস একখানি শ্রীচৈতন্য

মঙ্গল রচনা করিয়াছেন সুতরাং তাহার গ্রন্থ জনসমাজে পূর্ব্ব হইতেই প্রচার হইতেছে এমতাবস্থায় তোমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্য মঙ্গল দেওয়া ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না।

নরহরি ঠাকুরের নিকট এই সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া লোচনানন্দদাস নিজ গ্রন্থখানি লইয়া দেনুড় গ্রামে গমন করিলেন এবং বৃন্দাবনদাসের হাতে দিয়া গ্রন্থখানি দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বৃন্দাবনদাস গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে দিন সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণ করিবার উদ্দেশে গৃহত্যাগ করেন তাহার পূর্ব্বরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিহার বর্ণন রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া বৃন্দাবনদাস যেন একটু ক্ষুন্ন হইলেন এবং বলিলেন, লোচন! তুমি এস্থলে স্বাধীন ভর্ত্তৃকাভাব অর্থাৎ অদূর প্রবাস বর্ণন করিয়াছ কিন্তু আমার মতে এস্থলে প্রোষিত ভর্ত্তৃকা অর্থাৎ মাথুরের ভাব বর্ণনা করাই উচিত ছিল। বৃন্দাবনদাসের উক্তি শুনিয়া লোচনানন্দ দাসের মনঃক্ষুন্ন ভাব প্রকাশ পাইল। ঐ সময় বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জননী নারায়ণী দেবী মামগাছি হইতে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেনুড়ে আসিয়াছিলেন। তিনি ঐ কথা শুনিয়া লোচনের মত সমর্থন করিয়া বলিলেন—"বৃন্দাবন! লোচনদাস যাহা বলিতেছে উহাই ঠিক, কারণ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত গৃহ-ত্যাগের পূর্ব্ব রাত্রে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এমন কি গৃহের বাহিরে থাকিয়া আমি উভয়ের কথোপকথন শুনিয়াছিলাম। সুতরাং লোচনের মতের আমি পক্ষপাতী।

মাতৃ-ভক্ত বৃন্দাবনদাস মায়ের কথা শুনিয়া আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া গ্রন্থ দেখিতে লাগিলেন ক্রমে "অভিন্ন চৈতন্য মোর প্রভু অবধুত।" এই কবিতাংশ পাঠ করিয়া পরমানন্দে বলিলেন "লোচন! তোমার এই গ্রন্থ গৌড়-দেশের লোক-সমাজে অবশ্যই বিশেষ আদরণীয় হইবে, কারণ তুমি নিতাই গৌরকে অভিন্ন দেখাইয়াছ আমি এখনও তাহা দেখাইতে পারি নাই আজ হইতে আমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইল আর তোমার গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বলিয়াই প্রচার হইবে।

এখানে দেখি, বৃন্দাবনদাস নিজ গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রেমবিলাস গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের রচিত শ্রীচৈতন্য মঙ্গল

গ্রন্থের শ্রীচৈতন্য ভাগবত নাম হওয়া সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যাখা শুনিতে পাওয়া যায়, উক্ত প্রেমবিলাস গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল ।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল ॥"

প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের শেষ ভাগে ঠাকুর মহাশয়ের যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমরা এই নাম পরিবর্ত্তনের যেরূপ কথা দেখিতে পাই উহা আমাদের মতের সহিত মিল না হইলেও সমীচীন বোধে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম পাঠকগণ আলোচনা করিয়া দেখিবেন। তিনি লিখিয়াছেন "বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রথমে স্বীয় গ্রন্থকে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল নামে অভিহিত করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে সময় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন সে সময়েও এই চৈতন্য মঙ্গল নাম চলিয়া আসিতেছিল। প্রেম-বিলাসের রচয়িতার সকল কথা অবলম্বন করিতে পারা যায়না, তথাপি তাঁহার এই কথাটীতে কোন বিরুদ্ধ মত দেখা যায়না। কথাটী এই যে, প্রথমে চৈতন্য মঙ্গল অন্যান্য তৎকাল প্রচলিত গীতকাব্যের ন্যায় মধ্যে মধ্যে পয়ার ও মধ্যে মধ্যে গীত দ্বারা পরিপূরিত ছিল। পরে শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ ঐ গ্রন্থকে সমাজ পাঠ্য গ্রন্থ করিবার জন্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত গীতগুলিকে পৃথক করত পয়ার সমস্ত একত্র করিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত নাম দেন। গীতগুলি সম্প্রতি পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঠাকুরের রচিত গীতগুলি সকল মহাজনের আদরের বস্তু। এই প্রণালীতে এখন যে চৈতন্য ভাগবত পাওয়া যায় তাহাও বিশেষ আদরের ধন।"

যাহা হউক এ বিষয় আমরা অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করিনা, আগামী বারে আমরা বৃন্দাবনদাসের শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রাপ্তি ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নাদি অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীভগবান যে, জীবের ও জগতের মঙ্গলের জন্য ধরাধামে নানাভাবে অবতীর্ণ হইয়া নানা লীলা করেন একথা তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনের নিকট নিজমুখেই তিনি বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ গীতা—৪অঃ—৭।৮

অর্থাৎ হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি দেখি, তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া অসাধুগণকে বিনাশ করিয়া সাধুগণের পরিত্রাণ করিয়া থাকি।

ভগবানের এই যে অবতীর্ণ হওয়া ইহারও প্রকার ভেদ আছে—কখন স্বরূপে, কখন স্বরূপ-বিলাসরূপে কখনও স্বরূপ-শক্তিরূপে কখনও বা শক্তি-বিলাসরূপে, আবার কখনও বা স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তিরূপে অথবা স্বরূপ-শক্তি-বিলাস-বৃত্তিরূপে প্রপঞ্চ জগতে প্রকাশ হইয়া থাকেন। তাহাতে কখনও তাঁহার পূর্ণতা কখনও বা তাঁহার আংশিক বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। যখন স্থাবর জঙ্গম আদির মধ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং ধর্ম্ম-বিঘ্ন-সমূহের বিনাশের প্রয়োজন হয় তখন অংশরূপে এবং যখন পঞ্চম পুরুষার্থ ভববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত প্রেম-প্রচারের আবশ্যক হয় তখন আর তিনি অংশরূপে না আসিয়া পূর্ণরূপেই আবির্ভূত হয়েন। যাঁহার যেটী দান করিবার অধিকার আছে তিনি ভিন্ন অন্যে তাহা কি প্রকারে দিবে? তাই প্রেম বিতরণের প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে নিজ চিদানন্দময় পরিকরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আবির্ভূত হইতে হয়। শ্রীচরিতামৃত কার স্পষ্টই বলিয়াছেন;—

"যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে ॥"

প্রেম, চিদানন্দময়ী স্বরূপ শক্তির বৃত্তি। কাজেই সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীভগবানকে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম দান করিতে হয়। তারপর তিনিতো দান করিবেন কিন্তু গ্রহিতাতো চাই? দাতা ও গ্রহিতা উভয়ে পরস্পর যোগ্য না হইলে দান কার্য্য সিদ্ধ হয় কি করিয়া? এখন গ্রহিতার অবস্থা বলি,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সিদ্ধ আচার্য্য প্রভুগণ স্থির করিয়াছেন যে, স্বরূপ শক্তির স্থান সিদ্ধ ভূমি, আর জীব শক্তির স্থান সাধনা ভূমি। এই উভয় ভূমির একত্র সমাবেশ না হইলে সিদ্ধ স্বরূপ-শক্তির সহিত সাধক জীব-শক্তির সমভূমিত্ব ঘটিতে পারেনা। তারপর আবার স্বরূপ-শক্তির স্বকীয় সম্পত্তি যে প্রেম, তাহা যেমন স্বরূপ-শক্তি ব্যতিরেকে অপর কেহ দান করিতে অসমর্থ, সেইরূপ অসিদ্ধদেহ সম্পন্ন জীবও সিদ্ধদেহ লাভ ব্যতিত ঐ দান গ্রহণে অসমর্থ। শাস্ত্র ও পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ জড় দেহাতিরিক্ত তুরীয় চিদানন্দময় সিদ্ধদেহ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে হ্লাদিনীর সারভূতা প্রেম-সম্পত্তি লাভের অধিকার জন্মেনা।

সাধক শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে সাধন করিয়া তদীয় কৃপাশক্তি প্রভাবে সিদ্ধদেহোপযোগী প্রেমধন লাভের অধিকারী হইলেই তৎকালে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ শ্রীভগবান পরিপূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রেম বিতরণ করিয়া থাকেন। তখন দেশ কালাদির কোন বিঘ্নই প্রেম বিতরণের অন্তরায় হইতে পারেনা হইলেও লীলাময়ের কৃপাকটাক্ষে অনুকূলই হওয়া যায়। যুগে যুগে এই ভাবেই প্রেমময় শ্রীভগবান অধর্ম্ম দূর করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিতেছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন। শাস্ত্র মানিতে হইলে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিবাক্য বিশ্বাস করিতে হইলে এটী স্বীকার করিতে হইবে।

অতীত দ্বাপর যুগের শেষভাগে যখন যজ্ঞ বিঘ্নকারীও দেব দ্বিজ বিদ্বেষী অসুরগণ নিজ নিজ অনুচরগণের সহিত বিবিধ মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া সদর্পে বিচরণ করিতেছিল, তাহাদের প্রলোভনে পড়িয়া ধর্ম্মের নামে যখন অধর্ম্ম লোক সমাজে বেশ সম্মান পাইতে ছিল, তখন ধরিত্রীদেবী অধর্ম্মের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া গাভী-রূপ ধারণ পূর্ব্বক কমলযোনী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁহার নিকট সমস্ত শুনিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া ভূভার বৃত্তান্ত নিবেদন মানসে ক্ষীর সমুদ্রতীরে ভগবান

বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবগণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া দৈববাণী দ্বারা নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে ব্রহ্মা দেবগণকে নিজ নিজ অংশে ধরাতলে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিলেন।

তাঁহারই আদেশে দেবগণও আপনাপন অংশী ভগবৎ পরিকরগণের সহিত মিলিত হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবতাগণের এইভাবে আবির্ভাবের পরেই অনন্ত লীলাবিলাসকারী পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং শ্রীভগবান পূর্ণরূপে নিজ অন্তঃরঙ্গ পরিকরবর্গের সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শাস্ত্র পাঠ দ্বারা ও ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া অবগত হওয়া যায়, দ্বাপরে ভগবান শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতরণ পূর্ব্বক অসাধুগণের বিনাস এবং সাধুগণের পরিত্রাণ দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যথা—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ভাঃ ১১।৫।২৭

এক্ষণে এই যে ভগবানের আবির্ভাব ইহা কোথায় কাহাকে আশ্রয় করিয়া হইয়াছিল তাহাই বলিতেছি। যাদব রাজগণের রাজধানী মথুরা মণ্ডলের নিকট-বর্ত্তী নন্দীশ্বর গিরি, ঐ "নন্দীশ্বর" গিরির নিকটে পর্জ্জন্য নামে সর্ব্বসদ্‌গুণ বিভূষিত এক গোপ বাস করিতেন, যদুবংশীয় "দেবমীঢ়ের" পুত্র বলিয়াই তিনি বিখ্যাত কিন্তু যদুবংশে জন্ম হইলেও বৈশ্যার গর্ভজাত বলিয়া বৈশ্য জাতি মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ বিনয়-নম্র ব্যবহারে ও স্বধর্ম্মাচরণে রত থাকিয়া সকলেরই অতিশয় প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে বৃন্দারণ্যবাসী তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া মানিতেন। ক্রমে পর্জ্জন্য ভগবৎ কৃপায় পাঁচটী পুত্র সন্তান লাভ করেন। নন্দীশ্বর গিরিতে বাস করিবার সময় মহাবলশালী দুর্দ্দান্ত কেশী নামক দৈত্যের অত্যাচারে উৎ-পীড়িত হইয়া নিজ বাসস্থান নন্দীশ্বর গিরি ত্যাগ করিয়া নিজ পত্নী ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে গোকুলে আসিয়া বাস করেন। সেই স্থানেই পর্জ্জন্যের পরলোক গমনের পর তাঁহার মধ্যম পুত্র নন্দমহারাজ "গোপরাজ" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

শূর নামে পর্জ্জন্যের একটী বৈমাত্রেয় ভ্রাতাছিল শূর ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত বলিয়া বিখ্যাত, ক্রমে শূরের বসুদেব নামে এক পুত্র হয়। বসুদেব মথুরাতেই

বাস করিতেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় মথুরাধিপতি উগ্রসেনের ভ্রাতৃ তনয়া দেবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ হয়। গোকুলবাসী "গোপরাজ নন্দ"ও মথুরাবাসী 'বসুদেব" পরস্পর ভ্রাতৃ সম্পর্ক। দুই জনের মধ্যে খুবই সৌহার্দ্দ ছিল। এই বসুদেব ও দেবকীকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে প্রকাশ হয়েন, এবং কংস ভয়ে নন্দালয়ে প্রেরিত হইয়া নানা লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কংসের পরিচয় কিঞ্চিৎ দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা বিধায় দিতেছি,—মথুরাধিপতি পূর্ব্বোক্ত উগ্রসেনের পত্নী পদ্মাবতীর গর্ব্ভে সৌভপতির ঔরষে (পদ্মপুরাণ মতে দ্রুমিলনামক দৈত্যের ঔরষে) কংসের জন্ম হয়, এই জন্যই কংসকে উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হয়। পূর্ব্ব জন্মে এই কংসই কালনেমি নামক অসুর ছিল, ঐ জন্মে বিষ্ণু-হস্তে নিহত হইয়া ইদানিং কংসরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আগামী বারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাষ ও জন্ম প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমার সাধু দর্শন।

—:০:—

তখন আমি স্কুলে পড়ি, সে দিন বেলা অধিক হওয়ায় পূজনীয় কাকাবাবু আমাকে স্কুলে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমিতো যেন হাতে হাতে চাঁদ পাইলাম, তবে একটা বড় ক্ষোভ হইল যে, যদি স্কুলেই যাওয়া না হইলে তবে মায়ের সঙ্গে ৺ তারকেশ্বরে যাইতে দিলেন না কেন? মনের ক্ষোভ মনেই রহিল, মুখ ফুটিয়াতো কিছু বলিবার যো নাই, কেননা কাকাবাবুই আমাদের সংসারের কর্ত্তা তিনি যে ব্যবস্থা করিবেন তাহার বিরুদ্ধে কেহই এমন কি মাও কিছু বলিতে পারেন না, কাজেই চুপ্ করিয়া থাকিতে হইল।

স্কুলে যাওয়া না হওয়ায় যত না হউক মায়ের সঙ্গে যাইতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় আমার সহাধ্যায়ী সুবোধ চন্দ্র আসিয়া আমাকে বলিল "ভাই! গঙ্গার ঘাটে আজ ৫।৬ দিন হইল একটী মহাপুরুষ আসিয়াছেন, যদি তুমি যাইতে চাও তবে আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় যাইতে পার।" আমি বলিলাম "ভাই! কাকা

বাবু যেতে দিবেন কি? তুমি যদি পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়া কাকাবাবুকে রাজি করিতে পার তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।" সুবোধ "তাহাই হইবে" বলিয়া চলিয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দেখি সুবোধ একখানি চিঠি লইয়া উপস্থিত, আসিয়াই বলিল "তোমার কাকাবাবুকে এই পত্রখানি আমি নিজ হাতে দিব, তাহা হইলে তোমার যাইবার সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি হইবে না।" আমিও আর কিছু না বলিয়া তাহাকে কাকাবাবুর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া নিচে আসিয়া বসিলাম।

কিছু সময় পরে সুবোধ হাসিতে হাসিতে নিচে আসিয়া আমাকে বলিল "বস্, কিস্তিমাৎ, তোমার কাকা বাবু ঠিক সময় মত তোমাকে পাঠাইয়া দিবেন, আমি পণ্ডিত মহাশয়ের ওখানেই থাকিব।" এই বলিয়া সুবোধ চলিয়া গেল আমি আমার পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া খাতা পত্র নাড়াচাড়া করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। উঠিয়া দেখি বেলা ৪৷৷০টা, কাকাবাবু তখনও উঠেন নাই, আমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া পড়িতে বসিলাম। কিছু সময় পরে কাকাবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "ভাল জামা কাপড় পরিয়া তোমার পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী যাও, যদি সেখান হইতে ফিরিতে বেশী রাত্র হয়, তবে আর আসিবার প্রয়োজন নাই, কাল্‌তো রবিবার আছে, স্কুলে যাবারও তাড়াহুড়া নাই। সেখানে থাকিয়া কাল্ সকালে বাড়ী আসিও।" আমিও কোন কথাটী না বলিয়া তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরিয়া কাকাবাবুকে প্রণাম করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে চলিলাম। সেখানে গিয়া দেখি তিনি সুবোধকে লইয়া আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন।

যাইবামাত্রই "এত দেরী করিলে কেন? চল, আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই" বলিয়া আমাদের সঙ্গে করিয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিলেন। রাস্তায় দু'একটী কথা হইল, কেবল পণ্ডিত মহাশয়ের ভয়ে আমরা তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া হাঁ হুঁ দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

ধীরে ধীরে যাইয়া গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখি লোকে লোকারণ্য, সকলেই সাধুর কথা বলিতেছে। পণ্ডিত মহাশয় আমাদের দু'জনকে লইয়া সেই ভিড় ঠেলিয়া একেবারে সাধুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। আমরাও পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সাধুকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। সাধুও "আনন্দে

থাক” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিছু সময় নানা প্রকার বাদানুবাদ, নানাবিধ কথার কাটাকাটি হইবার পর পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন। “শাস্ত্র যে ‘স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥’ এই কথা বলিয়াছেন এই স্বধর্ম্ম কাহাকে বলে, দয়া করিয়া বলিবেন কি?

সাধু—যে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত, সেই সেই যুগানুরূপ ধর্ম্মই সেই সেই যুগের জীবের স্বধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

পণ্ডিত।—আমরা কলির জীব আমাদের স্বধর্ম্ম কি?

সাধু।—শাস্ত্র বলিয়াছেন “কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ” কলিযুগে শ্রীহরি-নাম সঙ্কীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে সুতরাং উহাই আমাদের স্বধর্ম্ম।

পণ্ডিত।—যুগধর্ম্ম আশ্রয় ভিন্ন কি পরিত্রাণের উপায় নাই?

সাধু।—যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের বল, বীর্য্য, ধর্ম্মভাব ও সৎ প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সত্যযুগে মানসিক শক্তির প্রাবল্য-হেতু যেরূপ ধর্ম্মের ব্যবস্থা ছিল, ত্রেতাযুগে মানসিক শক্তির হ্রাস ও কায়িক শক্তির প্রাবল্যে সেরূপ ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিলে চলিবেনা, আবার দ্বাপর যুগে মানসিক ও কায়িক শক্তির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; তারপর এই কলিযুগে উক্ত তিন যুগের শক্তিই হ্রাস হেতু তৎ সমস্ত ধর্ম্ম অসাধ্য বলিয়া দুর্ব্বল, চঞ্চল-চিত্ত-বিশিষ্ট কলিজীবের পক্ষে তদনুযায়ী ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ উক্তিতে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।—

“প্রায়ঃ স্বভাব বিহিতো নৃণাং ধর্ম্ম যুগে যুগে।
বেদ দৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্যচেহ চ শর্ম্মকৃৎ॥” ভাঃ—৭।১১।৩১

নারদ বলিতেছেন;—হে রাজন্। মানবগণের সত্ত্বাদি স্বভাবানুসারে যুগে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে বেদবিদ্ সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই ধর্ম্মকেই ইহপর কালের সুখের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, শ্রীহরি-নাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের যুগধর্ম্ম। কাজেই শাস্ত্র মানিতে হইলে কলিজীবের পক্ষে যে নাম-ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহার আশ্রয় ব্যতিত পরিত্রাণের উপায় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু তপন মিশ্রের সাধ্য সাধন প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টই বলিয়াছেন;—

"কলিযুগ ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র। কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহা ভাগ্য॥"

স্বধর্ম্ম যদি নীচও হয় তাহা হইলেও শ্রেষ্ঠ এবং পর ধর্ম্ম অপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জীব কোন ক্রমেই অনন্ত দুঃখ-সঙ্কুল ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেনা, শাস্ত্র এই হরিনাম মহামন্ত্রকেই সংসার সাগর পারের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে,—

"নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি
সংসার পারং দুরিতৌঘ মুক্তঃ।
নরঃ স সত্যং কলিদোষ জন্ম
পাপং নিহত্যাশু কিমত্র চিত্রং॥"

অর্থাৎ—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা মনুষ্য নিখিল পাপবন্ধন বিমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই সংসার পারে গমন করে। সুতরাং সেই নাম গ্রহণকারী যে কলি-কলুষ-জনিত পাপ সকল বিনষ্ট করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি।

পণ্ডিত।—আচ্ছা, ভগবানেরতো অনেক নাম আছে, কোন নাম করা উচিত? আর শাস্ত্রইবা কোন নাম করিতে বলেন?

সাধু।—তোমার ন্যায় পণ্ডিতের এ প্রশ্ন করা ঠিক হয় নাই, যিনি মঙ্গল-ময়, তাঁহার যে কোন নামই গ্রহণ করনা কেন, তাহাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। হরি-ভক্তি বিলাস গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে ;—

"সর্ব্বাণি নামানি হি তস্য রাজন্
সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈতু ভবন্তি পুংসঃ।"

অর্থাৎ হে রাজন্। শ্রীকৃষ্ণের সকল নামই জীবকে সর্ব্বার্থ সিদ্ধিদান করিয়া থাকে। আবার স্কন্দ পুরাণে বলিয়াছেন ;—

দানব্রততপস্তীর্থ ক্ষেত্রাদীনাঞ্চযাঃ স্থিতা ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃশুভাঃ ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষুনামসু ॥

অর্থাৎ দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, দেবতা, সাধু, রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, জ্ঞান ও অধ্যাত্ম বস্তুর যে সকল সর্ব্বপাপহারা ও মঙ্গলপ্রদা শক্তি আছে, কৃপাময় শ্রীহরি তৎসমুদায় আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ নাম সমূহে স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ভগবানের যে কোন নাম যে কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করনা কেন, তাহাতেই মঙ্গল হইবে।

পণ্ডিত।—তবে শাস্ত্রে "ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং" ইত্যাদি বিষয় বিশেষে নাম বিশেষের স্মরণ উল্লেখ করিয়াছেন কেন?

সাধু।—দরকার, ঐভাবে ক্রমে ক্রমে বিষয় বিশেষে নাম বিশেষের স্মরণ পদ্ধতি দেখাইয়া সাধককে নামোন্মুখী করাইয়া একবার নামের আস্বাদ দিয়া দিবার জন্যই ঐরূপ নিয়ম। নির্দ্দিষ্ট নাম স্মরণ কীর্ত্তন করিলেও দোষ হয়না, হরিভক্তি বিলাসে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বার্থশক্তি যুক্তস্য দেব দেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ ॥

অর্থাৎ দেব দেব ভগবান চক্রধারী সর্ব্বার্থ শক্তি সম্পন্ন। অতএব সর্ব্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহার যে নাম ইচ্ছা হয় কীর্ত্তন করিবে।

পণ্ডিত।—আচ্ছা, নাম কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু উপদেশ করিবেন কি?

সাধু।—এ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ মুখেই চরম উপদেশ দিয়াছেন আমাদের নিজ মন্তব্য না বলিয়া তাঁহার উপদেশই বলি। তিনি বলিয়াছেন;—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

শ্রীশ্রীচরিতামৃতকার ইহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন;—

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম ॥

বৃক্ষ যেন কাটিলেহো কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহি আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হয়্যা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥"

এইভাবে একেবারে অভিমান শূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিলে, ত্রিতাপ জ্বালার শান্তি হইয়া শ্রীভগবানে রতি মতি হয়।

পণ্ডিত।—দেখুন, আপনার নিকট এ সকল উপদেশ শুনিয়া মনে হয় উপদেশ মত কার্য্য করিব, কিন্তু কেন যে দৃঢ়তা আসেনা তাহা বলিতে পারিনা। তারপর যদিও কিছু করিতে যাই দু'একদিন করিয়া আবার যেন মনে মনে কেমন সন্দেহ আইসে, বেশ দৃঢ়তার সহিত—বিশ্বাসের সহিত, কোন কার্য্যই করিতে পারিনা, ইহার কারণ কি?

সাধু।—দেখ। এভাবে কাজ করিলে চলিবেনা, বেশ ভালরূপ চিন্তা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমাদের মনতো বায়ু-বিতাড়িত সাগর-তরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই চঞ্চল, এই বিষয়-দুষ্ট মনকে স্থির করিবার উপায় অনেক রকম শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, কিন্তু সেগুলি আচরণ না করিয়া কেবল শুনিয়া গেলে বা দেখিয়া গেলে হইবেনা, সেইভাবে আচরণ করিতে হইবে। প্রথম প্রথম ভাল না লাগিতে পারে কিন্তু ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পুনঃ পুনঃ আচরণ করিতে করিতে আপনিই হৃদয় শুদ্ধ হইয়া উঠিবে। একটা উদাহরণ বলি শুন;—মিশ্রি অতিশয় উপাদেয় মিষ্ট দ্রব্য, কিন্তু যে ব্যক্তি পিত্তরোগগ্রস্থ তাহার নিকট মিশ্রি তিক্ত লাগে, তাহা বলিয়া কি মিশ্রিকে তিক্ত বলিয়াই স্থির করিয়া রাখিবে? তাহা নয়, চিকিৎসকগণ যেমন পিত্তরোগগ্রস্থ রোগিকে মিশ্রিই বহু পরিমাণে সেবন করাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন এবং তাহাতেই যেমন তাহার রোগ সারিয়া মিশ্রির মিষ্টত্ব সে অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ প্রথম প্রথম মায়া-পিত্ত-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে নাম সর্ব্ব-সুখদায়ক বলিয়া মনে

না হইলেও পুনঃ পুনঃ ঐ নাম করিতে করিতেই ঐ নামের শক্তিতে মায়া-পিত্ত-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ দূর হইবে এবং ঐ স্বভাব-মধুর নামের মধুরত্ব বুঝিতে পারিবে। বিশ্বাস রাখা চাই, শাস্ত্র যখন বলিয়াছেন ও মহাপুরুষগণ যখন নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন তখন তাহাতে বিশ্বাস রাখিয়া সাধনা কর, ক্রমে ফল পাইবেই পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত।—তাহা হইলে বিশ্বাসই দেখিতেছি প্রধান ও প্রথম আবশ্যক।

সাধু।—নিশ্চয়, বিশ্বাস না হইলেতো কিছুই হইবেনা, সাধনার মূলই হইল বিশ্বাস। বিশ্বাসের বাতি জ্বালিতে না পারিলে সংশয়ের ঘোরও কাটিবেনা আর সাধনের প্রকৃত পথও দেখিতে পাইবেনা, বিশ্বাস দ্বারাই তত্ত্ব বস্তু সাধকের লাভ হয়। মহাজনগণ বলিয়াছেন "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।" বুঝলে বাবা। বিশ্বাস আগে চাই।

পণ্ডিত।—আচ্ছা। তর্কের দ্বারা কি বিশ্বাস আনা যায়না?

সাধু।—তর্কের দ্বারা কখন কখন বিশ্বাস আসে বটে, কিন্তু সে আলাদা ভাবের তর্ক। তর্ক করিব বলিয়া তর্ক, আর বুঝিব বলিয়া তর্ক দু'য়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। এ বিষয়টী আমি বুঝিতে পারিতেছিনা কাজেই পাঁচ রকম প্রশ্ন করিয়া সেটা বুঝিয়া লইলাম; এভাবের যে তর্ক, তাহার ভিতরে প্রবল জ্ঞান-লিপ্সা অর্থাৎ সত্য বিষয় জানিবার বাসনা বর্ত্তমান থাকাতে সে তর্কে দোষ নাই কিন্তু অমুক ব্যক্তি বা শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিবনা আমার নিজ মতই স্থাপনা করিব এই বলিয়া যে তর্ক তাহাই খারাপ। এভাবের তর্ক কখনও ইষ্ট বস্তুর সন্ধান বলিয়া দিতে পারেনা। এইভাবের তর্ককেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "তর্কে বহু দূর।"

পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত মহাত্মার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একটী যুবক কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া মহাপুরুষের নিকট দিলেন মহাপুরুষ বলিলেন, এক্ষণে একটু নাম সঙ্কীর্ত্তন করা যাউক। এই বলিয়া তিনি নিজেই গান ধরিলেন, এবং সমবেত ভক্তমণ্ডলীও তাঁহার সহিত যোগ দিয়া সমস্বরে গাহিতে লাগিলেন;—

নাচত শচীসুত কীর্ত্তন মাঝ।
কণক ধরাধর নিন্দি রুচির তনু
বিলসত যনু নব মনমথ রাজ॥

কলি কলি দমন শমন ভয়ভঞ্জন
নিখিল ভুবনজন রঞ্জনকারি।
দুলহ প্রেমধন বিতরণ পণ্ডিত
সুরতরু নিকর গরব ভয়হারি॥
পদতল তালে ধরণী কর টলমল
ললিত ভঙ্গিভুজ রহি রহি পসারি।
হাসত মৃদু মৃদু অধর কম্পয়তি
অথির গদাধর বদন নেহারি॥
ডগমগ কমল নয়ন ঘন ঘুরত
নিরুপম পুরব রঙ্গ পরকাশ।
উলসিত পরম চতুর পরিকরগণ
ইহ রসে বঞ্চিত নরহরি দাস॥

কীর্ত্তন অনেকক্ষণ চলিল, ইহার সঙ্গে মহাপুরুষ কত না "অক্ষর" (আখর) দিতে লাগিলেন, কতনা নূতন নূতন ভাবের পদ আবৃত্তি করিলেন, তারপর উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি দিয়া কীর্ত্তন শেষ হইলে মহাপুরুষ নিজহস্তে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলে সকলেই একে একে বিদায় লইলেন। পণ্ডিত মহাশয়ও রাত্রি অধিক হইয়াছে বলিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলেন, আমরাও তাঁহার সহিত বিনা বাক্যব্যয়ে ফিরিয়া সে রাত্রি পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহেই কাটাইয়া পরদিন বাড়ী ফিরিলাম।

ইহার পর হইতে আমি প্রায়ই উক্ত মহাত্মার নিকট যাতায়াত করিতাম। সে সব বিবরণ ক্রমান্বয় প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

নিবেদন।

—:•:—

সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়গণ! শ্রীভগবৎ কৃপায় ও আপনাদিগের সাহায্যে শ্রীভক্তি পত্রিকা আজ নানাবিধ বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া ১৭শ বর্ষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন। এবারে আমাদিগের ত্রুটী বিচ্যুতি যথেষ্ট। বিশেষতঃ কয়েক মাস যাবৎ পারিবারিক ও নিজ শারিরীক অসুস্থতার জন্য বাধ্য হইয়া প্রবাসে থাকিতে হইয়াছিল সে কারণ বৈশাখ মাস হইতে পত্রিকা আপনাদিগকে যথাসময় দিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত। আশা করি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য সকলেই আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। অদ্য ১৭ বর্ষ শেষ হইয়া ১৮শ বর্ষ আরম্ভ হইল এই শুভ সংযোগে

আমরা সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক উৎসাহদাতা বন্ধু বান্ধবগণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইতেছি। আর ভবিষ্যতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব যাহাতে যথানিয়মে মাসে মাসে পত্রিকা প্রকাশ হয়।

ইউরোপের যুদ্ধ-বিভ্রাটে কাগজ ও মুদ্রণ সরঞ্জামাদির দারুণ দুর্ম্মূল্যতায় আশানুরূপ পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারি নাই, যুদ্ধ মিটিয়াছে এক্ষণে কাগজের সুবন্দোবস্ত হইলেই আমরা ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি করিতে যত্ন লইব।

পরিশেষে সকল গ্রাহকগণের নিকটই সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা আজ ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত যে ভাবে প্রবন্ধাদি প্রদান করিয়া ও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন, আগামী ১৮শ বর্ষেও যেন সে কৃপালাভে আমরা বঞ্চিত না হই। সকলে যদি অন্ততঃ একটী করিয়াও নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে যত্ন লয়েন তবুও যথেষ্ট উপকার হয় আশাকরি সকলেই ভক্তির প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।-

বিনীত—
ভক্তি কার্য্যাধ্যক্ষ।

সদ্য-প্রসূত শ্রীগৌরাঙ্গ।

সোণার পুতুল কিবা। শচীমা'র কোলে গো,
শচীমা'র কোলে।
কে আছে এমন জন, হেরি এ শিশু রতন,
আপনার ধন জন, নাহি যায় ভুলে গো—
নাহি যায় ভুলে।
কি দিব তুলনা, নাই তুলনার স্থল গো—
তুলনার স্থল।
কি নাসা, নয়ন, মুখ, দেখিলে জুড়ায় বুক,
কিবা রাঙ্গা টুকটুক, কর পদতল গো—
কর পদতল।
কিবা সুগঠিত আহা, এ শিশুর দেহ গো,—
এ শিশুর দেহ।
না জানি কেমন বিধি, গড়িল এরূপ নিধি,
দেখে নাই অদ্যাবধি, হেন শিশু কেহ গো—
হেন শিশু কেহ।
আলোকিত দশদিক, অঙ্গের ছটায় গো,—
অঙ্গের ছটায়।

কচি কচি হাত খানি, মুষ্টিবদ্ধ করি আনি,
বুকের উপরে আনি, কেন বা ঘুরায় গো,—
কেন বা ঘুরায়॥
রাঙ্গা রাঙ্গা পাদু'খানি লীলায় আছাড়ে গো,—
লীলায় আছাড়ে।
শিশুর রোদন ধুয়া, চাঁদমুখে উয়াঁ উয়াঁ,
সবে ভাবে আজি এ কে? শিশু জন্ম ধরে গো,—
শিশু জন্ম ধরে॥
অতি শীঘ্র রটিল সংবাদ ঘরে ঘরে গো,—
সংবাদ ঘরে ঘরে।
শুনিয়া শিশুর কথা, আসিলা মালিনী, সীতা,
শিশু সহ শচীমাতা, যে সূতিকা ঘরে গো,—
যে সূতিকা ঘরে।
সকলি আসিলা করে, ধান্য দূর্ব্বা লঞা গো,—
ধান্য দূর্ব্বা লঞা।
শত শত পতিব্রতা, আসিয়া মিলিলা তথা,
আসিলা সুর বণিতা,—মানবী হইয়া গো—
মানবী হইয়া॥
পূর্ণিত সূতিকা গৃহ, অপূর্ব্ব আলোকে গো,—
অপূর্ব্ব আলোকে।
সবে করে অনুমান, গোলকের ভগবান,
জীবেরে করিতে ত্রাণ, আসিল ভূলোকে গো,—
আসিল ভূলোকে॥
ধাত্রী দিল নাভি-নাড়ী, করিয়া ছেদন গো—
করিয়া ছেদন।
কেহ রক্ষা মন্ত্র পড়ে, নৃসিংহ স্মরণ করে,
যা'তে ডাইনী নিশাচরে, না করে হরণ গো,—
না করে হরণ॥
সবে বলে মরি লয়ে, শিশুর বালাই গো,—
শিশুর বালাই।
ডাকিনী শাকিনী চোরে, যাহাতে ছুইতে নারে,
নাম রাখে এই ডরে, সোণার নিমাই গো,—
সোণার নিমাই॥

দীন—শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

না হইলেও পুনঃ পুনঃ ঐ নাম করিতে করিতেই ঐ নামের শক্তিতে মায়া-পিত্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ দূর হইবে এবং ঐ স্বভাব-মধুর নামের মধুরত্ব বুঝিতে পারিবে। বিশ্বাস রাখা চাই, শাস্ত্র যখন বলিয়াছেন ও মহাপুরুষগণ যখন নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন তখন তাহাতে বিশ্বাস রাখিয়া সাধনা কর, ক্রমে ফল পাইবেই পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত।—তাহা হইলে বিশ্বাসই দেখিতেছি প্রধান ও প্রথম আবশ্যক।

সাধু।—নিশ্চয়, বিশ্বাস না হইলেতো কিছুই হইবেনা, সাধনার মূলই হইল বিশ্বাস। বিশ্বাসের বাতি জ্বালিতে না পারিলে সংশয়ের ঘোরও কাটিবেনা আর সাধনের প্রকৃত পথও দেখিতে পাইবেনা, বিশ্বাস দ্বারাই তত্ত্ব বস্তু সাধকের লাভ হয়। মহাজনগণ বলিয়াছেন "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।" বুঝ্‌লে বাবা। বিশ্বাস আগে চাই।

পণ্ডিত।—আচ্ছা। তর্কের দ্বারা কি বিশ্বাস আনা যায়না?

সাধু।—তর্কের দ্বারা কখন কখন বিশ্বাস আসে বটে, কিন্তু সে আলাদা ভাবের তর্ক। তর্ক করিব বলিয়া তর্ক, আর বুঝিব বলিয়া তর্ক দু'য়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। এ বিষয়টী আমি বুঝিতে পারিতেছিনা কাজেই পাঁচ রকম প্রশ্ন করিয়া সেটা বুঝিয়া লইলাম; এভাবের যে তর্ক, তাহার ভিতরে প্রবল জ্ঞান লিপ্সা অর্থাৎ সত্য বিষয় জানিবার বাসনা বর্তমান থাকাতে সে তর্কে দোষ নাই কিন্তু অমুক ব্যক্তি বা শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিবনা আমার নিজ মতই স্থাপনা করিব এই বলিয়া যে তর্ক তাহাই খারাপ। এভাবের তর্ক কখনও ইষ্ট বস্তুর সন্ধান বলিয়া দিতে পারেনা। এইভাবের তর্ককেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "তর্কে বহু দূর।"

পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত মহাত্মার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একটী যুবক কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া মহাপুরুষের নিকট দিলেন মহাপুরুষ বলিলেন, এক্ষণে একটু নাম সঙ্কীর্ত্তন করা যাউক। এই বলিয়া তিনি নিজেই গান ধরিলেন, এবং সমবেত ভক্তমণ্ডলীও তাঁহার সহিত যোগ দিয়া সমস্বরে গাহিতে লাগিলেন,—

নাচত শচীসুত কীর্ত্তন মাঝ।
কণক ধরাধর নিন্দি রুচির তনু
বিলসত যনু নব মনমথ রাজ॥

বলি কলি দমন শমন ভয়ভঞ্জন
নিখিল ভুবনজন রঞ্জনকারি।
ঢুলহ প্রেমধন বিতরণ পণ্ডিত
সুরতরু নিকর গরব ভয়হারি॥
পদতল তালে ধরণী করু টলমল
ললিত ভঙ্গিভুজ রহুয়ি পসারি।
হাসত মৃদু মৃদু অধর কম্পয়তি
অথির গদাধর বদন নেহারি॥
ডগমগ কমল নয়ন ঘন ঘূরত
নিরূপম পুরব রঙ্গ পরকাশ।
উলসিত পরম চতুর পরিকরগণ
ইহ রসে বঞ্চিত নরহরি দাস॥

কীর্ত্তন অনেকক্ষণ চলিল, ইহার সঙ্গে মহাপুরুষ কত না "অক্ষর" (আখর) দিতে লাগিলেন, কতনা নূতন নূতন ভাবের পদ আবৃত্তি করিলেন, তারপর উচ্চৈস্বরে হরিধ্বনি দিয়া কীর্ত্তন শেষ হইলে মহাপুরুষ নিজহস্তে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলে সকলেই একে একে বিদায় লইলেন। পণ্ডিত মহাশয়ও রাত্র অধিক হইয়াছে বলিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলেন, আমরাও তাঁহার সহিত বিনা বাক্যব্যয়ে ফিরিয়া সে রাত্র পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহেই কাটাইয়া পরদিন বাড়ী ফিরিলাম।

ইহার পর হইতে আমি প্রায়ই উক্ত মহাত্মার নিকট যাতায়াত করিতাম। সে সব বিবরণ ক্রমান্বয় প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

নিবেদন।

—:০:—

সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়গণ! শ্রীভগবৎ কৃপায় ও আপনাদিগের সাহায্যে শ্রীভক্তি পত্রিকা আজ নানাবিধ বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া ১৭শ বর্ষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন। এবারে আমাদিগের ত্রুটী বিচ্যুতি যথেষ্ট। বিশেষতঃ কয়েক মাস যাবৎ পারিবারিক ও নিজ শারিরীক অসুস্থতার জন্য বাধ্য হইয়া প্রবাসে থাকিতে হইয়াছিল সে কারণ বৈশাখ মাস হইতে পত্রিকা আপনাদিগকে যথাসময় দিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত। আশা করি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য সকলেই আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। অদ্য ১৭ বর্ষ শেষ হইয়া ১৮শ বর্ষ আরম্ভ হইল এই শুভ সংযোগে

আমরা সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক উৎসাহদাতা বন্ধু বান্ধবগণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইতেছি। আর ভবিষ্যতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব যাহাতে যথানিয়মে মাসে মাসে পত্রিকা প্রকাশ হয়।

ইউরোপের যুদ্ধ-বিভ্রাটে কাগজ ও মুদ্রণ সরঞ্জামাদির দারুণ দুর্মূল্যতায় আশানুরূপ পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারি নাই, যুদ্ধ মিটিয়াছে এক্ষণে কাগজের সুবন্দোবস্ত হইলেই আমরা ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি করিতে যত্ন লইব।

পরিশেষে সকল গ্রাহকগণের নিকটই সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা আজ ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত যে ভাবে প্রবন্ধাদি প্রদান করিয়া ও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন, আগামী ১৮শ বর্ষেও যেন সে কৃপালাভে আমরা বঞ্চিত না হই। সকলে যদি অন্ততঃ একটী করিয়াও নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে যত্ন লয়েন তবুও যথেষ্ট উপকার হয় আশাকরি সকলেই ভক্তির প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।—

বিনীত—

ভক্তি কার্য্যাধ্যক্ষ।

সদ্য-প্রসূত শ্রীগৌরাঙ্গ।

সোণার পুতুল কিবা। শচীমা'র কোলে গো,
শচীমা'র কোলে।
কে আছে এমন জন, হেরি এ শিশু রতন,
আপনার ধন জন, নাহি যায় ভুলে গো—
নাহি যায় ভুলে॥
কি দিব তুলনা, নাই তুলনার স্থল গো—
তুলনার স্থল।
কি নাসা, নয়ন, মুখ, দেখিলে জুড়ায় বুক,
কিবা রাঙ্গা টুক্‌টুক্‌, কর পদতল গো—
কর পদতল॥
কিবা সুগঠিত আহা, এ শিশুর দেহ গো,—
এ শিশুর দেহ।
না জানি কেমন বিধি, গড়িল এরূপ নিধি,
দেখে নাই জন্মাবধি, হেন শিশু কেহ গো—
হেন শিশু কেহ॥
আলোকিত দশদিক, অঙ্গের ছটায় গো,—
অঙ্গের ছটায়।

কচি কচি হাত খানি, মুষ্টিবদ্ধ করি আনি,
বুকের উপরে জানি, কেন বা ঘুরায় গো,—
কেন বা ঘুরায়॥
রাঙ্গা রাঙ্গা পাদু'খানি লীলায় আছাড়ে গো,—
লীলায় আছাড়ে।
শিশুর রোদন শুনি, চাঁদমুখে উয়াঁ উয়াঁ,
সবে ভাবে আজি এ কে? শিশু জন্ম ধরে গো,—
শিশু জন্ম ধরে॥
অতি শীঘ্র রটিল সংবাদ ঘরে ঘরে গো,—
সংবাদ ঘরে ঘরে।
শুনিয়া শিশুর কথা, আসিলা মালিনী, সীতা,
শিশু সহ শচীমাতা, যে সূতিকা ঘরে গো,—
যে সূতিকা ঘরে।
সকলি আসিলা করে, ধান্য দুর্ব্বা লঞা গো,—
ধান্য দুর্ব্বা লঞা।
শত শত পতিব্রতা, আসিয়া মিলিলা তথা,
আসিলা সুর বণিতা,—মানবী হইয়া গো—
মানবী হইয়া॥
পূর্ণিত সূতিকা গৃহ, অপূর্ব্ব আলোকে গো,—
অপূর্ব্ব আলোকে।
সবে করে অনুমান, গোলকের ভগবান,
জীবেরে করিতে ত্রাণ, আসিল ভূলোকে গো—
আসিল ভূলোকে॥
ধাত্রী দিল নাভি-নাড়ী, করিয়া ছেদন গো—
করিয়া ছেদন।
কেহ রক্ষা মন্ত্র পড়ে, নৃসিংহ স্মরণ করে,
যা'তে ডাইনী নিশাচরে, না করে হরণ গো,—
না করে হরণ॥
সবে বলে মরি লয়ে, শিশুর বালাই গো,—
শিশুর বালাই।
ডাকিনী শাকিনী চোরে, যাহাতে ছুইতে নারে,
নাম রাখে এই ডরে, সোণার নিমাই গো,—
সোণার নিমাই॥

দীন—শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

এবং স্বোক্তস্য জীবাত্মনোঽশোচ্যত্বমুক্ত্বা পরোক্তস্যাপি তস্য তদুচ্যতে পরমতজ্ঞানায়। তদভিজ্ঞঃ খলু শিষ্যস্তৎপক্ষৈস্তান্নিরস্য বিজয়ী সন্ স্বমতে স্থৈর্য্যমাসীৎ। তথাহি মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টে ভূম্যাদি ভূতচতুষ্টয়ে তাম্বুলরাগবৎ মদশক্তিবচ্চ চৈতন্যমুৎপদ্যতে। তাদৃশস্তচ্চতুষ্টয়ভূতো দেহ এব আত্মা। স চ স্থিরোঽপি প্রতিক্ষণ পরিণামাৎ উৎপত্তিবিনাশযোগীতি লোকপ্রত্যক্ষসিদ্ধমিতি লোকায়তিকা মন্যন্তে। দেহাদ্ভিন্নো বিজ্ঞানস্বরূপোঽপ্যাত্মা প্রতিক্ষণবিনাশীতি বৈভাষিকাদয়ো বৌদ্ধা বদন্তি। তদেতদুভয়মতেঽপ্যাত্মনঃ শোচ্যত্বং

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

অস্ত্বেবমাত্মনো নিত্যত্বং তথাপি দেহসংযোগবিয়োগাত্মকজনিমৃতী স্ত এবেত্যত আহ। অথচেতি ॥২৬॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

পুনশ্চ ভগবান অর্জ্জুনকে শ্লেষ পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মহাবাহো অর্জ্জুন! এই জীবকে যদি নিত্য-জাত বা নিত্য-মৃত বলিয়া বিবেচনা কর, তাহাতেও তোমার শোকের কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ লোক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী লোকায়তিকের মতে মনুষ্যত্ব পশুত্বাদিবিশিষ্ট এই পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের মধ্যে তাম্বুলাদি রাগে যেমন ওষ্ঠাদি রঞ্জিত হইতে দেখা যায় তদ্রূপ আমার শক্তি বিশিষ্ট চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তাদৃশ উক্ত ভূত-চতুষ্টয়ের পরস্পর সম্মিলনে উৎপন্ন এই পরিদৃশ্যমান দেহকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। উক্ত দেহ স্থির ভাবাপন্ন হইলেও উহার প্রতিক্ষণে পরিণাম বিদ্যমান থাকায় উহাকে উৎপত্তি বিনাশ যোগী বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে।

বৈভাষিকাদি বৌদ্ধ মতে আত্মাকে বিজ্ঞান স্বরূপ স্বীকার করিলেও উহা যে বিনাশী, তাহা বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদিগের মতাবলম্বন করিয়া

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে নত্বং শোচিতু মর্হসি ॥২৭॥

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

প্রতিবোধয়তি। অথেতি পক্ষান্তরে। চোঽপ্যর্থে। ত্বং চেন্মদুক্তজীবাত্ম যাথাত্ম্যাবগাহনাসমর্থো লোকায়তিকাদি পক্ষমালম্বসে তত্র দেহাত্মপক্ষে এনং দেহ লক্ষণমাত্মানং নিত্যং জাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে। ক্ষণিক বিজ্ঞান পক্ষে চ নিত্যং প্রতিক্ষণং তং তথা তথা মন্যসে। বা শব্দশ্চার্থে। তথাপি ত্বমেনমহোবত মহৎ পাপমিত্যাদি বচনৈঃ শোচিতুং নার্হসি। পরিণামস্বভাবস্য তস্য তস্য চাত্মনো জন্মবিনাশয়োরনিবার্য্যত্বাজ্জন্মান্তরাভাবেন পাপ ভয়া সম্ভবাচ্চ। হে মহাবাহো ইতি সোপহাসং সম্বোধনং। ক্ষত্রিয়বর্য্যস্য বৈদিকস্য চ তে নেদৃশং কুমতং ধার্য্যমিতি ভাবঃ ॥২৬॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

দেখিলেও আত্ম বিষয়ক শোকের অযৌক্তিকতাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্যই "অথচৈনং" শ্লোকের অবতারণা করিয়া পক্ষান্তরে বলিতেছেন; শ্লোকে উক্ত "চ" কার এখানে অপর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি যদি মদুক্ত জীবাত্মার যাথাত্ম্যের অবগাহনে অসমর্থ লোকায়তিক বৌদ্ধাদির মত অবলম্বন কর, তাহা হইলে উক্ত দেহাত্ম মতে ও এই দেহ লক্ষণ আত্মাকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃত, বলিয়া মনে কর। এবং ক্ষণিক বিজ্ঞান পক্ষাবলম্বনে, ক্ষণিক বিজ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে প্রতিক্ষণে জাত ও মৃত বলিয়া মনে কর। "অহোবত মহৎ পাপং" এই যে ইহাদিগের হনন বিষয়ে মহৎ পাপ সম্ভাবনায় যে শোকে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, ঐ শোক করিতে পার না। যেহেতু পরিণামী স্বভাব সেই সেই আত্মার জন্ম ও বিনাশ যখন অনিবার্য্য, এবং তাহার যখন আর পৃথক জন্মান্তর নাই, তখন তদ্বিষয়ে পাপ ভয়ের সম্ভাবনা থাকিতে পারেনা। অতএব ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ। বৈদিক আচার নিষ্ঠ তোমার এরূপ-কুমতকে অবলম্বন না করাই কর্ত্তব্য ॥২৬॥

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

অথ শরীরাতিরিক্তোনিত্য আত্মা। তস্যাপূর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়যোগো জন্ম পূর্ব্বশরীরেন্দ্রিয় বিয়োগস্তু মরণং তদুভয়ঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মহেতুকত্বাত্তদাশ্রয়স্য নিত্যস্যাত্মনো মুখ্যং। তদর্শিনিত্তস্য শরীরস্য তু গৌণং। তস্যানিত্যস্য কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গেন তদাশ্রয়ত্বানুপপত্তেরিতি তার্কিকা মন্যন্তে। তৎ পক্ষে হপ্যাত্মনঃ শোচ্যত্বং পরিহরতি জাতস্যেতি। হির্হেতৌ, জাতস্য স্বকর্ম্মবশাৎ প্রাপ্ত শরীরাদিযোগস্যানিত্যস্যাপ্যাত্মনস্তদারম্ভ কর্ম্মক্ষয়হেতুকো মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ।

মাধ্ব ভাষ্যম্।

কুতোহশোকঃ নিয়তত্বাদিত্যাহ জাতস্যেতি॥ ২৭॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

অথবা তার্কিকগণের মতাবলম্বনে যদি শরীরাতিরিক্ত নিত্য আত্মাকে সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় স্বীকার কর, এবং ঐ নিত্য আত্মার কর্ম্মলব্ধ অপূর্ব্ব শরীরেন্দ্রিয়াদির সংযোগকে জন্ম, পুনশ্চ নিজ কর্ম্মাবসানে উক্ত শরীরেন্দ্রিয়াদির বিয়োগকে মরণ বলিয়া স্বীকার কর। উক্ত সংযোগ বিয়োগরূপ জন্ম মরণের হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় আত্মারই জন্মাদি মুখ্য, এবং শরীরেন্দ্রিয়াদির সম্পর্কে ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয় বলিয়া আত্মাতিরিক্ত শরীরাদির জন্ম মরণের গৌণত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলেও অকৃত নিত্য আত্মার প্রাপ্তি প্রসঙ্গ হইতে আত্মায় তদাশ্রয়ত্বের অনুপপত্তি হইতেছে উক্ত পক্ষাবলম্বনেও আত্মার জন্ম মরণ সম্বন্ধে শোকের অযোগ্যতা প্রতিপাদন মানসেই এই "জাতস্য হি" শ্লোকের অবতারণা। এখানে "হি" শব্দ হেত্বর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, জাত ব্যক্তির অর্থাৎ যে নিত্যজীব স্বকর্ম্মবশে কর্ম্মের অনুরূপ বিভিন্ন শরীরাদির সংযোগ লাভ করিয়াছে, সেই নিত্য আত্মার ও দেহারম্ভক কর্ম্মের ভোগাবসানে সেই দেহাদির সহিত বিয়োগরূপ মৃত্যু যখন নিশ্চয় হইতেছে, এবং যৎকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মের ক্ষয় সংঘটিত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত পুনশ্চ সেই মৃত আত্মার পূর্ব্বসঞ্চিত বা সেই পূর্ব্ব শরীরোৎপন্ন কর্ম্ম হেতু শরীরান্তরের পরিগ্রহণরূপ জন্মও যখন স্থির নিশ্চয় হইতেছে, তখন সেই তুমি বিজ্ঞ হইয়া

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮॥

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

মৃতস্য তচ্ছরীর কৃত কর্ম্ম হেতুকং জন্ম চ ধ্রুবং স্যাৎ। তস্মাদেবমপরিহার্য্যে পরিহর্ত্তুমশক্যে জন্ম মরণাত্মকেঽর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি। ত্বয়ি যুদ্ধান্নিবৃত্তেঽপ্যেতে সারম্ভকে কর্ম্মণি ক্ষীণেসতি মরিষ্যন্ত্যেব। তবতু স্বধর্ম্মাবিচ্যুতির্ভাবিনীতি ভাবঃ॥ ৭॥

অথ দেহাত্মপক্ষে আত্মাতিরিক্ত দেহপক্ষে চ দেহ বিনাশ হেতুকঃ শোকো ন যুক্তস্তদারম্ভকাণাং ভূতমাত্রাণামবিনাশদিত্যাহ অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তং নামরূপবিরহাৎ সূক্ষ্মং প্রধানং আদি আদিরূপং যেষাং তানি ভূতানি পৃথিব্যাদি ভূতময়ানি শরীরাণি ব্যক্তমধ্যানি ব্যক্তং নামরূপযোগাৎ স্থূলং মধ্যং জন্ম বিনাশাস্থ-রালাস্থিতি লক্ষণং যেষাং তানি। অব্যক্তনিধনানি অব্যক্তে তাদৃশি প্রধানে নিধনং

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

তদেব স্পষ্টয়তি অব্যক্তাদীনীতি ॥২৮॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

অপরিহার্য্য জন্ম মরণ বিষয়ে শোক করিতে পারনা। তুমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেও যদি ইহাদের দেহারম্ভক কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহারা নিশ্চয়ই মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া তোমার প্রধান ধর্ম্ম যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে, তোমার স্বধর্ম্ম ত্যাগ জন্য পাতিত্ব অবশ্যই হইবে। তুমি পাতিত্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেনা। অতএব নিয়তিসিদ্ধ বিষয়ে শোক করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে ॥২৭॥

এক্ষণে শ্রীভগবান কি দেহাত্ম পক্ষে অর্থাৎ যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করে তৎপক্ষে, কি আত্মাতিরিক্ত দেহ পক্ষে অর্থাৎ যাহারা আত্মা ও তদতিরিক্ত পৃথক্ দেহের স্বীকার করে তৎপক্ষে, এতদুভয় মতের কোন পক্ষাবলম্বনেই দেহের বিনাশ নিমিত্ত শোক করা সঙ্গত নহে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত বলিলেন হে ভারত। দেখ এই দেহাত্ম পক্ষাবলম্বন করিয়া দেখিলে, দেখ।

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

নাম রূপবিমর্দ্দনলক্ষণো নাশো যেষাং তানি মৃদাদিকে সদ্রূপে দ্রব্যে কম্বুগ্রীবাদ্যবস্থা যোগো ঘটস্তোৎপত্তিস্তদ্বিরোধিকপালাদ্যবস্থাযোগস্তু তস্য বিনাশ কথ্যতে। সদ্দ্রব্যং সর্ব্বদা স্থায়ীতি। এবমেবাহ ভগবান পরাশরঃ,—মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা চূর্ণরজস্ততোঽণুরিতি। এবং শরীরাণাং দাম্পত্যনামরূপাযোগাদ ব্যক্তিমন্তি। মধ্যে তু তদ্যোগাদ্ব্যক্তিমন্তি। তদারম্ভকাণি ভূতানি তু সর্ব্বদা সন্তীতি তেষু নষ্টেষু সৎসু কা পরিদেবনা কঃ শোকানামবিলাপ ইত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ।

যাহার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ যে ভূত মাত্রকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, উক্ত সূক্ষ্ম ভূতের কখনও নাশ হয় না, অব্যক্ত অর্থাৎ যাহার নাম ও রূপের অভিব্যক্তি হয় নাই কেবল সূক্ষ্ম অর্থাৎ প্রধান বা আদি রূপে অবস্থিত উহাই অব্যক্ত।

ঐ অব্যক্ত ভূতই মধ্যাবস্থায় পৃথিবী, জল, আকাশ, তেজ, বায়ু ইত্যাদি নামে ও সেই সেই রূপে স্থূল শরীরাদি লাভ করিয়া জন্ম ও বিনাশের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, ব্যক্ত আখ্যায় অভিহিত হয়। অবশেষে ঐ ভূতপঞ্চই নাম রূপ পরিশূন্য হইয়া নিধন দশা প্রাপ্ত হইলে পুনশ্চ অব্যক্ত দশায় অবস্থান করে।

যেমন মৃত্তিকাদি সদ্রূপ দ্রব্য কম্বুগ্রীবাদি বিশিষ্ট ঘটের আকারে পরিণত হইলেই ঘটের উৎপত্তি, এবং উক্ত উৎপত্তির বিরোধী কপালাদি রূপে অবস্থিত হইলে ঘটের বিনাশ হইল বলা হয়। কিন্তু উক্ত পৃথিব্যাদি সৎ দ্রব্য কি ঘটাবস্থায়, কি কপালাবস্থায় সর্ব্বদাই অবস্থিত থাকে, কোন সময়েই যেমন উহার পৃথিবীত্বের বাদ হয় না তেমনিই দেহ বিনষ্ট হইলেও পার্থিবাদি ভূতের বিনাশ হয় না।

ভগবান পরাশর বলিয়াছেন "মৃত্তিকা হইতে ঘট, ঘট হইতে কপাল কপাল হইতে চূর্ণ রজঃ এবং তাহা হইতে পরমাণু। সুতরাং এই শরীরারম্ভক ভূতাদি নিত্যই অবস্থিত রহিয়াছে, যাহা নিত্য বিদ্যমান তাহার বিনাশ হয় না এবং তন্নিমিত্ত শোক হইতে পারে না।

১৫

আশ্চর্য্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

দেহাত্মনিত্যাত্মপক্ষে তু বাসাংসীত্যাদিকং ন বিস্মর্ত্তব্যং। যত্ত্বাদ্যন্তয়োরসত্ত্বান্মধ্যেঽপি ভূতান্যসন্তোবাতঃ স্বাপ্নিকরথাশ্বাদি প্রখ্যানি মৃষাভূতান্যেব তেন তদ্বিয়োগ হেতুকঃ প্রতিবুদ্ধস্য ন দৃষ্ট ইতি দৃষ্টি সৃষ্টিমভ্যুপেত্যোক্তমসদৎ; তদভ্যুপগমে বৈদিকাসৎ কার্য্যবাদাপত্তেঃ। তদেবং মতদ্বয়েঽপি দেহ বিনাশ হেতুকঃ শোকো নাস্তীতি সিদ্ধং ॥২৮॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

দেহাতিরিক্ত পৃথক নিত্য আত্মার পক্ষাবলম্বন করিয়া দেখিলেও, আত্মাকে যখন নিত্য বলিয়া স্বীকারই করা হইতেছে তখন পূর্ব্বোক্ত জীর্ণবাস পরিত্যাগাদির বিষয় স্মরণ করিলে, আর শোকের কোন কারণই থাকিতে পারে না।

স্বপ্নকালে রথাশ্বাদির মত বিচার করিয়া দেখিলে যেমন স্বপ্নের পূর্ব্বে ও পরে কিছুই থাকে না, তদ্রূপ আদিতে ও অন্তে ভূতাদির উপলব্ধি থাকে না মধ্যে ভূতাদির অবস্থিত হইয়া থাকে। এবং স্বপ্নাপগমে জাগ্রত ব্যক্তিকে যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর জন্য শোক করিতে দেখা যায় না, সেই মত আদিতে ও অন্তে অবিদ্যমানতা নিবন্ধন কেবল মধ্যাবস্থায় দৃষ্ট ভূতাদির বিনাশে শোক করা কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা দৃষ্ট বস্তুর নাশে শোক করা উচিত বলিয়া থাকেন; তাঁহাদের এই মত অতি তুচ্ছ, ইহার স্বীকারে বৈদিক অসৎ কার্য্যবাদের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।

অতএব উক্ত মতদ্বয়ের কোন একটীকে অবলম্বন করিয়াও দেহের বিনাশে শোক হইতে পারে না ইহা স্থির নিশ্চয় ॥২৮॥

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

ননু নর্ম্মিজ্ঞেন ত্বয়া বহূপদিশ্য মা মোহপ্যত্বং শোকনিবারকমাত্ম যাথাত্ম্যং ন বুধ্যে কিমেতদিতি চেত্তত্রাহ আশ্চর্য্যবদিতি। বিজ্ঞানানন্দো তত্র স্বরূপত্বেহপি তদ্ভেদপ্রতিযোগিনং বিজ্ঞান স্বরূপত্বেহপি বিজ্ঞাতৃত্বা সন্তং পরমাণুত্বেহপি ব্যপ্তবৃহৎকায়ং নানাকায়সম্বন্ধেহপি তত্তদ্বিকারৈর স্পৃষ্টমেবমাদি বহু বিরুদ্ধ ধর্ম্মতয়াশ্চর্য্যবদ্ভূত সাদৃশ্যেন স্থিতমেনং মদুপদিষ্টং জীবং কশ্চিদেব স্বধর্ম্মা-

তাৎপর্য্যানুবাদ।

আজ মহামতি অর্জ্জুনের বিষম বিপদ উপস্থিত, শ্রীভগবান তাঁহাকে কত প্রকারে জীব তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইতেছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ ভগবান কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। শোকে তাঁহার হৃদয় এরূপ মুহ্যমান হইয়াছে, যাহা দ্বারা পদ্মপত্র অবস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় উপদেশ পরম্পরা হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে। কর্ত্তব্য পথের অনব-ধারণে অর্জ্জুনের হৃদয়ে এক ভীষণ যাতনা উপস্থিত হওয়ায় তিনি যেন অতি কাতর ভাবে বলিতেছেন ; হে ভগবন্। আপনি আমায় শোক পরিহার পূর্ব্বক কর্ত্তব্য পথে পরিচালিত করিবার মানসে যে সকল উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করিতেছেন উহা শ্রবণ করিয়াও আমি স্থির হইতে পারিতেছি না কেন? আমি যেন সমস্ত বন্ধুজনের বিনাশের বিভীষিকা দেখিতেছি, আর আমার হৃদয়ের নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্প স্রোতোবেগে ভাসমান তৃণের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিয়া লইয়া যাইতেছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আপনার উপদেশও আমি কেন এই আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছি না?

শ্রীভগবান অর্জ্জুনের হৃদয়ের ঈদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়াই যেন, জীব তত্ত্বের আশ্চর্য্যত্ব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পুনশ্চ উপদেশ করিতেছেন ;—

মদুপদিষ্ট এই জীবাত্মাকে কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ বা আশ্চর্য্যভাবে বর্ণন করেন, কেহ বা আশ্চর্য্য জ্ঞানে উহার তত্ত্ব শ্রবণ করেন, আবার বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াও অনেকে বুঝিতে সক্ষম হয়েন না। তাহার মূখ্য কারণের অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, আত্মা বিজ্ঞান ও আনন্দ উভয়

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

নুষ্ঠানেন সত্যতপোজপাদিনা চ বিশুদ্ধহৃদ্ গুরুপ্রসাদলব্ধতাদৃশ জ্ঞানঃ পশ্যতি যাথাত্ম্যেনানুভবতি। আশ্চর্য্যবদিতি ক্রিয়া বিশেষণং বা কর্ত্তৃবিশেষণং বেতি ব্যাখ্যাতারঃ। কশ্চিদেনং যং পশ্যতি তদাশ্চর্য্যবৎ। যঃ কশ্চিৎ পশ্যতি সোঽপ্যাশ্চর্য্যবদিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। শ্রুত্বাপ্যেনমিতি। কশ্চিৎ সম্য-

তাৎপর্য্যানুবাদ।

স্বরূপ হইয়াও পরস্পর ভেদের অপ্রতিযোগী বা অবিরোধী, বিজ্ঞান স্বরূপ হইয়াও প্রতি দেহে বিজ্ঞাতারূপে অবস্থিত, পরমাণু স্বরূপ হইয়াও পরিদৃশ্যমান বৃহচ্ছরীরকে ব্যাপিয়া আছেন, ব্রহ্মাদি দেব শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য গুল্মলতা কীট পতঙ্গাদি বিবিধ শরীরে সম্পৃক্ত থাকিয়াও সেই সেই শারীরিক বিকার অসম্পৃক্ত, এই সকল বহু বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ অবস্থিতি নিবন্ধন জীবাত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ অর্থাৎ অদ্ভুত সাদৃশ্যে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করিয়াও তাহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কিন্তু যিনি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্য বাক্য তপস্যা, জপাদি দ্বারা শুদ্ধ হৃদয় হইয়া গুরুর কৃপায় তাদৃশ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবম্ভূত জ্ঞানী পুরুষই আত্মার যাথাত্ম্যানুভব করিতে সক্ষম হইয়া উহাকে আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করিয়া থাকেন। সম্যক বিশুদ্ধ হৃদয় যিনি উক্ত আত্ম তত্ত্ব বর্ণন করেন।

অতএব এই আত্মার দর্শন ব্যাপারটীও আশ্চর্য্যবৎ এবং যিনি দর্শন করেন তিনিও আশ্চর্য্যবৎ হইয়া যান। এইরূপ সম্যক্ বিশুদ্ধ হৃদয় ব্যক্তি উক্ত আত্ম তত্ত্ব বর্ণন করেন, যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহারাও আশ্চর্য্যবৎ হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহাদিগের হৃদয় সম্যক্ সোধিত হয় নাই তাহারাই শ্রবণ করিয়াও উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এই জন্যই আত্মাকে আশ্চর্য্য স্বভাব বলা হইয়াছে, কারণ উহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থল নাই।

"গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ"

গগন বা সাগরের যেমন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই তদ্রূপ আত্মাকেও জানিবে। শ্রুতিও বলেন; এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণেচ্ছুকদিগের শ্রবণেচ্ছা হইলেও, ঐ তত্ত্বের

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!!

মূল্য হ্রাস।

—:০:—

ভক্তি গ্রন্থাগারের পুস্তকাবলী বর্ত্তমানে যে কয় কপি সামান্য মাত্র অবশিষ্ট আছে উহা সাধারণের বিশেষ অনুরোধে অল্পদিনের জন্য মূল্য হ্রাস করিয়া গ্রাহকগণকে দেওয়া হইল। মনে রাখিবেন শীঘ্রই নূতন সংস্করণ বাহির হইবে ও নিশ্চয়ই মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

ভক্তি ১০ম বর্ষ একত্রে ১২ খণ্ড সম্পূর্ণ		১৲ এক টাকা।
,, ১৩শ বর্ষ ,, ,, ,,		১৲ এক টাকা।
,, ১৪শ বর্ষ ,, ,, ,,		১৲ এক টাকা।
,, ১৫শ বর্ষ ,, ,, ,,		১॥০ দেড় টাকা।
,, ১৬শ বর্ষ ,, ,, ,,		১॥০ দেড় টাকা।
শিক্ষাষ্টকম্।	।৶০ স্থলে	৶০ আনা।
উপাসনা সঙ্গীত।	।৶০ স্থলে	৶০ আনা।
মহাযজ্ঞ।	।/০ স্থলে	৵০ আনা।

একত্রে সমস্ত গুলি লইলে ৬॥০ স্থলে ৬৲ ছয় টাকায় পাইবেন, ডাক মাশুল পৃথক।

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ করিয়া "ভক্তির বিজ্ঞাপনে"র কথা উল্লেখ করিবেন।

হাওড়া,—শালিখা, দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীসুবোধ চন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্নিদীপক

পশ্চিমদেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীন ঔষধ।

(Dyspepsia) ডিস্‌পেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের জন্য বদহজমী, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, পেট গরম, পেটফাঁপ, পেটভার, টকঢেকুরওঠা, বুকজ্বালা, পেটেরব্যথা, শূলবেদনা ও [illegible] দোষজনিত পাকস্থলীর সকল গোলোযোগ অল্প দিনে আরোগ্য হয়। এই ঔষধে ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া এরূপ পরিপাক শক্তি জন্মে যে, প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস সহজে হজম হয়। অসময়ে খাইলে বা বাসি খাবার অথবা গুরুপাক মৎস্য মাংস বেশী খাইলে অনেকেরই পেটগরম হইয়া বদহজমের দরুণ অস্বচ্ছন্দতা বোধ হয় এই ঔষধ সেবনে সমস্ত কষ্ট তৎক্ষণাৎ শান্তি হইবে। সত্বর নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। মূল্য এক শিশি (৬০ বটিকা) ১৲ একটাকা মাত্র, ডাক খরচাদি লাগেনা।

প্রাপ্তি স্থান—দি, অগ্নিদীপক কোম্পানী ;—মথুরা, ইউ, পী এবং কলিকাতায়—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং নবীন ফার্ম্মেসী, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ ষ্টোরস্ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।